কিশোর থ্রিলার
তিন গোয়েন্দা
ভলিউম ৬০
রকিব হাসান
শামসুদ্দীন নওয়াব
FUAD
সেবা
প্রকাশনী
ANIK
AOHOR

তিন গোয়েন্দা

ভলিউম ৬০

রকিব হাসান
শামসুদ্দীন নওয়াব

শুঁটকি বাহিনী

এক
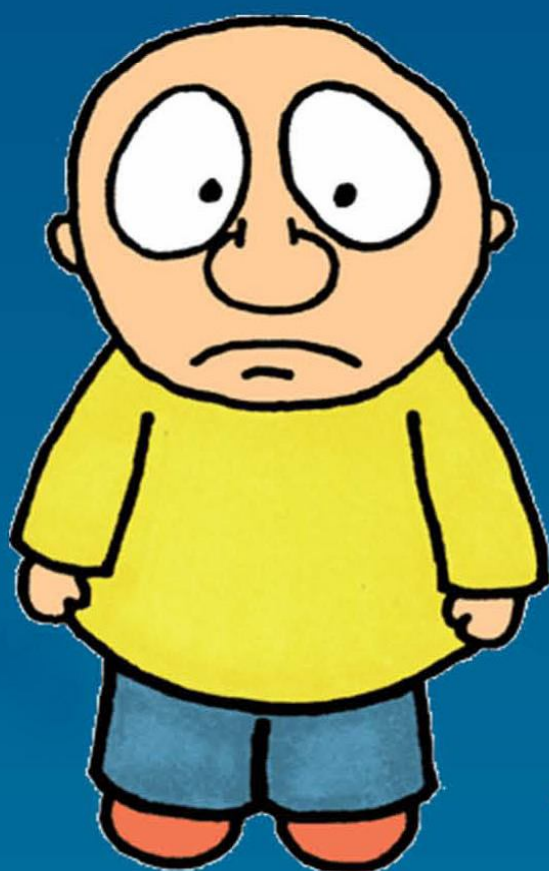
গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে সাইকেল চালাচ্ছে মুসা। হঠাৎ এমন বিকট এক চিৎকার দিয়ে উঠল, আশেপাশে কেউ থাকলে রীতিমত আঁতকে যেত।

তার মনে হলো, ঘাড়ের ওপর একটা মাকড়সা পড়েছে! রোমশ পায়ের খোঁচা লাগছে।

ঝট করে হাত উঠে গেল ঘাড়ের কাছে। কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছিল সাইকেলটা। ব্রেক কষে পা নামিয়ে দিয়ে দাঁড় করাল।

হাত দিয়ে বুঝল, মাকড়সা নয়, একটা মরা পাতা। প্রচণ্ড রাগ হলো। দলামোচড়া করে ছুঁড়ে ফেলে দিল পাতাটাকে।

রাগ হলো নিজের ওপরও। ডাক্তারের কথার প্রতিধ্বনি করল সে মনে মনে, 'দেখো, মুসা, এই অকারণে ভয় পাওয়াটা ছাড়তে হবে তোমাকে। নইলে কোনদিনই আর স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবে না। ভয়কে প্রশ্রয় দিলেই ভয় বাড়ে। যত দিন যাবে, এই ভয় পাওয়ার রোগটা বাড়তেই থাকবে তোমার। মনে রেখো, বার বার মানুষের একই দুর্ঘটনা ঘটে না।'

কিন্তু যদি ঘটে!

নিজেকে আবার ধমক লাগাল মুসা। গ্রীনহিলসে থাকতে স্কুলে 'তোতলা মুসা' খেতাব হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় খেতাবটা ছিল 'ভূত-কাতুরে'। দুটোরই কারণ–ভয়।

'এখানেও যদি সেটা চালু করতে না চাও তো সাবধান হয়ে যাও আজকে থেকেই,' নিজেকে বোঝাল সে। 'নিজেই নিজের ভীতুপনার কথা ঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দিও না। জানতে দিও না তুমি পোকা-মাকড় দেখলে ভিরমি খাও, ভূত দেখলে বেহুঁশ; ভয় পেলে তোতলানি ছাড়া কথা বেরোতে চায় না!'

গ্রীনহিলস থেকে চলে এসেছে মুসারা। তার বাবা এখন থেকে রকি বীচেই কাজ করবেন ঠিক করেছেন। রবিনরা এসেছে আরও আগেই।

রকি বীচ মিডল স্কুলে পড়ে রবিন আর কিশোর। মুসাও সেখানেই ভর্তি হয়েছে। আজ তার নতুন স্কুলে প্রথম দিন।

গাছপালার ভেতর দিয়ে চলে গেছে পথ। সকালের ঠাণ্ডা বাতাস লাগছে গালে। সূর্যটা এখনও একটা লাল বলের মত বাড়িঘরের ছাতের ওপর ভাসছে। গাছের পাতায় উজ্জ্বল লাল আর হলুদের মিশ্রণ। এ বছর শীতটা বোধহয় তাড়াতাড়িই পড়তে যাচ্ছে।

একটা বড় গাড়ি চলে গেল পাশ দিয়ে। তাতে বোঝাই ছেলেমেয়ে আর কুকুর। ছেলেমেয়েগুলোও চেঁচামেচি করছে, কুকুরগুলোও। পাল্লা দিয়ে। মুসাকে দেখে জানালার কাঁচে থাবা তুলে দিয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করল একটা কুকুর। একটা মেয়ে জানালা দিয়ে হাত বের করে নাড়ল তাকে উদ্দেশ্য করে।

চেনে না, অতএব হাত নাড়ার জবাব দিল না মুসা। গীয়ার বদল করল। রাস্তা এখানে বেশ ঢালু।

কিছুদূর এগিয়ে দেখল রাস্তার দুই পাশ ধরে হাঁটছে বেশ কিছু ছেলেমেয়ে। পরনে পরিষ্কার জামা-কাপড়। পিঠে ব্যাকপ্যাক। কলরব করতে করতে স্কুলে চলেছে ওরা। বেশির ভাগই তার বয়েসী।

ওদের দিকে নজর থাকায় রাস্তার পাথরটা চোখে পড়েনি তার। সামনের চাকার নিচে পড়ল। লাফিয়ে উঠল চাকা। অনেক চেষ্টা করেও কোনমতেই সামলাতে পারল না। পড়ে গেল।

পাকা রাস্তায় পড়েছে। প্রচণ্ড ব্যথা পেল। ঝটকা দিয়ে দুই হাত উঠে গেল ওপর দিকে। সাইকেলটা পড়ল তার গায়ের ওপর। হ্যান্ডেলের একটা পাশ খোঁচা মারতে লাগল পাঁজরে।

ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল সে। সাইকেলটা ঠেলে সরাতে গেল গায়ের ওপর থেকে।

এই সময় গাড়িটাকে আসতে দেখল।

একটা বাচ্চার তীক্ষ্ণ চিৎকার কানে এল। গাড়িতে রয়েছে বাচ্চাটা।

মাথা উঁচু করল মুসা।

পেছনের সীটে বসা বাচ্চাটাকে দেখতে পেল। ড্রাইভিং সীটে কেউ নেই।

ঢাল বেয়ে সোজা তার দিকে ছুটে আসছে গাড়িটা। ক্ষণিকের জন্যে হতবুদ্ধি হয়ে গেল মুসা। আতঙ্কিত।

বাচ্চাটার চিৎকার বাস্তবে ফিরিয়ে আনল তাকে। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। সাইকেলের হ্যান্ডেলটা কাত হয়ে পড়ল রাস্তার ওপর। পা দিয়ে ঠেলে যতটা পারল সরিয়ে দিল রাস্তা থেকে। গাড়ির চাকার নিচে পড়লে আর চালানোর যোগ্য থাকবে না।

দ্রুত নেমে আসছে গাড়িটা।

রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে চোখ মিটমিট করতে লাগল মুসা। সত্যি কি ড্রাইভার নেই?

ভাল করে দেখল। না, সত্যি নেই।

মাত্র কয়েক ফুট দূরে আছে আর গাড়ি।

চিৎকার করে কাঁদছে বাচ্চাটা।

আরেকটা চিৎকার কানে এল মুসার। ওপর দিকে রাস্তার মাথার দিকে তাকাল সে। 'আমার খোকা! আমার খোকা!' বলে চিৎকার করতে করতে পাগলের মত ছুটে আসছে এক মহিলা। হাত ছুঁড়ছে ওপর দিকে। সোনালি চুল ঝাঁকি খাচ্ছে ঘাড়ে। লাল জ্যাকেটের কোনা বাতাসে উড়ছে।

বড় করে দম নিল মুসা। সরে গেল একপাশে।

আসছে গাড়িটা! আসছে!

ভাবছে না সে। ভেবেচিন্তে কাজ করার সময় নেই এখন।

নিজেকে তৈরি করে নিল সে। শক্ত হয়ে গেল প্রতিটি মাংসপেশি।

গাড়িটা পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল ড্রাইভারের পাশের দরজার হাতল।

মিস করল।

দরজায় বাড়ি লাগল হাতটা। প্রচণ্ড ব্যথা পেল। কিন্তু টুঁ শব্দ করল না। ঝাঁপ দিল গাড়িটাকে লক্ষ্য করে। বডিতে বাড়ি খেয়ে পড়ে গেল রাস্তার ওপর। হাঁটুতেও ব্যথা পেল। তা-ও শব্দ করল না।

চেঁচামেচি কানে আসছে রাস্তার দুই পাশ থেকে। মুখ ফিরিয়ে মহিলাকে দেখতে পেল। বাচ্চার নাম ধরে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসছে।

গাড়ির দিকে তাকাল মুসা। দ্রুত গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে। নিচের দিকে রাস্তার শেষ মাথায় আরেকটা রাস্তা আড়াআড়ি ক্রস করেছে প্রথমটাকে। লাল ট্র্যাফিক লাইট জ্বলছে। রাস্তা পেরোচ্ছে ছেলেমেয়েরা। বেশ ভিড় ওখানটায়।

জলদি ওঠো, মুসা!–নিজেকে তাগাদা দিল সে। বাচ্চাটাকে বাঁচাও!

লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল মুসা। ঢাল বেয়ে ছোটা কঠিন। রাস্তায় পড়ে আছে আলগা পাথর। পা পড়লেই সড়াৎ। কোন কিছুই দমাতে পারল না তাকে। মাথা ঘুরছে। বাচ্চাটার তীক্ষ্ণ চিৎকার বাজছে কানের পর্দায়। পৌঁছে গেল গাড়ির কাছে।

পেছনে থেকে কিছুই করতে পারবে না। পাশে যেতে হবে।

দুই হাত সামনে বাড়িয়ে প্রাণপণে দৌড়াতে লাগল।

হাতলটা ধরতে চায়।

নাহ্! আর বোধহয় পারা গেল না! পারল না ধরতে!

চোখ পড়ল রাস্তা পেরোতে থাকা ছেলেমেয়েগুলোর ওপর।

'সরো! সরো তোমরা!' ওদের উদ্দেশে চিৎকার করে উঠল সে।

গাড়ির পেছনের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে খুদে খুদে গোলাপী রঙের আঙুলগুলো দিয়ে কাঁচ আঁকড়ে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করছে বাচ্চাটা।

নিজের অজান্তেই গতি বেড়ে গেল মুসার।

জোরে···আরও জোরে···

থাবা দিয়ে ধরতে গেল আবার হাতলটা। আবার মিস করল!

দুই

তৃতীয়বারের চেষ্টায় ধরে ফেলল হাতলটা। শক্ত হয়ে চেপে বসল আঙুলগুলো। ছাড়ল না কোনমতেই।

গাড়ির পাশে পাশে দৌড়াচ্ছে। একই সঙ্গে টেনে খোলার চেষ্টা করছে দরজাটা।

খুলে গেল দরজা।

মাথা নিচু করে ডাইভ দিল সে। গীয়ে পড়ল সীটের ওপর।

হাত ছুঁড়ছে আর চিৎকার করছে বাচ্চাটা। জড়সড় হয়ে আছে পেছনের সীটে।

সেদিকে তাকানোর সময় নেই। গাড়ির মধ্যে নিজেকে ঠেলেঠুলে সোজা করল মুসা। পা নেমে গেল নিচের দিকে। ব্রেক প্যাডালটা ছুঁতে চাইছে।

পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরল ওটা।

দুলে উঠল গাড়ি। হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ভয়াবহ ঝাঁকুনি।

ড্যাশবোর্ডে ঠুকে গেল মুসার কপাল। তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে গেল সমস্ত শরীরে। যন্ত্রণায় আপনাআপনি চিৎকার বেরিয়ে এল মুখ থেকে। বুজে গেল চোখের পাতা।

গাড়ির প্রচণ্ড ঝাঁকুনি থামিয়ে দিয়েছে বাচ্চাটার চিৎকারও। সীটবেল্ট না থাকলে উড়ে এসে পড়ত সামনের দিকে। যত চিৎকার-চেঁচামেচি এখন গাড়ির বাইরে। কারও মুখ বন্ধ নেই।

আনন্দ আর স্বস্তি জুড়িয়ে দিল যেন মুসার শরীর। পেরেছে সে! সময়মত থামাতে পেরেছে গাড়িটা!

সারা গায়ে ব্যথা। কপাল দপদপ করছে। মাথা ঘুরছে বনবন করে। তুলে রাখতে পারছে না। চোখের সামনে সব যেন উজ্জ্বল লাল। লাল বদলে সাদা হলো। সাদা আলোটা হাতুড়ির মত বাড়ি মারছে যেন মাথার মধ্যে।

বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারল।

মায়ের চিৎকার চমকে দিল তাকে। চোখের সামনে থেকে সাদা পর্দার মত সরে গেল বিচিত্র আলোটা। কানের পেছনে চিৎকার করে উঠেছেন মা, 'আমার খোকা! আমার খোকা!'

টের পাচ্ছে মুসা, ঝটকা দিয়ে খুলে গেল পেছনের দরজা। গাড়িতে মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছেন মহিলা। বাচ্চার সীট-বেল্ট খুলে নিয়ে তাকে কোলে তুলে নিলেন।

আপ্রাণ চেষ্টা করছে মুসা, যাতে বেহুঁশ না হয়। শরীর কাঁপছে থরথর করে।

অবশেষে মাথা সোজা করল সে। হ্যান্ডব্রেক তুলে দিয়ে বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে। টলে উঠল। মাথা ঘুরছে এখনও। কপালে হাত বোলাল।

গাড়িটাকে ঘিরে ধরেছে ছেলেমেয়েরা। একযোগে কলরব করছে সবাই। সবার চোখ মুসার দিকে।

বাচ্চাকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে ছুটে এলেন মা।

'এত সাহসী ছেলে জীবনে দেখিনি আমি!' বাচ্চার গা থেকে একটা হাত সরিয়ে এনে সে-হাতে জড়িয়ে ধরলেন মুসাকে। 'তোমার মত সাহস দুনিয়ায় আর কারও নেই!' ঘোষণা করে দিলেন তিনি। 'কি নাম তোমার, বাবা?'

'মুসা আমান!' কোনমতে বলল মুসা। উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় কান গরম হয়ে যাচ্ছে তার।

এগিয়ে এল স্কুলের ছেলেমেয়েরা। কেউ প্রশংসা করতে লাগল, কেউ বা চাপড়ে দিল পিঠ।

দুই গাল বেয়ে পানির ধারা নেমেছে মায়ের। 'গাড়ি থেকে নেমে একটা চিঠি পোস্ট করতে গিয়েছিলাম,' জানালেন তিনি। 'হ্যান্ডব্রেকটা তুলে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম হয়তো। কি মনে হতে ফিরে তাকিয়ে দেখি গাড়িটা নেমে যাচ্ছে...শুধু আমার ছেলেটাকেই না, কতজনকে যে তুমি আজ বাঁচিয়ে দিলে, মুসা!'

'তাই কি!' বিড়বিড় করল মুসা। প্রচণ্ড শকটা হজম করতে সময় নিচ্ছে। মাথা ঘোরা সারেনি এখনও। পায়ের নিচে যেন মাটি নেই। শূন্যে ভাসছে সে।

মুসাকে ছেড়ে দিয়ে বাচ্চাকে বুকের এক পাশ থেকে আরেক পাশে সরালেন মা। ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মুসা করলটা কি দেখলে তোমরা? সাইকেল থেকে চলন্ত গাড়িতে ঝাঁপ–এমন দৃশ্য কেবল সিনেমাতেই দেখা যায়।'

না না, ঠিক বলেননি আপনি!–বলতে চাইল মুসা, ঘটনাটা ঠিক এ ভাবে ঘটেনি। কিন্তু কথা বেরোল না মুখ দিয়ে। সবাই তাকিয়ে আছে তার দিকে। প্রশংসা করছে। পিঠ আর কাঁধ চাপড়ানোর ধুম পড়ে গেছে। প্রতিবাদ করারও সুযোগ পেল না সে।

'আরেকটু হলে নিজেই মরত!' বলে চলেছেন মহিলা। 'কিন্তু অন্যকে বাঁচানোর জন্যে প্রাণের পরোয়া করেনি। অত সাহস জীবনে দেখিনি আমি!'

মহিলার কথা সমর্থন করে সম্মিলিত চিৎকার উঠল।

দুই হাত জিনসের পকেটে ঢুকিয়ে দিল মুসা। দেহের কাঁপুনি থামানোর চেষ্টা করছে।

নিজেকে ওর অত সাহসী লাগছে না। হিরো মনে হচ্ছে না। কারণ ঘটনাটা ঘটেছে অন্যভাবে। লাফ দিয়ে সাইকেল থেকে গাড়ির ওপর পড়েনি। বরং সাইকেল থেকে পড়ার পর গাড়িটাকে ছুটে আসতে দেখে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে লাফিয়ে সরে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু পেছনের সীটে অসহায় বাচ্চাটাকে দেখে কি যেন কি হয়ে গিয়েছিল, ছুটতে শুরু করেছিল পেছন পেছন···ব্যস, ওই পর্যন্তই!

চিৎকার-চেঁচামেচি, স্বাগত জানানোর পালা চলছেই। কেউ থামতে চাইছে না।

মুখ বন্ধ রেখেছে মুসা। কপাল ব্যথা সত্ত্বেও মুখে হালকা একটা হাসি ফোটাতে বাধ্য হলো। সবাই এখন তাকে ছেড়ে সরে গেলে বাঁচে। স্বস্তিতে দম নিতে পারে।

কিন্তু আবার তাকে জড়িয়ে ধরলেন মহিলা। আরেকবার কৃতজ্ঞতা জানালেন। তারপর গাড়ির দিকে এগোলেন। বাচ্চাকে আবার পেছনের সীটে বসিয়ে সীট-বেল্ট আটকে দিতে লাগলেন।

কাঁধের ওপর আরেকটা হাত পড়ল। চাপ বাড়ল আঙুলগুলোর। কানের কাছে শুনতে পেল পরিচিত কণ্ঠস্বর, 'মুসা!'

ফিরে তাকাল মুসা। হাসিমুখে তার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর পাশা।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল মুসা।

টেনে তাকে ভিড়ের ভেতর থেকে সরিয়ে নিয়ে চলল কিশোর। এদিক ওদিক তাকিয়ে ডাক দিল, 'রবিন, এসো তো এদিকে! ওকে ধরো! কিভাবে টলছে দেখো। পড়ে যাবে।'

গাড়ির ড্রাইভিং সীটে বসে ফিরে তাকালেন মহিলা। কিশোরর কথা কানে গেছে। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'ডাক্তারের কাছে নেয়া লাগবে?'

'না না, লাগবে না!' তাড়াতাড়ি জবাব দিল মুসা। 'বসলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

রাস্তার পাশে মুসাকে নিয়ে এল কিশোর আর রবিন।

সামনে এসে দাঁড়াল দুটো ছেলে। একজন ঢ্যাঙা, গায়ে মাংস বলতে

নেই। মুখে প্রচুর তিল। পরনে নীল শার্ট, ফেড জিনস, দুই হাঁটুর কাছে ইচ্ছে করে ছিঁড়ে রাখা–স্মার্টনেস–যা দু'চোখে দেখতে পারে না মুসা; ভিখিরি মানসিকতা মনে হয়। খোঁচা খোঁচা চুল। এক কান ফুটো করে তাতে একটা রূপার রিঙ পরেছে।

সঙ্গের ছেলেটা খাটো, মোটা, লম্বা লম্বা চুল। নাকের ওপর মস্ত এক আঁচিল। চোখের পাতা সরু সরু করে মুসাকে জিজ্ঞেস করল, 'হিরোগিরি দেখানোর নেশা আছে মনে হয় তোমার?'

টেরা কথা শুনে চোখ গরম করে তাকাল মুসা, 'কে তুমি?'

খিকখিক করে হাসল সঙ্গের ঢ্যাঙা ছেলেটা। হাসিটা শুনলে রাগ লাগে। সঙ্গীকে ধমক দিয়ে বলল, 'আই, টাকি, থামো তো তুমি!' মুসার দিকে তাকাল, 'ও একটু বেশি কথা বলে। ওর কথায় কিছু মনে কোরো না।' হাত বাড়িয়ে দিল, 'আমি টেরিয়ার ডয়েল।'

হাতটা ধরল মুসা। পাশে তাকিয়ে দেখল কিশোর আর রবিন গম্ভীর।

টেরির দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল কিশোর, 'কেন ওকে নিয়ে টানাটানি করছ, শুঁটকি? দেখছ না ওর শরীর খারাপ লাগছে?'

'তুমি আবার এর মধ্যে কথা বলতে আসো কেন, টেটনা শার্লক?' মুসাকে দেখিয়ে বলল, 'হিরোদের আমার পছন্দ। কারণ আমি নিজেও একজন হিরো তো। অবশ্যই ওকে আমার দলে নিয়ে নেব।' মুসার দিকে তাকাল, 'আজই স্কুলে প্রথম যাচ্ছ, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা।

হাসিমুখে টেরিকে বলল কিশোর, 'তোমার অবগতির জন্যে জানানো দরকার, শুঁটকি, মুসা আমান আমার অনেক পুরানো বন্ধু। গ্রীনহিলস থেকে এসেছে ও। বিশ্বাস না হলে রবিনকে জিজ্ঞেস করে দেখো।'

রবিনের দিকে তাকাল টেরি।

মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'হ্যাঁ।'

মুখের আলো দপ করে নিভে গেল টেরির। হাসি উধাও। আঙুল ঢিল হয়ে গেল টেরির। খসে পড়ে গেল মুসার হাতটা। বড়ই হতাশ। ভেবেছিল, মুসার মত একজনকে দলে টেনে নিতে পারলে তার দলের সুনাম বাড়বে, শক্তিশালী হবে দল। কিন্তু টেটনা শার্লকটা যে আগেই ওকে বগলদাবা করে বসে আছে, কে জানত!

মুহূর্তে কিশোর আর রবিনের মত মুসাও টেরির শত্রু হয়ে গেল। চোখের পাতা সরু সরু করে মুসার দিকে তাকাল সে। বলল, 'হিরো না ছাই! মহিলাটা একটা ইয়ে। এমন সাহস নাকি আর জীবনে দেখেনি! আহা!'

মুসাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর, 'কেন, চোখের সামনেই তো দেখলে কি কাণ্ডটা করল! এরপরেও অবিশ্বাস? তোমার দলের সমস্ত ছুঁচোগুলোর সাহস এক করলেও মুসার সমান হবে না, তা জানো?'

'তাই নাকি?' খিকখিক করে হাসল টেরি। 'ভাল জমবে মনে হচ্ছে এবার!'

'চ্যালেঞ্জ করছ?

'করছি।'

‘সাহস নেই,’ সাফ বলে দিল টাকি।

‘অ্যাই, তুমি থামো, টাকিমাছ!’

বাংলা শব্দটা বোঝে না টাকি। গর্জে উঠল, ‘রোজই ট্যাকিমাছ ট্যাকিমাছ করো! পেয়েছ কি? কোন্‌দেশী গালি এটা? আজ তোমাকে বলতেই হবে! কি মানে এর?’

‘গালি নয়, বাংলাদেশী একটা অতি লোভনীয় খাবারের নাম এটা,’ হেসে জানিয়ে দিল রবিন। ‘টাকি হলো এক ধরনের মাছ, মরিচ-পেঁয়াজ দিয়ে ভর্তা করে খেতে নাকি খুব টেস্ট। ঠিক আছে, বাংলা পছন্দ না হলে ইংরেজিতেই ডাকা হবে তোমাকে। ট্যাকি-ফিশ! কি, এবার ভাল লাগছে নামটা!’

বিকৃত হয়ে গেল টাকির মুখ। ‘দেখিয়ে ছাড়ব একদিন কে কাকে ভর্তা বানিয়ে খায়…’

‘আহা, তোমরা এমন ঝগড়া শুরু করলে কেন…’ কথা শেষ না করেই বিকট এক চিৎকার দিয়ে উঠল মুসা। থাবা মারল পায়ে। সুড়সুড়ির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখল, লম্বা একটা ঘাসের ডগা লেগেছিল পায়ে। লজ্জা পেয়ে হাসল। ‘আমি মনে করেছিলাম শুঁয়াপোকা…’

ভুরু কুঁচকে গেছে টেরির। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল মুসার দিকে। ধীরে ধীরে পাতলা হাসি ফুটল ঠোঁটে। কিশোরের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, ‘কই, ভয় নাকি পায় না?’

‘এটাকে কি ভয় বলে?’

‘তাহলে কি বলে?’

‘চমকে যাওয়া,’ গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। ‘পায়ে সুড়সুড় করলে তুমিও থাপ্পড় মারবে।’

‘মারব, কিন্তু চিৎকার করব না।’

‘দেখাব পায়ে লাগিয়ে? রবিন, ওই ফুল গাছটাতে দেখলাম কালো কালো শুঁয়াপোকায় ভরে গেছে। কিলবিল করছে। এত বড় বড় লোম। যাও তো, কাঠিতে করে নিয়ে এসো তো একটা।’

রবিন যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই হাত তুলল টেরি, ‘থামো, থামো!…দাঁড়াও!’ কিশোরের দিকে তাকাল। গাল চুলকাল এক আঙুলে। ‘তারমানে তোমার দোস্ত ভয় পায় না বলতে চাও?’

‘হ্যাঁ, চাই।’ মনে মনে মুসার মুণ্ডপাত করছে কিশোর। প্রথম পরিচয়েই দিয়েছে নিজের দুর্বলতা টেরির কাছে ফাঁস করে।

টাকি বলল, ‘প্রমাণ দিতে পারবে?’

উত্তেজনায় টেরির গালের তিলগুলো যেন ঝিকমিক করে উঠল লাল-কালো তারার মত। মুহূর্তে শয়তানি বুদ্ধি খেলে গেল ওর কুটিল মগজে। ‘ঠিক, ঠিক, প্রমাণ! বাজি হয়ে যাক একটা!’

বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে ভেবে আবার থামাতে গেল মুসা, ‘না না, প্লীজ…’

‘তুমি থামো!’ মুসাকে কথাই বলতে দিল না কিশোর। ‘তুমি এখানকার হালচাল কিচ্ছু জানো না। যা বলার আমি বলছি।’ টেরির দিকে তাকাল, ‘কত টাকা?’

টাকির দিকে তাকাল টেরি। দুজনের মুখেই কুটিল হাসি।

ঘড়ি দেখল টেরি। কিশোরের দিকে মুখ তুলল, 'তোমার যত ইচ্ছে। ভয় পেলে বাজিতে হারবে কালটু-আমান। টাকাটা কার পকেট থেকে দেবে সেটা তোমাদের মাথাব্যথা।...এই টাকি, চলো। স্কুলের দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

তিন

দূর, টিভিতে কিচ্ছু নেই,' বিরক্ত হয়ে রিমোটটা সোফার ওপর ছুঁড়ে ফেলল কিশোর। 'কম্পিউটার গেমগুলোও বিরক্তিকর! কি করা যায় বলো তো?'

চুপ করে রইল মুসা আর রবিন। কি করলে ভাল লাগবে ওরাও বুঝতে পারছে না।

কিশোরদের লিভিং-রুমে বসে আড্ডা দিচ্ছে তিন গোয়েন্দা।

শনিবারের ধূসর এক বিকেল। ঘরের জানালায় একটানা আঘাত হেনে চলেছে বৃষ্টির ফোঁটা। পেছনের আঙিনায় পুরু হচ্ছে খসে পড়া পাতার আস্তর। প্রবল বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠছে গাছের ডালগুলো।

'চিলেকোঠায় যাবে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'জায়গাটা দারুণ। অন্ধকার। ছমছমে। যত দুনিয়ার বাক্স-পেটরা আর পুরানো জিনিসে বোঝাই। প্রচুর বইপত্র-ম্যাগাজিন। এক ধরনের উত্তেজনা আছে চিলেকোঠায়।'

'না রে, ভাই, আমি ওখানে যাব না,' সাফ মানা করে দিল মুসা।

যে কোন অন্ধকার জায়গাকে তার ভয়। সেটা চিলেকোঠাই হোক আর পাতাল-ঘর। আলোকিত ঘরে থাকাটাই তার পছন্দ।

'তাহলে আর কি করা! ভিডিওতে সিনেমা দেখি।' উঠে ওপাশের দেয়াল ঘেঁষে রাখা আলমারিটার সামনে চলে গেল কিশোর।

প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল বাইরে। কেঁপে উঠল মুসা। ভয় ভয় লাগছে তার। সাপকে ভয়, মাকড়সাকে ভয়, পোকা-মাকড়, ইঁদুর, অন্ধকার, ভূত, আরও অনেক কিছুকে ভয়। ইদানীং বজ্রপাতকেও ভয় পায়।

আলমারি থেকে কয়েকটা ভিডিও ক্যাসেট বের করে আনল কিশোর।

একটা ক্যাসেট হাতে নিয়ে ওপরে লাগানো ট্যাগটা পড়ল মুসা। 'সবগুলোই হরর ছবি নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'হ্যাঁ।'

'তাহলে আমি দেখব না।'

রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, 'তুমি?'

'আমার আপত্তি নেই। কিন্তু মুসা যদি ভয় পায়...একজনকে সারাক্ষণ ভয়ের মধ্যে রেখে ছবি দেখে আমরাও মজা পাব না।'

হতাশ হয়ে ক্যাসেটগুলো টেবিলের ওপর রেখে দিল কিশোর। মুসাকে নিয়ে এক বিরাট সমস্যা হয়েছে। এত ভয় পেলে কি করা! কোন রহস্যের সমাধান করতে গেলেও মনে হচ্ছে আর যোগ দিতে পারবে না মুসা। যা করতে দেয়া হবে তাকে, ভয়ে পিছিয়ে আসবে।

কি করবে ভাবছে, এই সময় চমকে দিল দরজার ঘণ্টা। বেজে উঠল

টুং-টাং টুং-টাং করে।

চাচা-চাচী মার্কেট থেকে ফিরল নাকি? না, এত তাড়াতাড়ি তো ফেরার কথা নয়।

ফিরে তাকাল কিশোর।

'আই, দরজা খোলো, মু-ম্মুসা!' শোনা গেল একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠ। 'আমরা জানি, তুমি এখানে বসেই আড্ডা দিচ্ছ।'

শুঁটকি টেরির গলা। চিনতে পারল তিনজনেই।

চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার। তাকে 'মু-ম্মুসা' বলে ডেকেছে! শুঁটকি জানল কিভাবে?

কিশোরও অবাক। উঠে গেল দরজা খুলে দিতে।

ঘরে ঢুকল টেরি, টাকি এবং আরও তিনজন। হাত দিয়ে রেনকোট থেকে বৃষ্টির পানি ঝাড়তে লাগল টাকি। ভেজা জুতো নিয়েই উঠে আসতে গেল কার্পেটের ওপর। হাতটা বাড়িয়ে ঠেকিয়ে দিল কিশোর। বাড়ি বয়ে এসেছে, শত্রু হলেও অভদ্রতা করল না। সৌজন্য দেখিয়ে ওদের ভেজা রেনকোট আর ম্যাকিনটশগুলো রেখে এল হ্যাঙারে। জুতোর তলা ভালমত মুছিয়ে নিল ডোরম্যাটে। কার্পেটে কাদা-পানি দেখলে কাউকেই আস্ত রাখতেন না মেরিচাচী। সবচেয়ে বেশি বকাটা খেতো কিশোর।

খোঁচা খোঁচা চুল থেকে আঙুল দিয়ে পানি ঝাড়ল টেরি। মুসার দিকে তাকিয়ে হাসল। মুসার মনে হলো, ইবলিসের হাসি।

মুসার হাতের পপকর্নের বাটি থেকে এক খাবলা পপকর্ন তুলে নিয়ে মুখে পুরল।

'হাই, মু-ম্মুসা!' ভুরু নাচাল লাল-চুল একটা ছেলে, ওর নাম কডি। তার সঙ্গী বাকি দুজন নিটু আর হ্যারল্ড ফ্যাকফ্যাক করে হাসল।

সব একই ক্লাসে পড়ে, মুসাদের ক্লাসে। হাসি, কথাবার্তা, আচরণে টেরির ফটোকপি একেকটা। সে-জন্যেই দোস্ত হতে পেরেছে। টেরি ওদের নেতা হবার যথেষ্ট কারণ আছে। টেরির বাবার অনেক টাকা। টেরি হাত-খরচ পায় প্রচুর। সেগুলো দুই হাতে খরচ করে বন্ধুদের পেছনে। নেতা হবার প্রধান কারণ সেটাই।

মু-ম্মুসা ডাক শুনে পেটের মধ্যে খামচে ধরল মুসার। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে চাইছে।

'আ-আ-আমাকে এ রকম করে ডা-ডা-ডাকছ কেন?' রাগ করে বলল মুসা।

'যে-যে-যে রকম করে কথা বলছ, সে-সে-সে রকম করেই তো ডাকছি!' খিকখিক করে হাসল টেরি। 'ভেবেছ জানি না? গ্রীনহিলসে যে স্কুলে পড়তে তুমি, সেটাতে পড়ে আমার কাজিন নিনা।' আবার পপকর্ন নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল সে।

বাটিটা সামনে বাড়িয়ে দিল মুসা। 'তাতে কি?' চেহারা স্বাভাবিক রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

বাটিটা নিজের হাতে নিয়ে নিল টেরি। কিছুক্ষণ চুপচাপ চিবাল। অপেক্ষা করিয়ে রাখল মুসাকে। তারপর মুচকি হেসে বলল, 'নিনা আমাকে সব বলে দিয়েছে, মু-ম্মুসা। পোকা-মাকড় থেকে শুরু করে দুনিয়ার তাবৎ

জিনিসকে ভয় পাও তুমি। ভয় পেলে তোতলাতে থাকো। নিজের ছায়া দেখলে প্যান্ট ভিজিয়ে ফেল।'

হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মুসা।

'নিনা আমাকে বলেছে, গত বছর দুপুরবেলা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলে। রাস্তায় মানুষ ছিল না। নিনা আর তার এক বান্ধবী বনের ভেতর থেকে নাকি স্বরে কথা শুরু করল। তুমি নাকি বেদিশা। পাশের খালে দিলে ঝাঁপ। সাঁতরে ওপারে উঠে প্রায় বেহুঁশ। এমন কাণ্ড করেছিলে, তুমি মরে গেছ ভেবে ভড়কে গিয়ে নিনা আর তার বান্ধবী ঝেড়ে দিয়েছিল দৌড় বাড়ির দিকে।'

মুখ কাঁচুমাচু করে কিছু বলতে যাচ্ছিল মুসা, তাকে থামিয়ে দিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল কিশোর। 'মিথ্যে বলার আর জায়গা পেলে না! ভূতের ভয়ে পানিতে ঝাঁপ দেবে মুসা আমান? ভূতের ঘাড় মটকে দেবে। কতদিন অমাবস্যার রাতে ভূত খুঁজে বেড়িয়েছে ও। আর তুমিও যেমন, টেরি! তোমার মিথ্যুক বোনটা এসে কি না কি বানিয়ে বলল, আর তুমিও তার কথা বিশ্বাস করলে। অবশ্য তোমার আত্মীয় তো, ভাল আর কোত্থেকে হবে। কিংবা হয়তো নিনা কিছুই বলেনি, তুমি নিজেই বানিয়েছ। মুসাকে হিংসে করো তুমি। ওর মতো দুঃসাহসী তুমি আরও চোদ্দবার জন্মালেও হতে পারবে না।'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল টাকি। মুখে হাসি। 'তাই নাকি? তাহলে স্কুলে তোতলা মুসা খেতাব হয়ে গিয়েছিল কেন? মু-ম্মুসা বলে খেপাত কেন?'

'টা-টা-টা-ট্টাকির মত শয়তানগুলো সবখানেই আছে বলে।'

'তোমার সঙ্গে কথা বলছি নাকি?' মুসার দিকে তাকাল টাকি। 'কেন খেপাত, বলো? নাকি এটাও মিথ্যে?'

ঘেমে যাচ্ছে মুসা। গ্রীনহিলসে থাকতে শেষ দিকে সহপাঠীদের খেপানোর জ্বালায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে গিয়েছিল তার। ভেবেছিল, রকি বীচে এসে বাঁচল। কিন্তু অত্যাচারটা তো এখানে আরও বেশি হবে মনে হচ্ছে! বলতে গেল, 'আসলে একদিন একটা মা-মা-মা-মা-ম্মা...'

টাকির শয়তানি ভরা হাসিটা চওড়া হলো। কালো চোখের তারায় ঝিলিক। জিভ দিয়ে চুক্ চুক্ শব্দ করল। 'কথা বের করতে পারছ না? আহারে!' মোলায়েম কণ্ঠে বলল সে। 'ঠিক আছে, আপাতত তোমার তোতলামি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না আমরা। তুমি যে সাহসী সেটা প্রমাণ করে দাও।'

'হ্যাঁ, প্রমাণ করে দাও,' এক সুরে কথা বলে উঠল টেরি। পপকর্নের খালি বাটিটা ঠাস করে টেবিলে রাখল সে। 'তুমি যে সাহসী সেটা প্রমাণের জন্যে একটা ছোট্ট পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছি আমরা।'

জানালায় বিদ্যুতের আলোর ঝিলিক। ভয়ানক শব্দটা আসছে! অগ্রাহ্য করার জন্যে টেরিকে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'পরীক্ষা? কিসের পরীক্ষা?'

গুড়ুম করে বিকট শব্দ হলো। নাক-মুখ কুঁচকে ফেলল সে। আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেল চোখের পাতা। চোখ মেলে শুনল, কিশোর বলছে, 'কি পরীক্ষা?'

'কড়ির কাছে আছে,' সহকারীর দিকে ফিরল টেরি। 'এনেছ না?'

'হ্যাঁ,' ঘাড় কাত করল কড়ি। 'নিজে ভিজেছি, কিন্তু এগুলোকে ভিজতে দিইনি। জানি, কাজের জিনিস। এক ফোঁটা পানিও লাগেনি গায়ে।' জ্যাকেটের নিচ থেকে লম্বা একটা কাঁচের বয়াম টেনে বের করল সে।

'কি-কি-ক্কি আছে ওর মধ্যে?' নিজের অজান্তেই আবার তোতলানো শুরু করল মুসা।

বয়ামটা টেরির হাতে তুলে দিল কড়ি।

টেরি সেটা তুলে ধরল মুসার চোখের সামনে।

চার

মাকড়সা!

কালো, কুৎসিত, রোমশ অসংখ্য মাকড়সা কিলবিল করছে বয়ামটার মধ্যে। হেঁটে বেড়াচ্ছে বয়ামের দেয়ালে, একে অন্যের গায়ের ওপর।

মুসার নাকের কাছে বয়ামটা ঠেলে দিল টেরি। ঝাঁকি দিল বয়ামে। বয়ামের দেয়াল বেয়ে ওঠা মাকড়সাগুলো খসে পড়ল তলায়। প্রচণ্ড আক্রোশে খামচা-খামচি শুরু করে দিল।

মুসাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে টেরি, বুঝতে পারল কিশোর। থাবা দিয়ে টেরির হাত থেকে কেড়ে নিল বয়ামটা। মাকড়সাগুলো দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল, 'এত মাকড়সা জোগাড়ের কারণ? ভেজে খাও নাকি তোমরা?'

খিকখিক করে হাসল টেরি। 'আমরা খাব কেন? তোমার দোস্তকে খাওয়াতে নিয়ে এলাম।'

সাংঘাতিক রসিকতা করে ফেলেছে যেন টেরি। হাসাহাসি শুরু করে দিল তার দোস্তরা।

ভড়কে গেল মুসা। সর্বনাশ! সত্যি সত্যি খেতে বলবে নাকি!

ঘাবড়ে গেছে রবিনও। শুঁটকি-বাহিনীকে বিশ্বাস নেই। ওদের পক্ষে সব সম্ভব। মুসার জন্যে দুশ্চিন্তায় সাদা হয়ে গেল তার মুখ।

'সেদিন বাজির কথা বললে না,' কিশোরকে বলল টাকি। 'সে-জন্যেই তো নিয়ে এলাম।'

'ভাল করেছ,' আড়চোখে মুসার দিকে তাকাল কিশোর।

মুসার মুখ দেখে মনে হলো বেহুঁশ হয়ে যাবে। পোকা-মাকড়ের মধ্যে মাকড়সাকে সবচেয়ে বেশি ভয় তার। ভয়ঙ্কর-দর্শন প্রাণীগুলোর ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না। একনাগাড়ে কামড়া-কামড়ি, খামচা-খামচি করে যাচ্ছে। অদ্ভুত ওগুলোর কুস্তি-যুদ্ধ।

'তা কি করতে হবে মুসাকে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কিছুই না,' জবাব দিল টেরি। 'বয়ামের মধ্যে ওর হাতটা কেবল পাঁচটা মিনিট ঢুকিয়ে রাখতে হবে।'

হাঁ হয়ে গেল মুসা। উঠে দৌড়ে পালানোর কথা ভাবতে লাগল। কানে

এল কিশোরের কথা, 'কোন সমস্যা নেই। পাঁচ মিনিট কেন, পাঁচ ঘণ্টা বয়ামে হাত ঢুকিয়ে রাখতে পারবে মুসা।' রবিনের দিকে তাকিয়ে সমর্থন চাইল, 'কি বলো, রবিন? মুসাকে আমরা চিনি।'

মিনমিন করে কি বলতে গেল রবিন। তাকে থামিয়ে দিয়ে কিশোর বলল, 'মাকড়সাকে তুমি ভয় পাও, এই তো বলতে চাও? তা তো পাওই। আমিও পাই। কিন্তু মুসা পায় না।'

কিশোর, দোহাই তোমার, থামো!–বলতে গেল মুসা। বলতে পারল না।

মাকড়সাগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। ভুরু নাচাল কিশোর, 'ভাবছ কি? ঢোকাও হাত। তোমার কতটা সাহস, দেখিয়ে দাও না শুঁটকিগুলোকে!'

এক বিন্দু সাহস নেই আমার, তুমি তো ভাল করেই জানো!–বলতে ইচ্ছে করল মুসার, পারল না। দাঁত চেপে রাখতে রাখতে চোয়াল ব্যথা হয়ে গেছে। মুক্তির উপায় খুঁজছে। উঠে ছুটে পালাবে দরজা দিয়ে? উঁহু, স্কুলে আর যেতে পারবে না পরদিন। টিকতে পারবে না রকি বীচে। রবিনের দিকে তাকাল অসহায় চোখে। সেখানেও সাহায্যের কোন আশা দেখল না। হঠাৎ কি যেন কি হয়ে গেল মগজে। ঝটকা দিয়ে হাত বাড়াল, 'দেখি, দাও বয়ামটা!'

সরিয়ে নিল কিশোর, 'আরে রাখো রাখো। আগে কথা শেষ করে নিই।' টেরির দিকে তাকাল সে, 'কি বুঝলে? ভেবেছিলে মুসা আমান মাকড়সা দেখলেই কুঁকড়ে যাবে? বমি করে ফেলবে? কিংবা ছুটে পালাবে? কোনটাই তো করল না ও। প্রমাণ কি হলো না, ও যে ভয় পায়নি?'

'না, হলো না,' জোরে জোরে মাথা নাড়ল টেরি। 'হাত ঢোকাতেই হবে। এবং পাঁচ মিনিট রাখতে হবে। এটাই শর্ত।'

'কত টাকা বাজি?'

'তুমিই বলো।'

'তুমি বলো।'

'দশ লাখ হলে কেমন হয়?' হেসে বলল কডি।

কঠিন কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর, 'তোমাকে বেচলে হবে দশটা পয়সা? ফুটানি তো করো টেরির পয়সায়।'

জ্বলে উঠল কডির চোখ। মুখ কালো করে ফেলল। কিন্তু কিশোরের কথার জবাব দিতে পারল না।

'পঞ্চাশ ডলার?' টাকি বলল।

'তোমাকেই বা কথা বলতে কে বলেছে?' খেঁকিয়ে উঠল কিশোর। 'আমি টেরির মুখ থেকে শুনতে চাই।'

টেরি বলল, 'আমার আপত্তি নেই।'

বয়ামটার দিকে তাকাল রবিন। দেয়াল বেয়ে উঠছে কালো কালো মাকড়সাগুলো। খসে পড়ছে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিচেরগুলোর সঙ্গে মারামারি বেধে যাচ্ছে। যে যাকে পারছে কামড়াচ্ছে। বিষাক্ত হলে সর্বনাশ হবে। মস্ত ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে কিশোর। মুসাকে এ ভাবে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেয়ার কারণ বুঝতে পারছে না।

'আমারও না,' টেরির কথার জবাব দিল কিশোর। 'তবে আরেকটু বেশি

হলে ভাল হত। যাকগে, টাকাটা তো আসলে কিছু না। তোমরা দেখতে চাইছ মুসার সাহস।'

'দাও বয়ামটা,' হাত বাড়াল টেরি।

দিয়ে দিল কিশোর।

টেবিলে রাখল সেটা টেরি। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধাতব মুখটা খুলে ফেলল। সহকারীদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'ঘড়ি দেখবে কে?'

'আমি,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল টাকি। অতি আগ্রহ তার। নিজের হাত ঘড়িটা নিয়ে এল চোখের সামনে।

মুসার দিকে তাকাল টেরি। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'পাঁচ মিনিট।'

'ঘড়ি ঠিক আছে তো ওর?' কিশোরের প্রশ্ন।

মাথা ঝাঁকাল টেরি, 'না থাকলে আরও পাঁচ-ছয়টা ঘড়ি আছে।'

সবাই ঘিরে এল মুসাকে।

মাঝখানে এসে দাঁড়াল কিশোর। মুসার দিকে তাকিয়ে সাহস দিল, 'দাও হাত। কি হবে? মাকড়সার বিষেও যে তোমার কিছু হয় না দেখিয়ে দাও ওদের। গ্রীনহিলসে তো এতবড় মাকড়সাটা কামড়েছিল, মারা গেছ? মরনি। এগুলোর কামড়েও কিছু হবে না তোমার। নিশ্চিন্তে হাত ঢোকাও।'

কিশোরের আচরণ অদ্ভুত ঠেকছে মুসার কাছে। ও তার সঙ্গে শত্রুতা করছে, না তার ভাল চায়, বুঝতে পারছে না। গ্রীনহিলসে বেড়াতে যাওয়া কিশোরের সঙ্গে রকি বীচের এই কিশোরকে মেলাতে পারছে না সে। কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল!

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছে টাকি। সেকেন্ডের কাঁটাটা বারোর ঘরে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, 'শুরু!'

লম্বা দম নিল মুসা। হাত কাঁপছে। বয়ামের মধ্যে ঢোকানোর সময় দেখে ফেলবে না তো ওরা!

আঙুলের মাথা ঢোকাল প্রথমে। ঠাণ্ডা লাগছে কাঁচের ছোঁয়া। চোখ বন্ধ করে আচমকা হাতের পুরোটাই ঠেলে দিল ভেতরে।

কয়েক সেকেন্ড কিছুই ঘটল না।

তারপর হাতের উল্টোপিঠে সুড়সুড়ে অনুভূতি। চোখ মেলে দেখল হাত বেয়ে উঠতে শুরু করেছে মাকড়সাগুলো।

নিজের অজান্তেই গোঙানি বেরিয়ে এল মুখ থেকে। ঠেকাতে চেয়েছিল। পারল না। সেটা ঢাকার জন্যে জোর করে হাসি ফোটাল মুখে।

কপালে ঘাম জমছে। বেশি হয়ে গেলে ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়বে। ঘামটা কি দেখতে পাচ্ছে কেউ?

না, বয়ামের মধ্যে হাতটা ছাড়া আর কোনদিকে চোখ নেই কারও।

হাতের তালুতে সুড়সুড়ি দিচ্ছে মাকড়সাগুলো। রোমশ পাগুলো বেয়ে বেয়ে উঠে আসছে কব্জির কাছে।

'তিরিশ সেকেন্ড!' ঘোষণা করল টাকি।

মুসার মনে হলো তিরিশ বছর।

কম করে হলেও বারোটা মাকড়সা এখন আঁকড়ে ধরে আছে তার হাত। চামড়া চুলকাচ্ছে। সারা শরীরেই চুলকানিটা ছড়িয়ে পড়ল যেন।

'এক মিনিট!' চিৎকার করে জানাল টাকি।

'এখনও চার মিনিট বাকি,' টেরি বলল। হাসিমুখে মুসার দিকে ঝুঁকল। 'কি বের করে আনবে? না পারবে?'

পারবে না!–বুঝে গেছে মুসা।

হাতের উল্টোপিঠে নাচানাচি শুরু করেছে মাকড়সাগুলো। কাঁটা কাঁটা রোমের খোঁচা লাগছে। দুটো মাকড়সা কব্জি পার হয়ে বেয়ে বেয়ে উঠে আসতে লাগল কনুইয়ের কাছে। থাবা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল ওগুলোকে। পা ধরে তুলে নিয়ে গিয়ে জানালা দিয়ে দুটোকেই বাইরে ফেলে এল কিশোর।

কুট করে কামড় মারল একটা মাকড়সা। ঝাঁকি দিয়ে হাতটা বের করে আনতে চাইল মুসা।

পারল না। বয়ামের মধ্যে আটকে গেছে হাতটা।

পাঁচ

বের করার জন্যে হাত মোচড়াতে শুরু করল মুসা। শক্ত হয়ে গেছে মুঠো।

যত চেষ্টা সব বিফল। হাত আর বেরোল না।

'দুই মিনিট,' ঘোষণা করল টাকি।

'কি করছ তুমি?' ভুরু নাচাল টেরি। 'হাত নাড়াচ্ছ কেন ওরকম করে?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'দেখলে তো?' হাসিমুখে টেরির দলের দিকে তাকাল কিশোর। 'মুসার সাহস দেখলে! পাগলের মত কামড়াচ্ছে, তা-ও হাত বের করছে না ও!'

পারলে তো কখন বের করে ফেলতাম!–কাঁদতে ইচ্ছে করছে মুসার।

আবার বের করার চেষ্টা করল হাতটা। পারল না। আটকেছে ভালমতই।

রবিন শঙ্কিত হয়ে আছে, বিষের ক্রিয়ায় কখন চোখ উল্টে দিয়ে পড়ে যায় মুসা। ভয়ঙ্কর এ খেলা ভাল লাগছে না তার।

বুড়ো আঙুলে কামড় মারল একটা মাকড়সা। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করল মুসা। চিৎকার করল না।

বের করা দরকার হাতটা! কি করা যায়? বাড়ি মেরে ভেঙে ফেলবে নাকি বয়ামটা?

কিশোর কোন সাহায্য করবে না, বুঝে গেছে। রবিনের দিকে তাকাল।

অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রবিন। একেবারে চুপ। বোবা হয়ে গেছে যেন। কি করবে সে-ও বুঝে উঠতে পারছে না। একটা ব্যাপার বুঝতে পারছে, টেরির কাজিন নিনা সত্যি কথাই বলেছে, যতই হেসে উড়িয়ে দেয়ার ভান করুক না কেন কিশোর। আজ যদি মুসা বাজিটা হারে, খেপানো শুরু হবে তাকে। গ্রীনহিলসের মত এখানেও জীবনটা নরক হয়ে যাবে ওর।

মুসার হাতের দুই পাশ দিয়েই এখন ওঠানামা করছে মাকড়সাগুলো। কব্জির কাছে ঘোরাফেরা করছে।

আবার তীক্ষ্ণ ব্যথা। আবার কামড়।

হাতটা বের করতে না পারলে নিস্তার নেই।

মাথা ঘুরছে মুসার। ঘরটা পাক খাচ্ছে চরকির মত। বেহুঁশ হয়ে যাবে না তো!

সুড়সুড়ি আর চুলকানি কোনমতে সহ্য করেছে। কিন্তু কামড়? এক কামড় খেয়েই তো মরতে বসেছিল। ভয়টা তখন থেকেই বেড়েছে। ভয় পাওয়াটা রোগ হয়ে গেছে। গ্রীনহিলসে নদীর ধারে বসে মাছ ধরছিল। গাছের ওপর থেকে টুপ করে ঘাড়ে পড়েছিল একটা মাকড়সা। কামড়ে দিল। থাবা দিয়ে ওটাকে ঘাড় থেকে ফেলে তীক্ষ্ণ ব্যথাটা ডলে সারানোর চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যে তীব্র যন্ত্রণা শুরু হলো। মাথা ঘুরতে লাগল। এবং বেহুঁশ।

চব্বিশ ঘণ্টা পর হাসপাতালে জ্ঞান ফিরল। ডাক্তার বললেন, ভাগ্যিস ওটা ব্ল্যাক উইডো স্পাইডার ছিল না। তাহলে মরে যেত মুসা। তবে যেটাতে কামড়েছে সেটাও কম বিষাক্ত নয়। মুসার ভাগ্য ভাল, সময়মত চিকিৎসা পেয়েছে। নইলে বাঁচা কঠিন হয়ে যেত।

তিন দিন পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল সে। কামড়ের জায়গাটায় টিপ দিলে ব্যথা লাগত। এক মাসেরও বেশি ছিল সেই ব্যথা। সবই জানে কিশোর। তারপরেও মাকড়সার বয়ামে হাত ঢোকাতে তাকে বাধ্য করল!

মাথা ঘুরছে। তারমানে এই মাকড়সাগুলোও বিষাক্ত!...যাচ্ছে...বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছে ও...

'পাঁচ মিনিট!' ঘোরের মধ্যে শুনতে পেল টাকির ঘোষণা।

মাথা ঝাড়া দিল মুসা। পরিষ্কার করতে চাইল ভেতরটা।

গুঙিয়ে উঠল টেরি। মাথা নেড়ে তিক্তকণ্ঠে বলল, 'জিতেই গেল!'

একে অন্যের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করতে লাগল পাঁচজনেই। হতাশ।

দুই হাত মাথার ওপর তুলে নাচতে লাগল কিশোর। চিৎকার করে বলল, 'রবিন, আমার জিতে গেছি! জিতে গেছি! পেয়ে গেলাম পঞ্চাশটা ডলার!' ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে যেন টাকার জন্যেই এতসব করেছে সে।

মুসার দিকে তাকাল। 'হয়েছে, মুসা। সময় শেষ। হাত বের করে আনো।'

ঢোক গিলল মুসা। গলাটা শুকিয়ে তুষের মত খসখসে হয়ে গেছে। হৃৎপিণ্ডটা এত জোরে লাফাচ্ছে, কথা সরছে না মুখ দিয়ে।

বয়ামের মধ্যে ওর হাত আটকে গেছে যখন বুঝতে পারবে, কি করবে টেরি? বলবে, না হয়নি, আবার নতুন করে শুরু করো?

জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট চেটে মুসা বলল, 'না, বের করব না। আমার মজা লাগছে। আরও কিছুক্ষণ রাখব।'

'অ্যাঁ!' হাঁ হয়ে গেল টেরি।

সব ক'টা চোখ এখন মুসার দিকে। সবগুলো চোখে বিস্ময়। ওর হাতের দিকে তাকাল রবিন। হাত বেয়ে উঠে আসছে মাকড়সাগুলো। বিড়বিড় করল, 'পাগল হয়ে গেল নাকি!'

'ঠিক, তা-ই হয়েছে!' চিৎকার করে উঠল কডি। 'আতঙ্কে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তারমানে ভীতু...'

কিশোর তার কথা কানেও তুলল না। 'দেখলে তো,' টেরির পিঠে এত

জোরে থাপ্পড় মারল সে, উপুড় হয়েই পড়ে যাচ্ছিল টেরি, 'আমাদের মুসা আমানের সাহস! পাঁচ মিনিট ওর জন্যে কিছু না। ও আরও রাখতে চায়। আরও পাঁচ মিনিট হয়ে যাক। কি বলো?'

'কিশোর, প্লীজ...' বলতে গেল মুসা।

শুনল না কিশোর। 'দাও, টাকা দাও,' টেরির দিকে হাত বাড়াল সে। 'পঞ্চাশ ডলার।' কি ভেবে ফিরিয়ে আনল হাতটা। 'দাঁড়াও দাঁড়াও, সময়টা যেহেতু ডাবল করা হবে, টাকাটাও ডাবল...'

'কিশোর...' কাতর অনুনয় ফুটল মুসার চোখে।

'টাকার জন্যে ভাবছ তো?' কিশোর বলল। 'কোন চিন্তা নেই। তোমার কাছে এখন না থাকলে আমি দিয়ে দেব। তবে আমারও দেয়া লাগবে না। জানি তো, তুমি হারবে না।' টেরির দিকে তাকাল, 'কি, একশো ডলারের কথা শুনেই ঘেমে যাচ্ছ?'

'কি যে বলো! ঠিক আছে, দেবো একশো!' রাজি হয়ে গেল টেরি।

মুসার হাতের ওপর হাঁটাহাঁটি করছে মাকড়সাগুলো। আবার কুট করে কামড়ে দিল একটা। ব্যথায় দপদপ করছে হাতটা।

মারা যাচ্ছি আমি!–হাল ছেড়ে দিল মুসা। 'আর বাঁচব না! আজ এই ঘরেই আমার মৃত্যু হবে! হায় খোদা, শেষ পর্যন্ত মাকড়সার কামড়ে মরণ লেখা ছিল আমার কপালে!'

'পরের বার অন্য কিছু ভেবে বার কোরো,' টেরিকে উপদেশ দিচ্ছে কিশোর। 'তবে পারবে না। কোন কিছুকেই ভয় পায় না মুসা,' হেসে রবিনের দিকে তাকাল। সমর্থনের আশায় বলল, 'তাই না, রবিন?'

মুখ চুন করে আছে রবিন। বুঝতে পারছে, টেরিকে খোঁচাচ্ছে কিশোর! উস্কে দিচ্ছে। প্রকারান্তরে সে নিজেই প্রস্তাব দিচ্ছে, আরেকটা বাজি হোক।

দশ মিনিটও শেষ।

হাসি উধাও হয়ে গেছে টেরি-বাহিনীর।

টেরিকে বলল কিশোর, 'যাও, তোমাদের একশো ডলার মাফ করে দিলাম। নিতে লজ্জা লাগছে। এত সহজ বাজি। মনে হচ্ছে টাকাটা নিলে ঠকানো হবে তোমাদের।'

'তাই নাকি?' অপমানে মুখ কালো হয়ে গেল টেরির। 'বেশ, মনে থাকল কথাটা। পরের বার যাতে ভয় পায়, এমন কিছুই নিয়ে আসব।'

'বাজির টাকাটাও বাড়াতে হবে তাহলে।'

'বাড়াব। যত বলো। এত সহজে ছাড়া পাবে না ও।'

'হ্যাঁ,' সুর মেলাল টাকি, 'পরের বার ওকে মু-স্মুসা বানিয়েই ছাড়ব।'

দলবল নিয়ে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে গেল টেরি।

মুসার দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর, 'কত সহজেই না টাকা রোজগার করা যায়, তাই না?'

'আমি যাচ্ছি মারা, আর তুমি করো টাকার চিন্তা!' ককিয়ে উঠল মুসা। 'জলদি খোলো আমার হাত! বয়ামে আটকে গেছে!'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'কিছু যে একটা হয়েছে, বুঝতেই পারছিলাম।'

'তাহলে পাঁচ মিনিটের পরই বিদেয় করে দিতে পারতে ওদের,' ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল রবিন।

জবাব দিল না কিশোর। মুসাকে বলল, 'তোমার হয়েছে আমাজনের বাঁদরের অবস্থা। জানো না কি করে বাঁদর ধরে ওরা?'

'দোহাই তোমার, কিশোর, লেকচার থামাও!' চিৎকার করে উঠল মুসা। 'আগে বয়ামটা খোলার ব্যবস্থা করো। নইলে আজ ঠিক কবরে যেতে হবে আমাকে।'

'খোলার ব্যবস্থাই তো করছি। না শুনলে বুঝবে কি করে কেন আটকে আছে হাতটা? আমাজনের শিকারিরা একটা বাঁশের মধ্যে ফল রেখে দেয়। বানরে হাতটা ঢোকায়। ফলটা তুলে নিয়ে যতই বের করতে চায় হাত আর বেরোয় না। ফলও ছাড়ে না, হাতও বেরোয় না। প্রথমে লোভ, তারপরে আতঙ্ক। মাথা যায় গরম হয়ে। কি করবে বুঝতে পারে না। শিকারি এসে ধরে ফেলে। কেন এমন হয় জানো? হাতটা ঢোকানোর সময় আঙুলগুলো সোজা থাকে, সরু থাকে, ফলটা তুলে নিলেই মুঠো বড় হয়ে যায়, বাঁশের ফাঁকে আটকে যায়...'

হাতের দিকে তাকাল মুসা। এখনও মুঠো করে আছে। খুলে নিল আঙুলগুলো। সহজেই বেরিয়ে এল হাতটা। ধপাস করে বসে পড়ল সোফায়। 'আ-আ-আমি একটা গা-গাধা!'

'গা-গাধাই হও আর যা-ই হও, সত্যি তোমার সাহস আছে...'

'ইয়ার্কি মারছ! আমি এদিকে মরে যাচ্ছি....উহ্!' হাত ডলতে লাগল মুসা।

'দেখি, কি হয়েছে?' এগিয়ে এল কিশোর। হাতটা তুলে নিল। 'বাপরে, কি ফোলা ফুলেছে! আগে বের করা গেলে এটাও দেখাতাম টেরিদের–তোমার সাহসের আরও বড়াই করা যেত; এত যন্ত্রণার পরেও বের করনি বলে। যাকগে, যা গেছে গেছে...'

কিশোরের কাণ্ড দেখে রেগে গেল রবিন, 'তোমার হলো কি, কিশোর!...ফালতু কথা বাদ দিয়ে আগে দেখো কোন ক্রীমটিম আছে কিনা।'

'আছে, আছে। নিয়ে আসছি।' দৌড়ে চলে গেল কিশোর।

মুসার দিকে তাকাল রবিন, 'বেশি ব্যথা করছে?'

'ব্যথার চেয়েও চুলকাচ্ছে বেশি।'

'হুঁ, তারমানে বিষাক্ত না মাকড়সাগুলো।'

'তা তো নয়ই। আমাকে যেটা কামড়েছিল সেটার মত হলে কখন মরে যেতাম...'

'আঁউক!' করে এক চিৎকার দিয়ে উঠল মুসা।

'কি হলো!' লাফ দিয়ে এগিয়ে এল রবিন।

জবাব না দিয়ে পাগলের মত জামার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে হাতড়াতে শুরু করল মুসা। একটা মাকড়সা বের করে এনে ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝেতে। রাগের চোটে পা দিয়ে মাড়িয়ে ভর্তা করল। কার্পেট নষ্ট হওয়ার পরোয়া করল না। মেরিচাচীর বকা খাবে এখন কিশোর। দুঃখ অনেকটা কমল ওর।

ক্রীম নিয়ে ফিরে এল কিশোর। 'হাতটা লম্বা করো, মাখিয়ে দিই।'

ওষুধের প্রভাবে চুলকানিটা কমল। তবে কামড়ের কারণে যে সব

জায়গা ফুলে গেছে ওগুলো ফুলেই রইল।

'মাকড়সাগুলো বিষাক্ত ছিল না, দেখেই চিনেছিলাম...' কিশোর বলল। 'বাথরুমে গিয়ে ঠাণ্ডা পানি ঢালো, সেরে যাবে। আমি দেখি, ফ্রিজে কি কি পাওয়া যায়।'

'থাক, আর লোভ দেখাতে হবে না,' উঠে দাঁড়াল মুসা। 'গরু মেরে জুতো দান!'

বাথরুমে এসে ঢুকল মুসা। পানি ঢালায় সত্যি কাজ হলো। আয়নার দিকে তাকাল। কি রকম বিকৃত করে রেখেছে মুখটা। স্বাভাবিক করল। পরক্ষণে একটা কথা মনে পড়তে আপনাআপনি বিকৃত হয়ে গেল আবার।

হুমকি দিয়ে গেছে টেরি, পরের বার আর এত সহজে ছাড়বে না। কি নিয়ে যে হাজির হবে, খোদাই জানে!

ছয়

'সত্যি, মাকড়সার বয়ামে যে ভাবে হাতটা ঢুকিয়েছিলে তুমি,' কিশোর বলল, 'আমি পারতাম না।'

'আর আমি হলে ঢোকাতামই না,' রবিন বলল। 'ভীতু, কাপুরুষ, যা খুশি বলে বলুকগে আমাকে টেরি।'

'রোজ রোজ ওসব শোনার চেয়ে সাহস দেখিয়ে মুখটা বন্ধ করে দিলেই কি ভাল না?'

'ঘুঁষি মেরে ওর নাক ফাটিয়ে দিতাম আমি...'

'টেরি তো একলা নয়। কজনের ফাটাবে?'

মাকড়সার বয়ামে হাত ঢোকানোর পরের আরেক শনিবার। কিশোরদের বাড়িতেই আড্ডা দিচ্ছে তিন গোয়েন্দা। সেদিনও কিশোরের চাচা-চাচী বাড়িতে নেই।

গত শনিবারের মত বৃষ্টি হচ্ছে না। আকাশ পরিষ্কার। তবে ঠাণ্ডা পড়েছে বেশ।

কিশোর আর রবিনের তর্কে যোগ দিতে পারল না মুসা। মানসিক অশান্তিতে রয়েছে সে। ভয়ানক দুশ্চিন্তা। পুরোটা সপ্তাহ ধরে তাকে ভয় দেখিয়েছে টেরি, 'কালটু-আমান, এবার দেখব কেমন তোমার সাহস। এমন প্ল্যান করেছি, তোতলাতেও ভুলে যাবে।'

কি করতে যাচ্ছে, জানতে চেয়েছে মুসা।

মুচকে হেসেছে টেরি, ভঙ্গি করেছে সিনেমার দুষ্ট ভিলেনের মত। 'আগেই বলব কেন...'

জানালার কাঁচে শব্দ হতে ধড়াস করে উঠল মুসার বুক। ভাবল টেরিরা এসে গেছে।

কিন্তু না, বারান্দার নয়, বাইরের দিকের জানালায় শব্দ হয়েছে। বোধহয় ডালটাল বাড়ি খেয়েছে।

কিশোর আর রবিনের তর্ক তুঙ্গে উঠেছে, এই সময় ফোন বাজল। উঠে গিয়ে ধরল কিশোর। মিনিটখানেক কথা বলে ফিরে এল হাসিমুখে, 'টেরিরা

আসছে।'

আঁতকে উঠল মুসা, 'মানা করে দিলে না কেন?'

'মানা করব কেন? ও ব্যাটাদের কাছে হারব নাকি?'

'কি বলল?'

'জানতে চাইল, তুমি আছো নাকি। বাড়িতে অন্য কেউ আছে কিনা।'

'আমি যাই,' উঠে দাঁড়াল মুসা।

'আরে কি করছ!' হাত ধরে টেনে ওকে বসিয়ে দিল কিশোর। 'মুখে চুনকালি মাখাবে নাকি শেষে! কোনও দিন আর স্কুলে গিয়ে শান্তি পাবে মনে করেছ?'

'আ-আ-আমি বাবাকে বলে অন্য শহরে চলে যাব। অন্য স্কুলে ভ-ভ-ভর্তি হব...'

'তাতে লাভটা কি? ওখানে গিয়েও তো ভ-ভই করবে। মূল জিনিসটা না উপড়াতে পারলে শান্তি পাবে না কোনখানে গিয়েই।'

উড়ে চলে এল যেন টেরিরা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বেল বাজল।

মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল মুসার। 'আমি বাথরুম থেকে আসি!'

'কেন?'

'মাথায় পানি দেব।'

'দরকার নেই, বসে থাকো। ওরা বুঝে যাবে তুমি ভয় পেয়েছ।' দরজা খুলে দিতে চলল কিশোর। 'যেটা তুমি নও, সেটা মানুষকে বোঝাতে যাও কেন?'

'কিশোর, তুমি বুঝতে পারছ না,' অনুরোধের সুরে বলল মুসা, 'আমার সাহস সত্যি নেই। আগে যা-ও বা ছিল, মাকড়সাটা কামড়ে দেবার পর আর ছিটেফোঁটাও নেই...'

আবার বেল বাজল। অস্থির হয়ে গেছে টেরির দল।

দরজা খুলে দিল কিশোর।

'খুলতে এত দেরি কেন?' মাথা ঢুকিয়ে উঁকি দিল টেরি। 'প্যান্ট বদলাচ্ছে নাকি মু-মুসা!' খিকখিক করে হাসল সে।

কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল কিশোর, 'প্যান্ট বদলাবে কেন?'

'ভয়ে খারাপ করে ফেলেছে হয়তো...'

'ওই তো সোফায় বসে আছে। কেন, সেদিন মাকড়সা নিয়ে এসে শিক্ষা হয়নি? কথা কম বলো,' হুমকি দিল কিশোর। 'নইলে বাজিটা অন্য রকম হবে বলে দিলাম।'

'কি রকম? টাকা বাড়াবে?' পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল টাকি।

'না। হেরে গেলে গায়ের কাপড় খুলে রেখে বাড়ি যেতে হবে তোমাদের।'

কডি বলল, 'না না, টাকাই ভাল...'

'কেন, নিজেরাই ঘাবড়ে গেলে?' ভুরু নাচিয়ে হাসল কিশোর।

'অ্যাই, তুমি চুপ থাকো!' ধমক লাগাল কডিকে টেরি। কিশোরের দিকে তাকাল, 'তাহলে বাজিটা এখনও বহাল আছে? শিওর হতে এলাম। ওটা গিয়ে নিয়ে আসতে হবে তো আমাদের। বাজি যদি না-ই থাকে শুধু শুধু ঝামেলা...'

'তোমরা কি, বলো তো?' রেগে উঠল কিশোর। 'ফোনেই তো বলে দিলাম যা বলার...'
'কিন্তু প্ল্যান বদলেছি আমরা।'
'বদলেছ মানে?'
'প্রথম যে জিনিসটা আনার কথা ছিল, সেটা আনিনি।'
'সেটা কি ছিল?'
'আনতে চাই না যখন, শুনে আর কি করবে?'
'তাহলে এখন কি আনতে চাও?'
ফিরে তাকাল টেরি। বন্ধুদের জিজ্ঞেস করল, 'কি, আগেই বলে দেব?'
'বলো,' টাকি বলল। 'জেনেশুনে আগে থেকে মনের জোর বাড়িয়ে রাখুক মু-মুসা। অত নির্দয় যে নই আমরা, সেটাও বুঝুক।'
মাথা ঝাঁকিয়ে কিশোরের দিকে ফিরল আবার টেরি।
উৎকর্ণ হয়ে আছে মুসা। টেরি কি বলে শোনার জন্যে। রবিনেরও কান খাড়া।
টেরি বলল, 'একটা সাপ আনব। বড়। বিষাক্ত। ওটার মুখে চুমু খেতে হবে তোমাদের তোতলা মু-মুসাকে। পারবে নাকি জিজ্ঞেস করো।'
বলে কি! হাঁ হয়ে গেল মুসার মুখ।
কিন্তু কিশোরের হাসি এক বিন্দু মলিন হলো না। 'দূর! ভেবে ভেবে শেষে এই জিনিস বের করেছ? হায়রে কপাল, এই না হলে শুঁটকির বুদ্ধি! এ তো মাকড়সার চেয়েও সোজা!'
'বলছ!'
'তো আর কি বলব? জানো, কত সাপ ঘেঁটেছে মুসা? এক ভারতীয় বেদের সঙ্গে ভাব হয়ে গিয়েছিল মুসার, গ্রীনহিলসে থাকতে,' নির্বিকার কণ্ঠে বলে চলল কিশোর। 'সাপ খেলানো শিখেছে তার কাছে। তারপর থেকে তো মুসার জয়-জয়কার। মেলা হলেই সার্কাসের লোকের ডাক আসত তার কাছে। ডেকে নিয়ে যেত। কত যে প্রশংসা আর পুরস্কার পেয়েছে সে।'
'তাই নাকি?' সন্দেহ দেখা দিল টেরির চোখে।
'কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না?'
'নিনা তো সাপ খেলানোর কথা কিছু বলল না?'
'ও তোমার বোন। তোমার মতই চরিত্র। ও কি আর কারও ভালটা বলতে যাবে?'
দমে গেল মনে হলো শুঁটকি। ফিরে তাকাল বন্ধুদের দিকে। আবার ফিরল কিশোরের দিকে। হাসি ফোটাল মুখে। 'ও তুমি যা-ই বলো, নিজের চোখে না দেখে বিশ্বাস করছি না আমি।' বারান্দায় বেরিয়ে গেল সে। সহকারীদের বলল, 'অ্যাই, চলো হে, নিয়ে আসিগে।'
কিশোরের মিথ্যের বহর শুনে রবিনও হতবাক। কিশোর দরজা লাগিয়ে ফিরে আসতেই বলে উঠল, 'এ সব বাহাদুরি না করলে কি চলত না?'
'না, চলত না। শঠে শাঠ্যং। ওরা যেমন, ওদের ওভাবেই জবাব দিতে হবে।'
'কি-কি-কিন্তু কেউটে আনে না র‍্যাটল আনে,' মুসা বলল, 'ঠিক আছে কিছু? সাপের মুখে চুমু খাব কি করে!'

'খাবে। তাতে অসুবিধে কি?' মুচকি হাসল কিশোর।
'তোমার কি হয়েছে বলো তো, কিশোর! তুমি আমাকে কায়দা করে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চাইছ নাকি? খুনের মোটিভটা কি? কি করেছি আমি? আমার তো কোন টাকা-পয়সা জমানো নেই, ইনশুরেন্স-ফিনশুরেন্সও নেই...'
'চুপ করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকো। সাপ ওরা আনবে না।'
'যদি আনে?'
'যদি আনে, তখন দেখা যাবে। তবে আমার এত কথার পর সাপ ওরা আনবে না, লিখে রাখতে পারো। ওদের ধারণা হয়ে গেছে, সাপকে তুমি ভয় পাও না। এনে লাভ হবে না।'
কিন্তু শুঁটকি টেরিকে বিশ্বাস নেই। নিশ্চিন্ত হতে পারল না মুসা।

*

বার বার ঘড়ি দেখছে কিশোর। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, টেরিরা গেছে, এখনও আসার নাম নেই।
রবিন বলল, 'আসবে না নাকি?'
'না এলেই তো ভাল,' মুসা বলল। 'আসছে না দেখে তুমিও মনে হয় হতাশ! তোমরা কি আমাকে পাগল পেয়েছ...'
কথা শেষ হলো না মুসার। দরজার বাইরে থেকে ভেসে এল আতঙ্কিত চিৎকার, 'কিশোর, দরজাটা খোলো তো, ভাই! জলদি!'
লাফ দিয়ে উঠে ছুটে গেল কিশোর। হাতল ঘুরিয়ে হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেলল দরজা।
দরজায় দাঁড়ানো টাকি। চিৎকার দিয়ে উঠল, 'জলদি এসো! সর্বনাশ হয়ে গেছে!'
বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।
কডির পেছনে হ্যারল্ড আর নিটুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল মুসা। তারপর দেখতে পেল টেরিকে।
দুই হাত দিয়ে দুই চোখ চেপে ধরে রেখেছে টেরি। টকটকে লাল রক্ত গড়িয়ে নামছে গাল বেয়ে।
তাকে ধরে ধরে নিয়ে ঘরে ঢুকল নিটু আর হ্যারল্ড।
'তোমার চাচা-চাচী বাড়ি আছে, কিশোর?' চিৎকার করে বলল কডি। 'আমাদের সাহায্য দরকার!'
'না। কি হয়েছে?' জানতে চাইল কিশোর।
'একটা বড়...বিষাক্ত সাপ নিয়ে এসেছিলাম আমরা,' টাকি জানাল। 'ঝাঁপির ঢাকনা তুলতেই পালাল ওটা। টেরি ছুটল ওটার পেছনে। জঞ্জালের মধ্যে ঢুকে পড়ল সাপটা। দৌড়ে ধরতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে লোহা-লক্কড়ের মধ্যে পড়ে দেখো কি অবস্থা হয়েছে ওর!'
'শিকের খোঁচা লেগে একটা চোখ গলে বেরিয়ে চলে এসেছে,' আবার চিৎকার করে উঠল কডি।
'আহ্!' গুঙিয়ে উঠল টেরি।
ধীরে ধীরে ডান হাতটা নামাল চোখের ওপর থেকে। হাতের তালু মেলে দেখাল।

খুলে চলে আসা রক্তাক্ত বিশাল চোখটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল তিন গোয়েন্দা।

'আহ্, আমাকে...আমাকে বাঁচাও, মুসা!' গোঙাতে গোঙাতে বলল টেরি। 'তোমার অভিশাপেই অমন হয়েছে। প্লীজ, কিছু একটা করো!'

'ডাক্তার ডাকো, ডাক্তার!' চিৎকার করে বলল কডি। 'অ্যামবুলেন্স!'

'আহ্...বাঁচাও আমাকে...কি যন্ত্রণা...মাগোহ্!' ক্রমাগত গোঙাচ্ছে টেরি।

ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে খুলে আসা চোখটা। পেটের মধ্যে মোচড় দিচ্ছে মুসার। মুখে হাত চাপা দিল বমি ঠেকানোর জন্যে।

অস্ফুট শব্দ করে উঠল কিশোর।

রবিনও তাকাতে পারছে না চোখটার দিকে।

মুসা তাকিয়ে আছে।

'দাঁড়িয়ে আছো কেন তোমরা...' ককাতে ককাতে টেরি বলল। 'কিছু একটা করো না!...উফ্, কি ব্যথা!'

চোখটার দিকে তাকিয়েই আছে মুসা।

ছুটে গেল হঠাৎ। টেরির হাত থেকে এক থাবায় চোখটা তুলে নিয়ে লজেন্সের মত ছুঁড়ে দিল মুখের মধ্যে। চুষতে শুরু করল।

সাত

চিৎকার করে উঠল কিশোর।

ঘৃণায় মুখ বাঁকাল রবিন।

ভীষণ চমকে গিয়ে টাকিও চেঁচিয়ে উঠল। হাঁ হয়ে গেছে কডি আর বাকি তিনজন।

টেরির দিকে ফিরে চোখটা এ গাল-ওগাল করতে থাকল মুসা।

হাসতে শুরু করল টেরি। অন্য হাতটা নামিয়ে আনল চোখের ওপর থেকে।

ঠোঁট ফাঁক করে জিভের ডগায় চোখটা বসিয়ে সামনে ঠেলে দিল মুসা।

টাকি হাসল। হাসতে লাগল কডি, নিটু আর হ্যারল্ড।

মুখ থেকে চোখটা হাতের তালুতে ফেলে দিল মুসা। ছুঁড়ে দিল টেরির দিকে। 'দেখতে একেবারে আসল চোখের মত। প্ল্যাস্টিকের। মলের কার্ড স্টোর থেকে কিনেছ, তাই না? আজই দেখে এলাম, সকাল বেলা। হ্যালোউইন ডিসপ্লেতে সাজিয়ে রেখেছিল।'

'হ্যাঁ,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল টাকি।

কিশোরের দিকে তাকাল টেরি। 'পেপার টাওয়েল আছে? নকল রক্তটা মুখ থেকে মুছে ফেলতাম। ফোঁটা পড়ে কাপড় নষ্ট হচ্ছে।'

কিশোর চলে গেল পেপার টাওয়েল আনতে।

ফিরে এল মিনিটখানেকের মধ্যে। বড় একটা কাগজের দলা তুলে দিল টেরির হাতে। 'দেখলে তো? আমরা সবাই ভয় পেয়ে গেলাম, কিন্তু চোখের পাপড়িটাও একবার কাঁপেনি মুসার। তা, এটাই তোমার দুই নম্বর চ্যালেঞ্জ

নাকি? বললাম না, মুসাকে ভয় দেখাতে হলে সত্যিকারের ভয়াল জিনিস দরকার।...যাও, আজও নেব না টাকা। এত সহজ কাজের জন্যে টাকা নিতে নিজের কাছেই খারাপ লাগে।'

চোখটা টোকা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল টেরি। কিশোরের কাঁধে বাড়ি খেয়ে কার্পেটে পড়ল সেটা।

'এটা আমাদের চ্যালেঞ্জ নয়, শার্লক পাশা,' টাকি বলল, 'সামান্য রসিকতা করলাম তোমাদের সঙ্গে। দেখলাম চেষ্টা করে মু-ম্মুসা রাক্ষসটার রাতের খাওয়াটা মাটি করতে পারি কিনা।'

'বরং খিদেটা আরও বাড়িয়ে দিলে ওর, টাকি মাছ!' কিশোর বলল। 'টাকি মাছের ভর্তা খাওয়ার জন্যে প্রাণ এখন আনচান করতে থাকবে ওর।'

ভাবছে মুসা, কি সাংঘাতিক বাঁচা বেঁচে গেছে। ভাগ্যিস মনে দেখে এসেছিল চোখটা। নইলে বমি করে ভাসিয়ে ফেলত এতক্ষণে।

মাটি থেকে চোখটা তুলে নিয়ে হ্যারল্ডের দিকে ছুঁড়ে মারল কডি। হ্যারল্ড আবার মারল নিটুকে। ঘরের মধ্যে চোখ ছোঁড়াছুঁড়ি খেলা শুরু করে দিল ওরা।

মুখ থেকে লাল রঙ মুছে ফেলল টেরি। কাগজটা দলা পাকিয়ে আচমকা টোকা দিয়ে ছুঁড়ে দিল মুসার মুখ লক্ষ্য করে।

বোধহয় সেদিকে নজর থাকাতেই চোখটা ধরতে মিস করল কডি। একটা ল্যাম্পের ওপর গিয়ে পড়ল সেটা। নড়ে উঠল ল্যাম্পটা, কিন্তু পড়ল না।

'কি করছ!' ধমকে উঠল কিশোর। 'সামান্য ভদ্রতাটাও শেখনি নাকি? চাচা-চাচী এসে পড়বে এক্ষুণি। তোমাদের এ সব করতে দেখলে খুশি হবে না।' টেরির দিকে ফিরল সে, 'তারমানে সাপ তুমি আননি?'

মাথা নাড়ল টেরি। 'না, পরে ভেবে দেখলাম, ঠিকই বলেছ তুমি, সাপ জিনিসটা ভয়াল কিছু না। যে কেউ হাতে নিতে পারে।...ভাগ্যক্রমে আবারও জিতে গেলে তুমি হিরো মিয়া।' মুসার কাঁধে চাপড় দিল সে। 'তবে তোমাকে আমি মু-ম্মুসা না বানিয়ে ছেড়েছি তো আমার নাম টেরিয়ার ডয়েল নয়।'

'ভালই হবে,' কিশোর বলল। 'শেষ পর্যন্ত বাপের দেয়া নামটা বদলে আমাদের দেয়া নামটাই ব্যবহার করতে হবে তোমাকে–শুঁটকি টেরি।...কিন্তু হেরে গিয়েও অত বড় বড় কথা কেন? মুসাকে ভয় পাওয়ানো তোমাদের কম্মো নয়। বাজি আর তোমরা কোন কালেই জিততে পারলে না।'

'তাই নাকি?' মুখ বাঁকাল টাকি। 'টেরির প্ল্যান কি, কল্পনাও করতে পারবে না তোমরা। বাজির টাকাটা আগেভাগেই দিয়ে রাখতে পারো আমার কাছে। হেরে তোমরা যাবেই।'

'তোমাদের আসলে লজ্জা-শরম একেবারেই নেই,' নিমের তেতো ঝরল কিশোরের কণ্ঠে। 'দুই-দুইবার টাকা মাপ করে দিলাম, আর এখন টাকা দেয়ার কথা তুলছ। জেতার বেলায় নাম নেই, আগেই টাকা দিই, তাই না? যাও, টাকা আমরা নেবই না। বাজি হবে অন্যভাবে। টেরি বলেছে, মুসাকে হারাতে না পারলে তার নাম টেরিয়ার ডয়েল নয়। খুব ভাল কথা। এবারের বাজি, হারলে আমরা যে নামে ডাকব ওকে, সেটা বহাল করতে হবে। ওর

নাম হবে স্রেফ শুঁটকি। সারা স্কুলে ছড়িয়ে চাউর করে দেব সেটা আমরা।'
'তা দিও, পারলে,' দমল না টাকি। 'ওর প্ল্যানটা জানলে এখনই প্যান্ট খারাপ করে বাথরুমে দৌড়াত তোমাদের মু-মুসা মিয়া।'
'কি প্ল্যান?' দুর্বল কণ্ঠে জানতে চাইল মুসা।
টেরির তিলে-পড়া মুখে মুচকি হাসি ফুটল। 'আগাম ইঙ্গিত চাইছ তো? বেশ বলছি। আমাদের একটা ফিউনরল পারলার আছে, জানো তো?'
'জানি,' জবাবটা দিল কিশোর। 'তাতে কি?'
হাসি ছড়িয়ে পড়ল টেরির সারা মুখে। 'তাতে? নিজের বুদ্ধির তো খুব বড়াই করো। আন্দাজ করে নাও।'

আট

সোমবার লাঞ্চের সময় ক্লাস থেকে বেরিয়ে ক্যাফিটেরিয়ার দিকে রওনা হয়েছে মুসা আর কিশোর। রবিনকে দেখতে পেল না। সে বেরিয়েছে ওদের আগে। ডেকে নিয়ে গেছে নাইনথ্ গ্রেডের মরফি।
হলের মোড় ঘুরতেই কানে এল হই-চই, রাগত চিৎকার।
অন্যপাশে এসে টাকিকে দেখতে পেল মুসা আর কিশোর। ওদের দেখে চিৎকার করে বলল, 'জলদি যাও! রবিনকে পেটাচ্ছে মরফি।'
দৌড়ে গেল দুই গোয়েন্দা। রবিনের কলার চেপে ধরেছে মরফি। বিশালদেহী ছেলেটার সঙ্গে পাত্তাই পেল না রবিন। তাকে শূন্যে তুলে নিয়ে গিয়ে ঠেসে ধরল টাইলস বসানো দেয়ালে।
'ছাড়ো! ছাড়ো আমাকে!' ছাড়া পাওয়ার জন্যে ছটফট করছে রবিন।
খলখল করে হেসে উঠল মরফি, 'না ছাড়লে কি করবে? মারবে? মারো! মারো!'
রবিনকে মাটিতে নামাল সে। কাঁধ দিয়ে প্রচণ্ড এক গুঁতো লাগাল রবিনের বুকে। কলার ছাড়ল না। হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল একটা লকারের কাছে। হ্যাঁচকা টানে লকারের দরজা খুলে তার মধ্যে ঠেসে ভরতে শুরু করল।
'অ্যাই, মরফি! ও কি করছ!' এতক্ষণে যেন সংবিত ফিরে পেল কিশোর। ধমকে উঠল, 'ছাড়ো ওকে!' রবিনকে সাহায্য করার জন্যে এগোতে গিয়েও কি ভেবে এগোল না। থমকে গিয়ে মুসার দিকে তাকাল, 'হাঁ করে চেয়ে দেখছ কি? ছাড়াও না ওকে! শিক্ষা দিয়ে দাও মরফিকে!'
'আ-আ-আমি!' এখানে সবার সামনে তোতলানো নিরাপদ নয়, ভুলে গেছে মুসা। পিছিয়ে গেল এক পা।
'যাও! যাও!' মুসাকে ঠেলে দিল কিশোর। 'একমাত্র তুমিই ওর সঙ্গে পারবে।'
'হ্যাঁ হ্যাঁ, যাও না, হিরো মিয়া,' টাকি বলল। 'তুমি তো কোন কিছুকেই ডরাও না। গায়ে-গতরেও বড়ই। একচোট দেখিয়ে দাও মরফিটাকে। বড্ড

বাড় বেড়েছে পাজিটার। যাকে পায় তাকেই মারে।'
ঢোক গিলল মুসা, 'কিন্তু...আমি...আমি...'
'আরে আমি আমি করছ কেন? তোমার বন্ধুকে পেটাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ না? বন্ধুর জন্যে মায়া-দরদ নেই? নাকি ভয় পেয়ে গেলে?'
'যাও,' আবার মুসার পিঠে ঠেলা মারল কিশোর। 'মরফি তোমার কাছে নস্যি। তুষের মত উড়িয়ে দাও ওকে। ভেঙে চুরচুর করো!'
লকারে ঢুকিয়ে রবিনকে ঠেলতেই আছে মরফি। বুকে হাত দিয়ে ঠেসে ধরে রেখে বলল, 'বলো, গু খাই!'
'তা কেন বলব!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রবিন। ফুসফুসে চাপ পড়াতে গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ বেরোল।
হাতটাকে মুঠো করে তার বুকে প্রচণ্ড এক গুঁতো মারল মরফি। ব্যথায় কাতরে উঠল রবিন। আবার বলল মরফি, 'বলো জলদি, গু খাই! নইলে ছাড়ব না।'
'না, বলব না!'
তাতে যেন খুশিই হলো মরফি। রবিনকে অত্যাচার করার সুযোগ পেল। ওর পেটে ঠেসে ধরল মুঠো পাকানো হাতটা। জোরে চাপ দিতে লাগল।
আর্তনাদ করে উঠল রবিন।
'তুমি কি, মুসা?' তিরস্কার করল কিশোর। 'এখনও যাচ্ছ না!' প্রচণ্ড এক ধাক্কা মারল মুসার পিঠে।
মরফির গায়ের ওপর গিয়ে পড়ল মুসা।
হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল মরফি। কোনমতে সামলে নিল। ঝাড়া মেরে পিঠ থেকে সরিয়ে দিল মুসাকে। তারপর সোজা হয়ে ঘুরে দাঁড়াল।
পিছিয়ে গেল মুসা।
হেসে উঠল টাকি, 'ভয় পেয়েছে, ভয় পেয়েছে, তোতলাটা ভড়কে গেছে...'
কিন্তু ওর মুখের কথা শেষ হলো না। মাথা নিচু করে তীব্র গতিতে ছুটে গেল মুসা। মরফির পেটে লাগল মাথাটা। হুঁক করে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে এল মরফির মুখ দিয়ে। ব্যথায় নীল হয়ে গেল মুখ। নিগ্রোর খুলির ভয়ঙ্কর আঘাতে বাঁকা হয়ে গেছে। দমল না তারপরেও। হাত বাড়াল মুসার কলার ধরার জন্যে। সরে গেল মুসা। প্রচণ্ড রাগে অন্ধ হয়ে তাকে ধরার জন্যে ছুটে এল সে।
চট করে এক পাশ থেকে একটা পা সামনে বাড়িয়ে দিল কিশোর। কারও চোখে পড়ল না সেটা। মরফিরও না। হোঁচট খেয়ে উড়ে গিয়ে মেঝেতে পড়ল সে।
ছেলেমেয়েরা ঘিরে দাঁড়িয়েছে ওদের। দুই দলেরই সমর্থক আছে। হট্টগোল করছে সবাই। চেঁচিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে।
মরফি পড়ে যেতেই হাততালি দিতে শুরু করল মুসার পক্ষের সমর্থকরা। হাসতে লাগল। শিস দিল।
কাবু হয়ে গেছে মরফি। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল। মুখ টকটকে লাল।

হঠাৎ জেগে ওঠা আবেগ কেটে গেছে মুসার। ভয়টা ফিরে এসেছে। মরফি যখন হুমকি দিল, 'দেখে নেব আমি! ছাড়ব না!'–এক পা পিছিয়ে গেল মুসা।

সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর। 'এখনও বাহাদুরি? বড় বড় কথা! যাও যাও, যা পারো কোরো। মুসা আমান কাউকে ভয় পায় না।'

জ্বলে উঠল মরফির চোখ। পারলে কিশোরকেই মেরে বসে। কিন্তু সাহস করে উঠতে পারল না। লকার থেকে রবিনও বেরিয়ে চলে এসেছে ততক্ষণে। তিনজনের সঙ্গে কোনমতেই পারবে না বুঝে মানে মানে কেটে পড়ল ওখান থেকে।

তার সঙ্গে চলে গেল তার সমর্থকরা।

বাকি সবাই প্রচুর চিৎকার-চেঁচামেচি করছে। কেউ শতমুখে প্রশংসা করতে লাগল মুসার। কেউ বা এসে পিঠ চাপড়ে দিয়ে আন্তরিকতা প্রকাশ করল।

চারপাশে তাকিয়ে টাকিকে কোথাও দেখল না কিশোর। মুচকি হাসল সে। টেরির আরেকটা প্ল্যান বরবাদ হয়েছে।

*

লাঞ্চের পর আবার ক্লাস। সবাই আরেকবার হিরোর সম্মান দিতে লাগল মুসাকে। মেজাজটা তাই ওর ফুরফুরে লাগছে। আত্মবিশ্বাস ফিরে আসতে শুরু করেছে। যে ভাবে এগোচ্ছে, এখানে তাকে 'তোতলা মুসা' বলার সাহসই পাবে না হয়তো আর কেউ। বিশেষ করে মরফিকে পেটানোর পর।

কিন্তু ক্লাস শেষে এমন একটা ঘটনা ঘটল, আবার চুরমার হয়ে গেল তার বিশ্বাস। ফিরে এল পুরানো ভয়টা। ঘণ্টা বাজার পর ক্লাস থেকে বেরিয়ে লকারের দিকে এগোচ্ছে, হঠাৎ কানে এল টেরি আর টাকির কথা। নিজের নাম শুনে থমকে দাঁড়াল মুসা। কান খাড়া করে শুনতে লাগল।

টাকি বলছে, 'সত্যি করবে?'

'নিশ্চয়ই,' জবাব দিল টেরি। 'মরফি হাঁদাটা যে এমন করে কেঁচে দেবে সব কে জানত!...তবে আমি কেলোটাকে মু-মুসা না বানিয়ে ছাড়ব না।'

একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে মুসা। মনে হলো, টেরি আর টাকি তাকে দেখেছে। তাই নিজেরা কথা বলার ছলে ইচ্ছে করেই এ সব শোনাচ্ছে।

'কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে, টেরি,' টাকি বলল। 'এত ভয়ানক!...নাহ্, এতটা করা ঠিক হবে না।'

'এতটাই করব! শুধু তাই না, দরকার হলে আরও ভয়ঙ্কর কিছু করতেও দ্বিধা করব না আমি।'

নয়

কয়েক রাত পর। মুসাদের ডাইনিং রুমের টেবিলে হুমড়ি খেয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। সবাই মিলে হোমওঅর্ক করছে। মুসার বাবা-মা বাড়ি নেই। বাড়িতে সে একা। তাই ফোন করে আনিয়ে নিয়েছে

দুই বন্ধুকে। তিনজনেই গভীর মনোযোগে অঙ্কের সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত।

এই সময় দরজার ঘণ্টা বাজল। এতটাই চমকে গেল মুসা, কাগজে চাপ লেগে পেন্সিলের সীস ভেঙে গেল। হঠাৎ করেই মনে হলো তার, নিশ্চয় টেরির দল। আবার এসেছে তার সাহস পরীক্ষা করতে।

এত আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই–মনে মনে নিজেকে বোঝাল মুসা। দেখাই যাক না আগে কে এসেছে।

উঠে দরজা খুলতে এগোল সে। পেছন পেছন চলল কিশোর।

দরজা খুলে দিল মুসা। ঠিকই অনুমান করেছে সে। টেরির বাহিনীই। ঘরে ঢুকল টাকি। গায়ে নীল জ্যাকেট। মাথায় উলের স্কি হ্যাট। 'বাপরে বাপ, বাইরে কি ঠাণ্ডা!'

টান দিয়ে টুপিটা খুলে নিয়ে অস্বস্তিভরে চারপাশে তাকাতে লাগল সে। 'মুসা, সত্যি ভাই, আমি দুঃখিত। অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছি ওকে। থামাতে পারিনি?'

'তাই নাকি?' মুসার আগেই জবাব দিল কিশোর, 'কিসের দুঃখ? কাকে থামাতে পারনি।'

উঠে এসে রবিনও দাঁড়াল ওদের পেছনে। 'আরে ধূর, কিসের থামাথামি!' হাত নেড়ে বলল সে। 'বুঝতে পারছ না, নাটক করে মুসাকে ঘাবড়ে দেয়ার চেষ্টা করছে।'

'কিন্তু তাতে কোনই লাভ হবে না,' বুড়ো আঙুল নাড়ল কিশোর। 'ঘটে সামান্যতম ঘিলু থাকলে এতদিনে বুঝে যাওয়া উচিত ছিল ওদের, মুসাকে ওরা ভয় দেখাতে পারবে না।'

'কিন্তু, দেখো, কিশোর,' শান্তকণ্ঠে বলল টাকি, 'মুসা তোমার বন্ধু। উত্তেজিত করে করে এ ভাবে ওকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেয়া তোমার উচিত হচ্ছে না। তোমরা জানো না টেরি এবার কি করতে চলেছে। অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছি ওকে। শুনল না। সে করবেই করবে। এ বাজি তাকে জিততেই হবে।'

অজানা আশঙ্কায় মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল শিহরণ বয়ে গেল মুসার। সেদিন স্কুলে আড়ালে দাঁড়িয়ে শোনা কথাগুলো মনে পড়ে গেল। ভাঁজ হয়ে আসতে চাইল হাঁটু। টাকি যাতে বুঝতে না পারে, সেভাবে সরে গিয়ে একটা কাউচের হেলান খামচে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবছে, বাদ দেয়া দরকার এ খেলা! টেরিকে বিশ্বাস নেই। বাজি জেতার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে সে। কি করবে কে জানে!

'আমি টেরির সঙ্গে একমত হতে পারলাম না বলেই তোমাদের সতর্ক করে দিতে এলাম,' টাকি বলল। 'ভয়ানক কোন বিপদ যদি ঘটে যায় পরে আমাকে দোষ দিতে পারবে না।'

ঢোক গিলল মুসা।

'ভয়ানক কোন বিপদে যদি পড়ে কেউ,' শীতল কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর, 'তো পড়বে তোমার ওস্তাদ শুঁটকি আর বাকি চামচাগুলো। মুসার কিছু হবে না। তোমার ওস্তাদকে গিয়ে বলে দাও, যা ইচ্ছে সে করতে পারে। তবে এবার আর টাকা মাপ করব না আমরা। দুশো ডলার যেন রেডি রাখে।'

‘টাকাটা বরং তোমরাই নিয়ে যেয়ো পকেটে করে।’ মুসার দিকে তাকাল টাকি, ‘মুসা, মনে রেখো বিপদটা তোমার হবে, আর কারও না।’

কটাক্ষটা যে তাকে উদ্দেশ্য করেই করা হয়েছে, বুঝতে পারল কিশোর। ‘তুমি আসলে বেশি কথা বলো। কে বলেছে তোমাকে ভালমানুষী দেখাতে আসতে? মুসা চ্যালেঞ্জটা নিয়েছে, যত বিপজ্জনকই হোক। ওসব বোলচাল না ঝেড়ে কি করতে হবে এখন তাকে, সেটা বলো।’

হতাশ ভঙ্গিতে জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল টাকি। টুপিটা মাথায় দিল আবার। ‘যাবেই?’

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, ‘হ্যাঁ।’

‘বেশ। কোট-টোটগুলো পরে এসো আমার সঙ্গে।’

*

টাকির সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। দরজায় তালা দিল মুসা। ওর বাবার কাছে বাড়তি চাবি আছে। দরজা খুলতে অসুবিধে হবে না।

অক্টোবরের ঠাণ্ডা রাত। তা ছাড়া শীতটা এবার তাড়াতাড়ি পড়াতে ঠাণ্ডাটা জাঁকিয়ে বসেছে। তার ওপর রয়েছে ঝোড়ো বাতাস, লনের শুকনো ঝরা পাতায় ঘূর্ণি তুলছে। পাতাহারা শূন্য গাছগুলো বাতাসের ঝাপটায় যেন পাতার শোকেই গুঙিয়ে উঠছে বারবার, বিচিত্র শব্দে আর্তনাদ করছে।

বৃষ্টির দু'চারটা ঠাণ্ডা ফোঁটা এসে পড়ল মুসার কপালে। গায়ের কালো পারকাটার জিপার টেনে দিল সে। মাথায় তুলে দিল হুড।

টাকির সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার মোড়ে চলে এল তিন গোয়েন্দা। সশব্দে বড় রাস্তা ধরে চলে গেল একটা বাস। ভেতরে যাত্রী মাত্র দু'তিনজন।

বাসটা চলে গেলে নির্জন রাস্তা পেরোল ওরা। হাঁটতে থাকল।

কোথায় চলেছে জানে মুসা। আগেই ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছে টেরি। বলার সময় টেরির তিলে ভরা মুখটার উজ্জ্বলতা কল্পনা করে মনে মনে দমে গেল সে।

একটা পার্কিং লটের পেছনে পাতাবাহারের বেড়ার কাছে এসে থামল ওরা। ওপাশে অন্ধকার লম্বা একটা বিল্ডিং। সামনে কাঠের সাইনবোর্ডের ওপর জ্বলছে হলুদ স্পটলাইট। লেখাগুলো পড়া যায়: দা এন্ডলেস স্লীপ!

‘অনন্ত ঘুম!’ বাংলায় বিড়বিড় করল কিশোর।

ফিরে তাকাল রবিন। বুঝতে পারল, বোর্ডের লেখাগুলোর বাংলা অনুবাদ করেছে কিশোর। চুপ করে রইল।

ফিউনরল পারলারটার মালিক টেরির বাবা।

বাড়িটার দিকে তাকিয়ে গায়ে কাঁটা দিল মুসার। ভেতরে কি লাশ আছে এখন? মানুষের মৃতদেহ? নিশ্চয় আছে–নিজের প্রশ্নের জবাব নিজেই দিল মনকে মুসা। ফিউনরল পারলার মানেই তো লাশ রাখা, কবর দেয়ার আগে গোসল করানো, কাপড় পরানো, সুগন্ধি মাখিয়ে কফিনে ভরার জন্যে তৈরি করার জায়গা।

পারকার পকেটে যতটা যায়, হাত দুটো ঠেলে ঢোকাল সে। পাশে দাঁড়ানো কিশোরের দিকেও তাকাতে ইচ্ছে করছে না। টেরিকে এতখানি আগে বাড়তে দেয়ার জন্যে সে-ই দায়ী। কি দরকার ছিল এ সব বাজি

ধরাধরির!

'অ্যাই যে, এসে গেছে আমাদের সুপারহিরো!' কানের কাছে কথা বলে উঠল কডি, চাপড়ে দিল মুসার পিঠ।

এত চমকে গেল মুসা, মনে হলো দশ হাত শূন্যে লাফিয়ে উঠেছে।

ছায়া থেকে বেরিয়ে এল নিটু আর হ্যারল্ড। কডির পাশে দাঁড়াল।

'টেরি কোথায়?' জানতে চাইল কিশোর।

এক ঝলক ঝোড়ো বাতাস কাঁপুনি তুলল পাতাবাহারের বেড়ায়। আধো অন্ধকারে বেড়ার ওপরের অংশের কাঁপুনি দেখে মনে হলো এঁকেবেঁকে চলে গেল একটা বিরাট সাপ। বাতাসের ঝাপটায় মাথার হুড পেছনে খসে পড়ল মুসার। সঙ্গে সঙ্গে কপালে লাগল বৃষ্টির ফোঁটা।

'টেরিকে আটকে ফেলেছে,' জবাব দিল টাকি।

'আটকে ফেলেছে?' মুসা অবাক। 'কই, আগে তো বলনি?'

মাথা ঝাঁকাল টাকি, 'হ্যাঁ, আটকে ফেলেছেন, ওর বাবা। চুপি চুপি বেরোতে যাচ্ছিল টেরি, ধরা পড়ে গেছে।'

'মজাটা আর উপভোগ করতে পারল না আজকে,' হেসে বলল কডি।

মজা না ছাই! তেতো হয়ে গেছে মুসার মন।

'চিন্তা কোরো না, মুসা,' কডি বলল। 'ত্রাহি চিৎকার করে কিভাবে ছুটে পালিয়েছ তুমি, মুখে বলেই সেটার ছবি দেখিয়ে দেব আমরা ওকে।'

'ত্রাহি চিৎকার মুসা নয়, তোমরা করবে,' গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। 'সেই সঙ্গে মাতম। চাপড়ে চাপড়ে রক্তাক্ত করে ফেলবে কপাল, এতগুলো টাকা পকেট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার শোকে।'

ফিউনরল পারলারের দিকে তাকাল আবার মুসা। সাধারণ দেখতে, অনেক লম্বা, একতলা একটা বাড়ি। অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু মুসার কাছে ভয়ানক অস্বাভাবিক লাগল। কালো, অশুভ, ভুতুড়ে একটা বাড়ি–হরর সিনেমার বাড়িগুলোর মত।

ভেতরে সারি দিয়ে রাখা কফিনগুলো কল্পনা করল সে। ধাতব টেবিলে চিত করে ফেলে রাখা অসংখ্য লাশ।...কফিনের ডালা একের পর এক উঠে যেতে শুরু করল...দেখা দিল পচে বিকৃত হয়ে যাওয়া লাশের মাথা... সবুজ হয়ে যাওয়া লাশগুলো বেরিয়ে আসতে লাগল...টলছে, গোঙাচ্ছে। এগিয়ে আসতে লাগল মাংস খসে পড়া ফোলা ফোলা হাত বাড়িয়ে দিয়ে। বড় বড় ময়লা নখওয়ালা আঙুলগুলো বাঁকা করে রেখেছে তাকে খামচে ধরার জন্যে। বসে যাওয়া কোটরে নিষ্প্রাণ চোখগুলোর দিকে তাকানো যায় না...

থামো! আর এগিয়ো না! নিজেকে ধমকে উঠল মুসা। মনে মনে। বেপরোয়া কল্পনার রাশ টেনে থামানোর চেষ্টা করল।

ঢোক গিলল একবার। মাথা ঝাড়া দিল। হাত দিয়ে মুছল বৃষ্টি ভেজা কপাল। টাকির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি করতে হবে আমাকে, বলো!'

দশ

মুসার প্রশ্ন হাঁ করিয়ে দিল টাকি আর তার তিন দোস্তকে।
সবার আগে সামলে নিল কডি। নিষ্ঠুর, শীতল হাসি হাসল। তাতে যোগ দিল নিটু আর হ্যারল্ড।
টাকি হাসল না। গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমি তোমাকে এখনও কাজটা না করতে অনুরোধ করব, মুসা।'
'কেন, তোমার হঠাৎ এত মুসার জন্যে দরদ উথলে উঠল কেন?' কিশোর বলল। 'ওর নাটকে কান দিয়ো না, মুসা। কথা বলে ভয় দেখিয়েই ও তোমাকে কাবু করে ফেলার চেষ্টা করছে।... শোনো টাকি, আমি বলি কি, অকারণে সময় নষ্ট না করে টাকাগুলো দিয়ে বিদেয় হও। টেরিকে গিয়ে বোলো, বাজিফাজি খতম। কত আর বলব, মুসা কোন কিছুকে ভয় করে না।'
'না দেখে কিছু বিশ্বাস করব না।' হাত তুলে বাড়িটা দেখাল টাকি। 'মুসা, পেছনের ওই জানালাটা দেখতে পাচ্ছ?'
পাতাবাহারের ওপর দিয়ে গলা লম্বা করে তাকাল মুসা। সবগুলো জানালাই অন্ধকার। কোনটাতে আলো নেই। সমস্ত বাড়িটায় আলো বলতে শুধু ওই একটাই, বোর্ডের ওপরের স্পটলাইট। এ পরিবেশে হলুদ আলোটাকেও কেমন ভুতুড়ে লাগছে।
'দেখছ না জানালাটা?' জিজ্ঞেস করল টাকি।
মাথা ঝাঁকাল মুসা।
'ওটা দিয়ে ঢুকতে হবে তোমাকে।'
'ঢুকতে হবে!'
'কেন, ঘাবড়ে গেলে?'
হেসে উঠল টাকি বাদে টেরির বাকি তিন সহচর।
'আমি বলতে চাইছি, কাজটা বেআইনি হবে না?' কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল মুসা। 'টেরির বাবা কি জানেন?'
'আরে নাহ্! পাগল নাকি!' টাকি বলল।
কডি বলল, 'টেরির বাবা জানলে আমাদের সবাইকে ধরে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবেন।'
যেন মস্ত এক রসিকতা করে ফেলেছে কডি। হো হো করে হেসে উঠল নিটু আর হ্যারল্ড। পিঠে চাপড় মারতে শুরু করল পরস্পরের।
'আস্তে!' সাবধান করল টাকি। 'অত জোরে হেসো না। কেউ শুনে ফেলবে।'
'ধূর, এ সব বাচালের দলের সঙ্গে কে গেম খেলতে যায়!' রেগে উঠল কিশোর। 'এই টাকি, আমাদের টাকা দিয়ে দাও, আমরা চলে যাই। বসে বসে এখানে যত খুশি প্যাঁচাল পাড়োগে তোমরা। আমি সারারাত ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না।'
'কাজটা সহজ,' মুসার কাঁধে হাত রেখে আন্তরিক স্বরে বলল টাকি।

বাড়ির পেছনের জানালাটার দিকে ইঙ্গিত করল আবার। 'জানালাটা খুলবে। চৌকাঠে উঠে বসবে। লাফ দিয়ে নামবে নিচে। সামনে প্রথম যে কফিনটা পড়বে সেটার মধ্যে ঢুকে শুয়ে পড়বে।'

'কিন্তু...কিন্তু...' বলতে গেল মুসা। কিশোরের জন্যে পারল না।

কিশোর বলল টাকিকে, 'ব্যাস, এই? শুধু এটুকুর জন্যে এত ভণিতা? এ কোন কাজ হলো! নাহ্, টাকার কোন মায়াদয়া নেই তোমাদের।'

'কিশোর, শোনো...' আবার বলতে গেল মুসা, কফিনে ঢোকার কথা শুনেই ঘাবড়ে গেছে। 'ক-ক...'

শুনল না কিশোর। টাকিকে বলল, 'ভয় দেখানোর মত আর কিছুই কি মাথায় আসে না তোমাদের? না এলে হাতজোড় করে সাহায্য চাও, আমিই নাহয় বলে দেব একটা কিছু।'

কিশোরের কথাবার্তায় অবাক হচ্ছে রবিন। টেরির দলকে উস্কে দিয়ে মুসাকে বার বার এ ভাবে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে কেন কিশোর? কারণটা কি?

কিশোর বলল, 'মুসা, যাও না, চট করে সেরে চলে এসো কাজটা। আজ আর টাকা না নিয়ে ছাড়ছি না ওদের কাছ থেকে। দুই-দুইবার মাপ করলাম, আর কত। যাও, যাও।'

টাকিকে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'আমি ঢুকলাম কিনা, কি করে জানছ তোমরা?'

'আমরা চেয়ে থাকব,' জবাব দিল টাকি। 'পেছনের জানালায় দাঁড়িয়ে সবাই দেখব আমরা।'

'টেরির বাবার লোক যদি আমাদের ধরে ফেলে?'

'ধরবে না। আর কোন মানুষই থাকে না এখানে, লাশগুলো বাদে।'

'লাশকে নিশ্চয় ভয় পাও না তুমি?' ফ্যাকফ্যাক করে হাসল কড়ি।

হ্যাঁ, পাই!—মুসা বলল। তবে শুনিয়ে নয়, মনে মনে। লাশকে ভয় পায় না কে!

তার কথার সমর্থনেই যেন আরেক ঝলক বাতাস কাঁপিয়ে দিয়ে গেল পাতাবাহারের বেড়াকে। বাতাসের শব্দকে লাগল প্রেতাত্মার দীর্ঘশ্বাসের মত। কেঁপে উঠল মুসা। কপালে আঘাত হানছে বৃষ্টির ফোঁটা। বৃষ্টি বেড়েছে। হুডটা আবার তুলে দিল সে।

'যাও, মুসা,' তাগাদা দিল কিশোর, 'কাজটা যত তাড়াতাড়ি পারো শেষ করে চলে এসো। বাড়ি যাই। এই ছাগলগুলোর চেহারা দেখতেও বিরক্ত লাগছে আমার।'

'দেখো, মুখ সামলে কথা বলো!' রেগে গেল কড়ি।

'কেন, মারবে নাকি? মরফির কি অবস্থা করে ছেড়েছে মুসা, বলে বলে কল্পনায় ছবি দেখায়নি তোমাদের দোস্ত টাকি?' খোঁচাটা ঠিকই দিয়ে দিল কিশোর। 'তোমার ওস্তাদ টেরিই তো ঘুস দিয়ে পাঠিয়েছিল ওকে, নাকি?...এসো হয়ে যাক তাহলে আরেকটা বাজি, মারামারির...'

'কিশোর, প্লীজ!' নতুন আর কোন চ্যালেঞ্জে যেতে চায় না মুসা।

থেমে গেল কিশোর।

বাড়িটার দিকে তাকাল মুসা। পারবে কি? লাশ ভর্তি ঘরে ঢুকে

কফিনের মধ্যে শু'তে পারবে?

বেড়ার কাছ থেকে বাড়িটা মাইলখানেক দূরে মনে হলো তার। যে হারে পা কাঁপছে হেঁটে জানালা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে কিনা সন্দেহ হলো।

সত্যি কথাটা বলে ফেল, মুসা!–ভাবল সে। জানিয়ে দাও ওদের, এ কাজ তুমি পারবে না। বলে দাও, এত সাহস তোমার নেই। ল্যাঠা চুকে যাক। কিন্তু এর পরে যে কি হবে ভাবতেই দমে গেল সে। এতগুলো টাকা গচ্চা যাবে। তার ওপর রয়েছে 'তোতলা মুসা' খেতাব নিয়ে টিকে থাকা।

না, মুসা, কোন উপায় নেই আর তোমার। ভাল ফাঁদে জড়িয়েছ তুমি। সব রাগ গিয়ে পড়ল কিশোরের ওপর। কিশোরই তাকে এ রকম করে ফাঁসিয়েছে! টেরির দলের সঙ্গে অতটা বাড়াবাড়ির কি কোন প্রয়োজন ছিল?

'আমি যাচ্ছি,' বলল সে। কপালের ওপর থেকে হুডটা সরিয়ে দিল। বাতাসের অনুকূলে মাথা নিচু করে রেখে, গাছের বেড়া ফাঁক করে ঠেলে বেরিয়ে এল অন্যপাশে। পার্কিং লটে ঢুকল।

আধাআধি গিয়েছে, এই সময় হঠাৎ জ্বলে উঠল উজ্জ্বল আলো। সরাসরি তার গায়ে এসে পড়ল।

এগারো

বরফের মত জমে গেল মুসা।

দুই হাত চোখের ওপর এনে রাস্তার দিকে তাকাল। ড্রাইভওয়ে দিয়ে একটা ভ্যান ঢুকছে। ওটার হেডলাইটের আলো।

বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে মুসার। চকিতে পিছিয়ে গেল। তারপর ঘুরে দিল দৌড়। প্রায় ডাইভ দিয়ে এসে পড়ল পাতাবাহারের বেড়ার ওপর।

'কে ও?' জিজ্ঞেস করল টাকি।

'আমি কি করে জানব?' হাঁপাতে হাঁপাতে জবাব দিল মুসা।

বাতাসে কম্পমান বেড়ার আড়ালে লুকিয়ে রইল সবাই। ভ্যান থেকে নামতে দেখল দুজন লোককে। কপালের ওপর টেনে দিয়েছে হ্যাট। চেহারা বোঝা যাচ্ছে না।

পেছনের দরজা খুলল একজন। লম্বা কালো একটা প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ টেনে নামাল।

লাশের ব্যাগ।

নীরবে তাকিয়ে রইল ছেলেরা। ভারী ব্যাগটা ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে গেল লোক দুজনে।

'একটু আগে মারা গেছে নিশ্চয়,' বিড়বিড় করল টাকি। 'রাতেও আসা বন্ধ নেই।' কেঁপে উঠল সে।

'তুমি না বললে কেউ আসবে না?' ফিসফিস করে বলল মুসা।

'আসার তো কথা ছিল না। তবে ওরা বাইরের লোক। তুমি ভেতরে থাকতে থাকতে আবার যদি কেউ আসে, লুকিয়ে পোড়ো। লুকানোর জন্যে অনেক কফিন আছে।' নিচু স্বরে হাসল সে। 'তোমার তো বেজায় সাহস। পারবে না?'

নিটু আর হ্যারল্ড নীরবে হাসল।

দম আটকে রাখতে রাখতে ফুসফুস ব্যথা শুরু হয়ে গেল মুসার। মনে হলো ফেটে যাবে। ফোঁস করে ছেড়ে দিল বাতাস।

'ধরা পড়ার বেশি ভয় যদি করো,' কডি বলল, 'এখনও সময় আছে, হার স্বীকার করে নাও। কষ্ট করার আর দরকারই নেই তোমার। কি বলো?'

'হার স্বীকারের কথা আসছে কেন?' এতক্ষণে কথা বলল কিশোর। 'লোকগুলো গেলেই গিয়ে ঢুকবে ও। ঢুকতেই তো যাচ্ছিল।'

পারকার পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে দিল মুসা। হুডের নিচে মুখ লুকানোর চেষ্টা করল। আতঙ্কিত চেহারাটা কাউকে দেখাতে চায় না।

ফিউনরল পারলারের পাশের একটা জানালায় আলো জ্বলল। সবুজ পর্দা টানা জানালায় ভুতুড়ে লাগল আলোটা।

মিনিট দুয়েক পর আবার নিভে গেল। বেরিয়ে এল লোকগুলো। ভ্যানের কাছে এসে পেছনের দরজাটা লাগাল দড়াম করে। সামনে গিয়ে উঠে বসল।

চলে গেল গাড়িটা।

ফিরে তাকাল মুসা। সবগুলো চোখের দৃষ্টি তার দিকে।

'আমি যাচ্ছি,' নিচু স্বরে বলল সে।

দ্বিতীয়বার বেড়া ফাঁক করে ঠেলে বেরোল পার্কিং লটে। এগিয়ে চলল বাড়িটার দিকে।

পেছন পেছন চলল বাকি সবাই। ভেজা, পাকা চত্বরে ওদের জুতোর শব্দ হতে লাগল।

বাড়িটার পেছনে পাতাশূন্য গাছগুলো বাতাসে দুলে দুলে যেন হাত নেড়ে তাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল ওদের।

বাড়ির পেছনে এক চিলতে ঘাসে ঢাকা জমি আছে। পাকা চত্বর থেকে সরে ওখানে পা দিতেই ফচ্ করে ভেজা মাটিতে ডেবে গেল মুসার জুতো। তারপর যতবার পা ফেলল ফচ্ ফচ্ করতেই থাকল।

পেছনের জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। দপদপ করে লাফাচ্ছে কপালের কাছে শিরাটা। কাঁচের গায়ে নাক ঠেকিয়ে উঁকি মেরে ভেতরে দেখার চেষ্টা করল। কিছুই দেখতে পেল না। ভেতরে অতিরিক্ত অন্ধকার। কোন রকম আলো নেই। থাকলেও পর্দার জন্যে ভেতরের জিনিস দেখা যেত না।

'দাঁড়িয়ে আছো কেন? জানালা খোলো,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল টাকি। কণ্ঠস্বরে মনে হলো ভয় পাচ্ছে।

কাঁচের গায়ে পুটুর পুটুর আওয়াজ তুলছে বৃষ্টির ফোঁটা। দুই হাত বাড়িয়ে কাঠের ফ্রেম চেপে ধরে ঠেলা দিল মুসা। সহজেই ওপর দিকে উঠে গেল পাল্লাটা। দমকা বাতাসে দুলে উঠল জানালার দুদিকের পর্দা। জীবন্ত মনে হচ্ছে ও দুটোকে।

জানালার চৌকাঠের ওপর দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল মুসা। এইমাত্র যে লাশটা আনা হলো, কোথায় রেখে গেল ওটা? কিছুই চোখে পড়ছে না।

তীব্র একটা দুর্গন্ধ এসে ধাক্কা মারল নাকে।

'উঁহ্, কি গন্ধ!' নাক কুঁচকে ফেলল মুসা।

'লাশের গন্ধ,' একপাশ থেকে বলল কডি। 'পচা, ফুলে ওঠা লাশ।'

'ওর কথায় কান দিয়ো না,' কিশোর বলল, 'ওটা ফরমালডিহাইডের গন্ধ। লাশের গায়ে মাখানো হয়।'

পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল মুসার। গন্ধটা সহ্য করতে পারছে না।

'হার স্বীকার করবে?' মুসার কাঁধে আবার আন্তরিক ভঙ্গিতে হাত রাখল টাকি। 'দেখো, টাকা-পয়সা হাতের ময়লা। প্রাণই যদি না বাঁচল টাকা দিয়ে কি করবে? বলো, ভয় পেয়েছ। "পেয়েছি" শুধু একটা শব্দ উচ্চারণ করলেই ছেড়ে দেব।'

'না!' তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'মুসা আমান ভয় পায় না! ভয় শব্দটা ওর অভিধানেই নেই। বিশ্বাস না হয় রবিনকে জিজ্ঞেস করে দেখো। কি বলো, রবিন?'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল রবিন।

'মুসা, উঠতে পারবে? ঠেলা দেব?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না, লাগবে না,' দুই হাতে চৌকাঠ চেপে ধরল মুসা। দেয়ালে পা বাধিয়ে বেয়ে উঠে গেল ওপরে। অন্যপাশে পা ঝুলিয়ে দিয়ে চৌকাঠে বসল।

বারো

পর্দার কোনাগুলো বাতাসে উড়ে এসে পেঁচিয়ে ধরতে গেল যেন মুসার গলা।

'প্রথম কফিনটা,' মনে করিয়ে দিল টাকি, 'অন্য কোন কফিনে ঢুকলে কিন্তু হবে না। যাও, নামো। ডালা খুলে ঢুকে পড়ো।'

'আমরা কিন্তু তাকিয়ে রইলাম,' কড়ি বলল।

'ইস্, আমার ক্যামেরাটা কেন যে আনলাম না,' আফসোস করতে লাগল হ্যারল্ড। 'আতঙ্কে পাগলের মত চিৎকার করতে করতে ছুটে পালাচ্ছে মুসা আমান–এমন একটা দৃশ্যের ছবি তোলার সুযোগ আর জীবনে পাব না।'

'থামো!' কঠিন স্বরে ধমকে উঠল কিশোর। 'একদম চুপ! ফাজলেমি মার্কা আর একটা কথা বললে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি!'

ওদেরকে ঝগড়ার সুযোগ দিল না মুসা। লাফিয়ে নামল ভেতরে। ধীরে ধীরে সোজা করল শরীরটা।

বাতাসে পর্দা দোলাচ্ছে। একটা পর্দার নিচের অংশ আলতো বাড়ি মারছে তার পিঠে। আরেকটা পর্দার কোনা এসে আবার পেঁচিয়ে ধরতে গেল গলা।

টান দিয়ে গলা থেকে পর্দাটা সরিয়ে সামনে তাকাল সে। অন্ধকারে দেখার চেষ্টা করল।

কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আলো জ্বালব? কিছু তো দেখছি না।'

'না, আলো জ্বালানো চলবে না,' টাকি বলল। 'ঠিক আছে, কফিনটা কোনখানে দেখানোর ব্যবস্থা করছি।' একটা টর্চ বের করে জানালার ফ্রেমের ওপর হাত বাড়িয়ে দিয়ে জ্বালল সে। ম্লান একটা গোল আলো গিয়ে পড়ল মেঝেতে।

কয়েক পা এগিয়ে গেল মুসা। আলোটা স্থির হয়ে আছে এক জায়গায়।

পেছনে আরেকটা টর্চ জ্বলে উঠল। কডি জ্বেলেছে। আলো দুটো খুদে স্পটলাইটের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল মেঝেতে।

সেই আলোর আভায় যতটা সম্ভব ঘরটা দেখে নিতে লাগল মুসা। ছাত একেবারেই নিচুতে। ওর মাথার ফুট দুই ওপরে। পাশাপাশি রাখা দুটো ধাতব টেবিল দেখতে পেল। একটা খালি। আরেকটার ওপর লম্বা কোন জিনিস প্ল্যাস্টিকের চাদর দিয়ে ঢাকা। তলায় কি আছে বুঝতে অসুবিধে হলো না ওর।

একদিকে একটা ডেস্কের ওপর রাখা কাগজ ফড়ফড় করছে বাতাসে। দেয়াল ঘেঁষে রাখা একসারি ফাইলিং কেবিনেট। নানা রকম কয়েল আর টিউব। হাসপাতালের ঘরের মত। ওগুলোর পাশে নিচু টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখা কালো রং করা কফিনের সারি। টর্চের আলোর আভায় চকচক করছে।

'খাইছে!' ঝুলে পড়ল মুসার নিচের চোয়াল।

'ভয় পাচ্ছো, কালটু মিয়া?' কডি জিজ্ঞেস করল। হাতের আলোটা ঝটকা দিয়ে উঠে এল মুসার মুখের ওপর।

'আলো নামাও, গাধা কোথাকার! দেখব কি করে?' ধমকে উঠল মুসা।

'কফিনগুলো তো দেখলে,' টাকি বলল। 'ওই যে, প্রথম কফিনটা। যাও।' টর্চের আলো ফেলে কোন্ কফিনটাতে ঢুকতে হবে দেখিয়ে দিল সে।

'ভয় পাচ্ছে!' নিটু বলল। 'এই, জানালার কাছ থেকে সরে যাও তোমরা। মু-মুসাকে পালানোর পথ করে দাও।'

'ও পালাবে না, পালাবে না, পালাবে না!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'কতবার বলব? তোমাদের মত মুরগীর কলজে নাকি ওর?...যাও, মুসা, এগোও। শুয়ে পড়োগে কফিনটার মধ্যে। টাকা আয়ের খুব সহজ রাস্তা।'

সহজ, তবে তোমার জন্যে—মনে মনে বলল মুসা। ঈশপের গল্পের একটা উপমা মনে পড়ল: তোমাদের জন্যে খেলা বটে, আমার জন্যে মরণ! কফিনগুলোর ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে ভাবল, সত্যি কি পারবে ঢুকতে? কেমন লাগবে? ভেতরের গন্ধটা কেমন?'

বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটাচ্ছে। জানালার দিকে ফিরল সে। জিজ্ঞেস করল, 'কফিনে শুয়ে কি ডালা নামিয়ে দিতে হবে?'

'ঢোকো,' অধৈর্য কণ্ঠে টাকি বলল, 'শুধু ঢুকলেই হবে। আর কিছু করতে হবে না তোমাকে, মু-মুসা! বাকিটা যার করার সে-ই করবে,' রহস্যময় শোনাল তার কথা। 'জলদি করো। বাইরে যা ঠাণ্ডা।...পারবে? না পারলে চলে এসো।'

'পারবে না মানে?' জোরগলায় বলল কিশোর। 'অবশ্যই পারবে। এ কোন ব্যাপার হলো!'

ধীর পায়ে কফিনগুলোর দিকে এগিয়ে চলল মুসা। টর্চের আলো দুটো স্থির হয়ে আছে পেছনের সবুজ দেয়ালে। কফিনের ডালা নামানো।

'যাও, মুসা, যাও! ঢুকে পড়ো! ও কোন ব্যাপারই না তোমার জন্যে!' জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে মুসাকে অভয় দিল কিশোর। তাতে আরও পিত্তি জ্বলে গেল মুসার। অন্যকে পরামর্শ দেয়া সোজা!

'ও এত দেরি করছে কেন?' অস্থির হয়ে উঠেছে কডি। মুসার দুর্গতি দেখার জন্যে তর সইছে না যেন আর।

কফিনের ডালার ওপর হাত নামাল মুসা। কাঠের অনুভূতিটা মসৃণ, শীতল। এত জোরে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

ডালা তোলো, মুসা–নিজেকে বোঝাল সে। তারপর ঢুকে পড়ো ভেতরে। কি আর হবে? খাট আর চৌকির মত কফিনও কাঠেরই তৈরি। সাধারণ বাক্সের মত। নিচে গদি আছে। বাক্সের ভেতরে শু'লে বিছানার মতই লাগবে।

সবুজ দেয়ালে নড়ে উঠল দুটো আলোর একটা। আবার স্থির হলো।

ডালার কিনার চেপে ধরে ভারী দম নিল মুসা। টেনে উঁচু করে ঠেলে দিল ওপর দিকে। পুরোটা খুলে ফেলল। তারপর তাকাল ভেতরে।

তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে আসতে শুরু করল গলার গভীর থেকে।

তেরো

কাঁচের চোখের মত নিষ্প্রাণ দুটো চোখ। কালচে ঠোঁটে স্থির হয়ে আছে রক্ত পানি করা অস্বাভাবিক হাসি। নিচের ঠোঁটের ওপর নেমে এসেছে ওপরের পাটির একটা মাত্র দাঁত। ওই একটাই। মুখে আর কোন দাঁতই নেই। কপালে আর গালে গভীর কাটা দাগ। হাত দুটো বুকের ওপর আড়াআড়ি রাখা।

চিত হয়ে আছে লাশটা। স্তব্ধ। নিথর।

চিৎকারটা বেরোয়নি মুসার মুখ থেকে। নিজে নিজেই বন্ধ করেছে না অতিরিক্ত ভয়ে আটকে গেছে, বলতে পারবে না।

জানালার কাছ থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'মুসা, কি হয়েছে?'

'এ-একটা···লা-লা-লাশ,' কাঁপা কণ্ঠে জবাব দিল মুসা। কফিনের দিকে আঙুল তুলল।

'বললাম না ও ভয় পাবে,' হ্যারল্ডের কণ্ঠ কানে এল তার। 'চেঁচিয়ে গলা ফাটাবে।'

তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বিকৃত হাসি হাসতে লাগল তার বন্ধুরা।

কডি বলল, 'আমি শিওর, এইমাত্র যে লাশটা আনল, ওটাই রেখে গেছে ওই কফিনে।'

আবার হেসে উঠল ওরা।

'অত হাসির কি হলো?' ধমকে উঠল মুসা। 'এখানে একটা মানুষের লাশ রয়েছে। মৃতদেহ। এতে হাসির কি দেখলে? দেখি আলোটা নামাও নিচের দিকে।'

পেটের মধ্যে মোচড় দিচ্ছে তার। গলাটা এমন শক্ত হয়ে গেছে, নিঃশ্বাস ফেলার সময় চাপা শিসের মত শব্দ বেরোচ্ছে।

টর্চের আলো নিচে নামল। কিন্তু কফিনের গায়ে পড়ছে আলো, ভেতরে ঢুকতে পারছে না। কোনমতেই চেহারাটা স্পষ্ট হচ্ছে না।

'ভয় পাচ্ছ নাকি?' জিজ্ঞেস করল টাকি।
'ও পারবে না,' ঘোষণা করে দিল হ্যারল্ড।
'তারমানে আমরা জিতে গেলাম,' বলল কডি। 'দুশো ডলার!'
'গায়ের জোরের জেতা নাকি? কাজই শেষ হলো না এখনও,' কর্কশ শোনাল কিশোরের কণ্ঠ। মাথাটা ঠেলে দিল জানালার ভেতরে। 'মুসা, ঢুকে পড়ো। শুয়ে পড়ো লাশটার ওপর। ও কিছু না। পারবে তুমি।...ও, দেখতে পাচ্ছো না?...এই, আলোগুলো ঠিকমত ফেলো তোমরা। না দেখলে কোথায় ঢুকবে?'
'লাশের ওপর শোবো?'
'কি হবে? এক বিছানায় শোয় না দুজন মানুষ? তফাৎ শুধু বিছানার জায়গায় বাক্স, আর গরমের জায়গায় ঠাণ্ডা লাগবে স্পর্শটা। তোমার যে একবিন্দু ভয় লাগছে না, বুঝতে পারছি আমি।'
ভয় না—মনে মনে বলল মুসা, লাগছে আতঙ্ক!
'যাও, ওঠো!' কিশোর বলল।
কফিনটার দিকে ঘুরল মুসা। জানালার বাইরে চুপ হয়ে গেল সবাই। অস্পষ্ট আলোতে আরেকবার লাশটার দিকে তাকাল সে। তারপর যা থাকে কপালে ভেবে চেপে ধরল কফিনের কিনার।
ফরমালডিহাইডের তীব্র গন্ধ যেন পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে চারপাশে। অসুস্থ বোধ করছে মুসা। বমি ঠেলে আসতে লাগল।
কফিনের ওপর ঝুঁকল সে। পারবে তো?
নাহ্, পারবে না!
কফিনের কিনার ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে আসতে গেল।
কানে এল গোঙানির শব্দ।
ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে গেল তার।
অস্পষ্ট আলোতে একটা নড়াচড়া লক্ষ করল।
পরক্ষণে ঝটকা দিয়ে উঠে এল হাতটা। লাশের হাত। খামচে ধরল তার পারকা।
চিৎকার করার জন্যে আবার মুখ খুলল সে। এবারেও কোন শব্দ বেরোল না।
হাতের মুঠিটা শক্ত হলো।
থাবা মারল অন্য হাতটা।
হ্যাঁচকা টানে মুসাকে কফিনের মধ্যে উপুড় করে ফেলল।
'না!' বলে চিৎকার দিয়ে টানাটানি করে সরে আসতে চাইল মুসা।
উঠে বসল লাশটা। পারকা ছাড়ল না। টানছে, টেনে নিয়ে যাচ্ছে কাছে।
কাঁচের মত চোখজোড়া তাকিয়ে আছে নিষ্পলক।
গাল আর কপালের কাটা দাগটা অনেক গভীর আর স্পষ্ট লাগছে এখন।
'ছাড়ো, ছাড়ো!' বলে লাশের কব্জি চেপে ধরল মুসা। ঠেলে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল।
ঝাড়া দিয়ে একটা হাত ছাড়িয়ে নিল লাশটা। গলা পেঁচিয়ে ধরল মুসার। কায়দা মত ধরতে পেরেছে এবার। টেনে নিয়ে যেতে শুরু করল কফিনের মধ্যে।

মুখটা লাশের বুকে চেপে বসতে দেরি নেই। গায়ের জোরে এক ঝাড়া মারল মুসা। একই সঙ্গে মুক্ত হাতটা দিয়ে প্রচণ্ড ধাক্কা মারল বুকে।

ছুটে গেল লাশের হাত। হঠাৎ ছুটে যাওয়ায় তাল সামলাতে না পেরে মেঝের ওপর পড়ে গেল মুসা।

ভারী একটা দেহ লাফ দিয়ে এসে পড়ল তার গায়ের ওপর। 'হুঁক' করে বাতাস বেরিয়ে গেল ফুসফুস থেকে। আপনা-আপনি মুখ থেকে বেরিয়ে এল শব্দটা, 'খাইছে!' পরক্ষণে চিৎকার করে উঠল, 'সরো, সরো ওপর থেকে, শয়তান কোথাকার!'

কিন্তু সরল না জ্যান্ত হয়ে ওঠা লাশ। ওটার সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করল মুসা। গড়িয়ে সরে আসতে চাইল নিচ থেকে। দুই হাত বুকে ঠেকিয়ে ধাক্কা মারতে লাগল।

কিন্তু লাশের গায়ে শক্তি কম না। দুই হাতে মুসার বাহু খামচে ধরে পেটের ওপর বসে রইল ওটা।

চলল ধস্তাধস্তি। টানাটানি। গোঙানো। বুকের পাঁজর ব্যথা করছে মুসার। মাথা ঘুরছে। ভূতের সঙ্গে লড়াই করে আর কতক্ষণ টিকবে, বুঝতে পারছে না।

আচমকা ঝটকা দিয়ে উঠে গেল তার ডান হাতটা। দুর্বল জায়গা মনে করে লাশের চুল চেপে ধরে মারল হ্যাঁচকা টান।

একটানে খুলে নিয়ে এল মাথাটা!

চোদ্দ

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত বোকা হয়ে ওটার দিকে তাকিয়ে রইল মুসা। ওটা যে মাথা নয় বুঝতে সময় লাগল। কাটা দাগগুলো কুঁচকে গেছে। বেরিয়ে থাকা একমাত্র দাঁতটা সহ ধসে পড়েছে ঠোঁট দুটো।

একটা মুখোশ। রবারের মুখোশ।

বড় করে ঢোক গিলে লাশের মুখের দিকে তাকাল সে। শুঁটকি টেরি!

টেরি? কফিনের মধ্যে ঢুকে শুয়েছিল? আগেই সন্দেহ করা উচিত ছিল তার। যখন দেখেছে, দলের সঙ্গে টেরি নেই। তারপর ও ঢোকার জন্যে এগিয়ে যেতেই ভেতরে ঢুকল ভ্যানটা, যেন আর সময় পেল না। ভ্যানের লোকগুলোকে ঠিক করে রেখেছিল টেরি, সময় মত লাশ ভরার ব্যাগে করে টেরিকে এনে কফিনে রেখে গেছে ওরা। সে-জন্যেই বার বার বলে দিয়েছিল টাকি, সামনে যে প্রথম কফিনটা পড়বে, সেটাতে ঢুকতে। তারপরেও আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্যে টর্চের আলো ফেলে দেখিয়ে দিয়েছে।

ইস্, আমি একটা গাধা! মনে মনে নিজেকে গাল দিল মুসা। মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে ইচ্ছে করল। কিন্তু ওর চুল এতই ছোট করে ছাঁটা, কোঁকড়া হয়ে তারের জালের মত বসে আছে, ধরাই যায় না। তাই আপাতত ছেঁড়ার হাত থেকে বেঁচে গেল চুলগুলো। ছুঁড়ে ফেলল হাতের মুখোশটা।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে দুজনে। মুখ ফাঁক। দুজনেই হাঁপাচ্ছে।

দম নিতে ব্যস্ত।

মুসা ভাবছে, এখুনি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াবে টেরি। হাসতে হাসতে নিজের বিজয় ঘোষণা করবে। কারণ, মুসা ভয় পেয়ে চিৎকার করেছে। সবাই শুনেছে সেটা।

কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে বিমূঢ়ের মত মাথা নাড়তে লাগল টেরি। 'কি করে বুঝলে তুমি, ওর মধ্যে আমি আছি?'

জ্বলে উঠল ছাতে লাগানো আলো। উজ্জ্বল আলোয় চোখ মিটমিট করতে করতে ফিরে তাকাল মুসা। দেখল, জানালা গলে ঘরে ঢুকেছে টাকি। বাকি সবাইও ঢুকছে।

এগিয়ে এসে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলা মুখোশটা তুলে নিল টাকি। হাতে পেঁচাতে শুরু করল নরম রবারে তৈরি জিনিসটা।

রবিন আর কিশোর এসে দুদিক থেকে ধরে মুসাকে টেনে দাঁড় করাল।

বিমূঢ়তা কাটেনি টেরির। মুসার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বিড়বিড় করল, 'আমি, সেটা কি করে জানলে?'

জবাব দিল না মুসা। সে নিজেও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। টেরি রয়েছে, কল্পনাই করেনি। সত্যিকারের লাশ ভেবেছে।

ঘটনাটা যে কাকতালীয়ভাবে মুসার পক্ষে চলে এসেছে, কিশোরও অনুমান করে নিয়েছে সেটা। মুসা সত্যি কথাটা ফাঁস করে দেয়ার আগেই সুযোগটা কাজে লাগাল, 'মুসাকে বোকা বানানো তোমার কর্ম নয়, টেরি, সে তো আগেই বলেছি। নইলে কি আর এত টাকা বাজি ধরতাম।'

'আমার মাথায়ই ঢুকছে না,' মেঝেতে পা ছড়িয়ে দিয়ে, দুই হাত পেছনে নিয়ে গিয়ে তাতে ভর দিয়ে শরীরটা উঁচু করে রেখেছে টেরি। 'আমি ভেবেছি, দেখামাত্র লেজ তুলে দৌড় দেবে তুমি। কিংবা বাবাগো-মাগো চিৎকার দিয়ে ভিরমি খেয়ে পড়বে।'

খলখল করে হেসে উঠল কিশোর। 'তাহলেই বোঝো, শুঁটকি, তোমার ক্ষমতা।' হাত বাড়াল, 'আজ আর মাপ করছি না। টাকাটা দিয়ে দাও। তোমরা হেরেছ।'

কিন্তু কথা যেন কানেই ঢুকছে না টেরির। শক্ পাওয়া মানুষের মত বিড়বিড় করেই চলল, 'তুমি টেনে আমার মুখোশ খুলে নিলে! জানো বলেই নিয়েছ। কি করে জানলে? কি করে?'

মুসার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল কিশোর। মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে বোঝাল–বোলো না, খবরদার!

চুপ করে রইল মুসা। সে যে ভয় পেয়েছে, আতঙ্কে আরেকটু হলে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল–জানতে পারলেই আবার পেয়ে বসবে টেরির দল।

'শুঁটকি না হলে এ রকম ছাগুলে বুদ্ধি কেউ করে?' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়ল কিশোর। 'ছ্যাহ্! মুখোশ পরে মরা লাশ সাজে। মুসা আমান তো বিরাট ব্যাপার, একটা দুধের বাচ্চাও ধরে ফেলতে পারত এটা। আসল লাশকেই যে ভয় করে না, সে তোমাকে ভয় পাবে ভাবলে কি করে?'

এতক্ষণে যেন সংবিত ফিরল টেরির। উঠে দাঁড়াল। 'তাই নাকি?'

'লজ্জা থাকলে আবার তাই নাকি বলছ। তুমি তো জ্যান্ত মানুষ, সত্যিকারের মরা লাশ থাকলেও কফিনে ঢুকতে পারবে মুসা,' ঘোষণা করে

দিল কিশোর। 'সামান্যতম বুক কাঁপবে না ওর। একবার মর্গে ঢুকে আমি আর রবিন ভয়ে দিলাম দৌড়, হাসতে হাসতে গিয়ে লাশের গালে গাল ঘষতে লাগল সে।'

'কিশোর, দোহাই তোমার! চুপ করো!' আর থাকতে না পেরে চিৎকার করে উঠল মুসা। মুঠো শক্ত হয়ে গেছে তার। 'এই জঘন্য খেলা...'

'দেখলে, কি বিনয়? প্রশংসা পর্যন্ত সইতে পারছে না।'

চোখের পাতা সরু হয়ে এল টেরির। মুসার কাঁধ থেকে টোকা দিয়ে লাশ বাঁধা দড়ির একটা টুকরো ফেলল। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আসল লাশকেও তাহলে ভয় পাও না?'

'ইয়ে...' বলতে গেল মুসা।

'না, পায় না,' মুসাকে কথা বলতে দিল না কিশোর।

ওর দিকে ঘুরল টেরি। 'বেশ। একটা শেষ বাজি। মুসার সর্বশেষ পরীক্ষা...'

'তুমি ওর পরীক্ষা নেয়ার কে?' রেগে উঠল রবিন।

'বেশ, পরীক্ষা নয়,' হাসল টেরি, 'ফাইন্যাল চ্যালেঞ্জ।'

'চ্যালেঞ্জ,' শব্দটা এমন ভঙ্গিতে বলল টেরি, ভয় পেয়ে গেল মুসা।

'পাঁচশো ডলার বাজি,' কিশোরকে বলে মুসার দিকে তাকাল টেরি। 'সহসাই আবার দেখা হবে আমাদের, মু-মুসা। খুব শীঘ্রি। এখানে। এই ঘরে।'

হাত বাড়াল কিশোর, 'টাকাটা! মাপ চাইলে অবশ্য মাপ করে দিতে পারি।'

দ্বিধা করল টেরি। তারপর পকেটে হাত ঢোকাল। বের করে আনল শূন্য হাতটা। 'আনতে ভুলে গেছি। একবারেই নিও।'

পনেরো

পারের রাতে অস্থির হয়ে পায়চারি করছে মুসা। এর একটা বিহিত করতেই হবে। বন্ধ করতে হবে এই যন্ত্রণা। এ ভাবে সারাক্ষণ মানসিক চাপের মধ্যে থাকার চেয়ে 'তোতলা মুসা' হওয়া বরং অনেক ভাল।

কিশোরকে ফোন করল সে। তৃতীয়বার রিঙ হতে তুলে নিল কিশোর, 'হালো, কিশোর পাশা বলছি।'

'আমি। মুসা।'

'ও, মুসা। কি খবর? থার্ড চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলো মিলছে না তো?'

'জাহান্নামে যাক অঙ্ক! অঙ্ক নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না আমি। এত মানসিক চাপ নিয়ে হোমওঅর্ক করা যায় না।'

'মানসিক চাপ?' অবাক হলো কিশোর। 'কিসের?'

'কিসের, জানো না?'

'না।'

'টেরির ফাইন্যাল চ্যালেঞ্জ।'

'অ,' হাসল কিশোর, 'ওটা কোন চাপ হলো নাকি? যাব আবার। লাশের কফিনে শুয়ে দেখিয়ে দেবে তুমি। ব্যস, হয়ে গেল। পাঁচশোটা কড়কড়ে ডলারও এসে যাবে, তুমিও হিরো হয়ে যাবে স্কুলে। কেউ আর তোমাকে তোতলা মুসা বলে খেপাবে না।'

'খেপালে খেপাক! মড়ার সঙ্গে শুতে পারব না আমি। মর্গের মিথ্যে কথাটা কেন বললে ওদের?'

'মুসা, এখন এ সব সাধারণ কথা নিয়ে আলোচনার সময় নেই। অঙ্কগুলো শেষ করতে হবে। রাখি? পরে দেখা হবে।'

ফোন রেখে দিল কিশোর।

রাগে জ্বলতে লাগল মুসা। রবিনকে ফোন করল।

সব কথা শুনে রবিন বলল, 'কিশোরের কাজ-কারবার আমারও কেমন অবাক লাগছে। কিন্তু বিনা কারণে তো কিছু করে না ও। ওর মনে কি আছে ও-ই জানে।'

'টেরির এই শয়তানিটা বন্ধ করা দরকার।'

'হ্যাঁ, দরকার।'

'তাহলে কিছু একটা করো। সাহায্য করো আমাকে। আমি ভাবলাম, রকি বীচে এসে কত না আরামে থাকব। কিন্তু এ যে গ্রীন হিলসের চেয়েও খারাপ অবস্থা।'

'অস্থির হয়ো না, মুসা। টেরির দল তোমার কিচ্ছু করতে পারবে না।'

রবিনের কথায় খানিকটা সান্ত্বনা পেল মুসা।

ফোন রেখে দিয়ে বিছানায় বসল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেজে উঠল আবার। ভাবল রবিন করেছে। কিন্তু কানে ঠেকানোর সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল একটা ব্যঙ্গভরা কণ্ঠ, 'কি ব্যাপার, মু-মুসা? কার সঙ্গে এত বকর-বকর করছিলে? তোমার প্রেতাত্মার সঙ্গে?'

'টা-টা-টাকি!'

'হ্যাঁ, টা-টা-টাকি! শোনো, টেরি বলেছে, ফাইন্যাল বাজিটা হবে কাল রাতে। ফিউনরল পারলারেই। কাল রাত, মনে রেখো। ভুললে, বাজি হারবে।'

*

পরদিন। পাশাপাশি হাঁটছে কিশোর আর মুসা। পরিষ্কার রাত। সেদিনের মত বৃষ্টি নেই। তবে কনকনে ঠাণ্ডা। একফালি ফ্যাকাশে চাঁদ ভেসে বেড়াচ্ছে বাড়ি-ঘরের ছাতের ওপর নীলচে-ধূসর আকাশে। গাছগুলো আজ শান্ত, নিথর।

টেরিদের বাড়ির বাইরে তাকে আর তার বন্ধুদেরকে পাওয়া গেল। কিশোরদের জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। কিশোররা আসতে সবাই মিলে দল বেঁধে চলল ফিউনরল পারলারে।

নিটু আর হ্যারল্ড একটা টেনিস বল লোফালুফি করতে করতে চলেছে। ধরতে গিয়ে বার বার মিস করছে নিটু। অন্ধকার লন থেকে গিয়ে খুঁজে খুঁজে বের করে আনছে বলটা।

টেরি, টাকি, কডি তিনজনেই গম্ভীর। আজ রাতে ওরা ফালতু কিছু করতে চায় না।

'আগের দিনের দুশো, আজকের পাঁচশো–মোট সাতশো ডলার, এনেছ?' জানতে চাইল কিশোর।

টেরি বলল, 'জেতো আগে, তারপর দেখা যাবে।'

'তারমানে টাকাটা তোমার মেরে দেয়ার ইচ্ছে?'

'মোটেও না। তুমি টাকা এনেছ কিনা, তাই বলো।'

'টাকার প্রয়োজন হবে না আমাদের,' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল কিশোর। 'কারণ বাজিটা হারছি না আমরা।' মুসার পিঠে চাপড় দিয়ে বলল, 'মুসা, রবিন আর আমার একটা সমস্যাই হবে।'

'কি?'

'এতগুলো টাকা কি করে খরচ করব।'

'অ, তাই তো! এতক্ষণ খেয়াল করলাম না, আশ্চর্য! রবিন কোথায়?'

'শরীর খারাপ। জ্বর। সেদিন রাতে ঠাণ্ডা লেগেছে। শুয়ে আছে কম্বলের তলায়।'

'আহ্হা, মিস করল। দেখতে পারল না। আজকের দেখাটাই সবচেয়ে জরুরী ছিল।'

'দেখো,' কিশোর বলল, 'তোমাকে আগেভাগে বলে দিচ্ছি, কোন রকম ফালতু নাটক করতে যাবে না। দেখতে দেখতে অসহ্য হয়ে গেছি। সত্যিকারের ভয় দেখানোর মত কিছু করতে পারলে করো, নইলে চলো, চলে যাই। ফিরে গেলে সব টাকা এবারেও মাপ করে দিতে রাজি আছি আমি।'

'তারমানে ঘাবড়ে গেছ!' খিকখিক করে হাসল টেরি। 'মানে মানে কেটে পড়তে চাইছ। তা হবে না। কালটুটাকে মু-মুসা বানিয়েই ছাড়ব আমি।...আজকে আর নকল কিছু নয়। একটা আসল লাশ আছে।'

হাঁটার সময় হঠাৎ ফুটপাতের কিনার থেকে মুসাকে ধাক্কা মেরে রাস্তায় নামিয়ে দিল কডি। 'কি, কালটু, লাশের কথা শুনে পানি আছে কলজেতে? সত্যি কথাটা স্বীকার করে ফেলো না ছাই।'

এমন জোরে এক ধাক্কা মারল কিশোর, ফুটপাত থেকে রাস্তায় পড়ে একেবারে চিত হয়ে গেল কডি। 'এবার হাত দিয়ে দেখো তো তোমার কলজেতে পানি আছে নাকি?'

উঠে দাঁড়াল কডি। ঘুসি পাকিয়ে ছুটে আসতে গেল কিশোরের দিকে। ততক্ষণে সামলে নিয়েছে মুসা। রুখে দাঁড়াল কডিকে।

ঘটনা অন্য দিকে মোড় নিচ্ছে দেখে ধমক দিয়ে কডিকে থামাল টেরি।

নীরবে পথ চলল এরপর সবাই। আর কোন অঘটন ঘটাল না।

পাতাবাহারের বেড়ার ধারে পার্কিং লটের পেছনে আগের দিনের জায়গায় এসে দাঁড়াল ওরা। অন্ধকারের মধ্যে বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন ফিউনরল পারলারটা। আজ রাতে বৃষ্টি নেই। বাতাসও নেই। সব কেমন থমথমে। এক ধরনের ভুতুড়ে নিস্তব্ধতা। মৃত্যুর মত নিথর।

টেরির পিছু পিছু পেছনের জানালাটার দিকে এগিয়ে চলল সবাই। পার্কিং লটের পাকা চত্বরে জুতো ঘষার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

বিল্ডিঙের পেছনের ঘন অন্ধকারের মধ্যে এসে ঢুকল ওরা। বন্ধ জানালাটা খুলল টেরি। মুসাকে ইঙ্গিত করল আগে ভেতরে ঢোকার জন্যে।

দ্বিধা করতে লাগল মুসা। কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি সত্যি লাশ আছে?'

মাথা ঝাঁকাল টেরি। 'আছে। সত্যিকারের মড়া। আজ সকালে রেখে গেছে। সেজন্যেই তো আজকে আসতে বললাম।'

'মড়াটা এখনও তাজা,' রসিকতার ঢঙে বলল হ্যারল্ড।

কেউ তার কথায় হাসল না।

ভ্যান থেকে কালো ব্যাগে ভরে সেদিনকার লাশ নামানোর দৃশ্যটা মনে পড়ল মুসার। সেদিন অবশ্য ভেতরে টেরি ছিল। কিন্তু দৃশ্যটা ভয়ানক। গায়ে কাঁটা দিল তার।

টেরি বলল, 'যাও, মু-ম্মুসা। আজ দেখব তোমার সাহস কেমন। জলদি করো। কে, কখন লাশ রাখতে চলে আসবে ঠিক নেই।' ঠেলা দিয়ে মুসাকে জানালার চৌকাঠে তুলে দিল সে। 'যাও, যাও, তোমার কাজ শুরু করো।'

শেষবারের মত সবার দিকে ফিরে তাকাল মুসা। ভঙ্গি দেখে মনে হলো চিরকালের জন্যে যাচ্ছে, আর কোনদিন দেখা হবে না ওদের সঙ্গে।

তারপর লাফ দিয়ে নামল ভেতরে।

ষোলো

সঙ্গে সঙ্গে নাকে এসে ধাক্কা মারল ফরমালডিহাইডের বিশ্রী, তীব্র গন্ধ। আগের দিনের চেয়ে অনেক বেশি। নাক টিপে ধরল সে। মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে লাগল।

পেছনে খসখস শব্দ। তারপর জুতো পায়ে ধপ করে নামিয়ে নামল কেউ। বাইরে যারা ছিল সবাই জানালা গলে এক এক করে ঢুকতে শুরু করেছে।

আলো জ্বেলে দিল টেরি। ছাত থেকে ভূতের জ্বলন্ত কানা চোখের মত তাকিয়ে রইল ম্লান আলোটা। রহস্যময় করে তুলল ঘরের পরিবেশ। আলো-আঁধারির খেলা। লম্বা লম্বা, উদ্ভট ছায়া সৃষ্টি করেছে টেবিল আর কফিনগুলোর আনাচে-কানাচে।

মুসার মনে হলো ওই ছায়ার মধ্যে ঢুকলে আর জ্যান্ত বেরোনোর আশা নেই। দ্বিধা করতে লাগল সে। কিশোরের দিকে তাকাতে মাথা ঝাঁকাল সে।

সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে কফিনের সারির দিকে এগোল মুসা। সবগুলোর ডালা নামানো। মলিন আলোতেও চকচক করছে কালো পালিশ করা বাক্সগুলোর গা।

কাঁধে হাতের চাপ পড়ল। ফিরে তাকাল মুসা। পিত্তি জ্বালানো কুৎসিত হাসিতে ভরে গেছে টেরির মুখ। 'সমস্যাটা কি তোমার? এত দ্বিধা কেন? ভয় লাগছে?'

জবাব দিল না মুসা। কফিনের সারির ওপর দৃষ্টি স্থির।

কাঁধে হাতের চাপ বাড়ল। 'চাইলে সুযোগ একটা দিতে পারি তোমাকে।'

ফিরে তাকাল মুসা। 'সুযোগ?'

মাথা ঝাঁকাল টেরি। 'বুঝতে পারছি, প্যান্ট ভেজানোর সময় হয়েছে

তোমার। মেঝেতেও পড়বে। পরিষ্কার করবে কে? তারচেয়ে তোমাকে বেরিয়ে যেতে দেয়া উচিত।'

হেসে উঠল তার সঙ্গীরা।

'কার প্যান্ট খারাপ হয় আজ, দেখা যাবে,' রহস্যময় কণ্ঠে বলল মুসা। 'ফালতু কথা বাদ দিয়ে কোন্‌টাতে ঢুকতে হবে তা-ই বলো!'

চোখের পাতা সরু সরু হয়ে এল টেরির। 'গলাবাজিটা থাকবে না হে, কা-কা-কালটু মিয়া! বুড়োটা মরেছে বড় সাংঘাতিক মরা। ক্যান্সারে ভুগে ভুগে জ্যান্ত থাকতেই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল শরীরটা। তোমাকে অবশ্য বেশিক্ষণ সঙ্গ দিতে হবে না ওকে। হাত মেলাবে। তারপর কফিনে ঢুকে দুই গালে চুমু খাবে। ব্যস।...এসো আমার সঙ্গে।'

মুসা ভয় পেয়েছে কিনা বুঝতে পারল না টেরি। অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ল, 'ভয় তো পেয়েছ বোঝাই যাচ্ছে। টাকাটা দিয়ে দাও আমাদের, চলে যাও। এখন দিলে আর পাঁচশো দিতে হবে না; আগের বার যেটা ছিল, দুশো–সেটা দিলেই চলবে।'

'মুসা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুঁটকিটার বকবক শুনছ কেন? ফরমালডিহাইডের চেয়ে বেশি দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে ওর গা থেকে, বমি আসছে আমার,' শীতল কণ্ঠে কিশোর বলল। 'যাও, সেরে ফেলো কাজটা।

ফ্যাকফ্যাক করে হাসল টেরি। 'একটু পরেই বোঝা যাবে কার গা দিয়ে বেশি গন্ধ বেরোয়। ধোপাও ধুতে চাইবে না তোমাদের কাপড়।'

'কোন্ কক্কিনটাতে ঢুকতে হবে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

একটা কফিনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল টেরি। সাহায্য করতে ডাকল টাকিকে। দুজনে মিলে চেপে ধরে তুলতে শুরু করল ডালাটা।

লাশটার ওপর চোখ পড়ল মুসার। ধড়াস করে উঠল বুকের মধ্যে।

চিত হয়ে শুয়ে আছে লাশটা। কালো স্যুট, সাদা শার্ট, কালো টাই। দুই পাশে লম্বা হয়ে পড়ে আছে হাত দুটো। আঙুলগুলো মোমের মত ফ্যাকাশে।

মাথার চুল উঠে গেছে রোগের কারণে। পাতলা ফুরফুরে চুলগুলো যত্ন করে আঁচড়ে দেয়া হয়েছে পেছন দিকে। ঠেলে বেরিয়ে আছে বড় বড় লাল তিলে ভরা কপাল। চোয়াল বসা। মুখে মাংস বলতে নেই। চোখ বোজা। ঠোঁটের রঙ দেখে মনে হয় ড্রাকুলার মত রক্ত খেয়েছিল, শুকিয়ে কালচে-বাদামী হয়ে আছে। মারা যাওয়ার আগে মুখের মধ্যে রক্ত চলে এসেছিল বোধহয়, সেখান থেকেই দু'এক ফোঁটা বেরিয়ে ঠোঁটে লেগে গেছে। মুখের চামড়ার রঙটাও স্বাভাবিক নয়, ফ্যাকাশে কমলা।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল মুসা। তারপর কফিনের ওপর ঝুঁকল।

'যাও,' কিশোর বলল, 'কোন অসুবিধে নেই। সব ঠিক আছে।'

ফিরে তাকাল মুসা, 'কি-কি-কিন্তু লা-লা-লাশটা যদি সত্যি সত্যি খামচে ধরে?'

হেসে উঠল কডি। মুসার দিকে আঙুল তুলে বলল, 'কা-কা-কালটু মুসার চেহারা দেখো। আজকে সত্যি সত্যি পেসাব করে দেবে।'

হেসে উঠল নিটু আর হ্যারল্ড।

লাশের পায়ের দিকটাতে রয়েছে টাকি। ডালা থেকে হাত সরায়নি। সে হাসল না। লাশটার চকচকে কালো জুতো আলোয় চমকাচ্ছে। অস্বস্তিভরে

তাকিয়ে আছে সেদিকে।

মুসাকে ডাকল টেরি, 'নাও, হাত মেলাও বুড়োর সঙ্গে। যদি সাহস থাকে।'

ঢোক গিলল মুসা। লাশটার দিকে তাকিয়ে আছে চিন্তিত ভঙ্গিতে। মুখ তুলে দেখল বাকি কফিনগুলো।

'ওগুলোর দিকে তাকাচ্ছ কেন? এটাতে ঢুকতে বলা হচ্ছে তোমাকে। পারবে?' জিজ্ঞেস করল টেরি। 'নাকি হার স্বীকার করে নেবে? এটা কিন্তু সত্যি সত্যি লাশ। আজ আর কোন ফাঁকিবাজি নেই।'

কফিনগুলো দেখাল মুসা, 'ওগুলোতে লাশ নেই?'

'আছে হয়তো, জানি না। থাকলেও বহুদিনের। পচা-গলা।' মুচকি হাসি ফুটল ঠোঁটে, 'কেন, তাজাটা পছন্দ হচ্ছে না? পচাগুলোর গালে চুমু খাবে?'

তাড়াতাড়ি মুখ ফেরাল মুসা। 'আ-আমি···ঠিক আছে, ঢুকছি!'

'প্রথমে হাত মেলাও, তারপর ভেতরে ঢোকো। কোলাকুলি করো, দুই গালে চুমু খাও, এবং বেরিয়ে এসো।'

ভারী দম নিল মুসা। বাতাসটা আটকে ফেলল ফুসফুসে, ছাড়ল না। তারপর আস্তে বাড়িয়ে দিল ডান হাতটা। চোখ বুজল।

ভাবছে, সত্যি সত্যি মরা মানুষের সঙ্গেই হাত মেলাতে যাচ্ছে?

ধরল হাতটা। বাপরে! কি ভয়ানক ঠাণ্ডা! তারমানে আসল লাশই!

চোখ মেলল।

'ঝাঁকি দাও,' টেরি বলল।

ঝাঁকি দিল মুসা। একবার। দুবার। শক্ত হয়ে গেছে হাতটা। নড়তে চাইল না।

'কি বুঝলে, পচা শুঁটকি?' ভুরু নাচাল কিশোর। 'তোমরা হেরে যাচ্ছ, লিখে রাখতে পারো।'

'দেখাই যাক না,' টেরি বলল, 'মাত্র তো শুরু করেছে। এবার ভেতরে ঢোকো। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো লাশটার ওপর।'

দ্বিধা করতে লাগল মুসা।

কডি বলল, 'ভয় পাচ্ছে কা-কা-ক্কালটুটা···'

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল মুসা। ডান হাতটায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ঠাস করে শব্দ হলো। 'মাগ্গোহ্!' বলে মুখ চেপে ধরল কডি। ভয়ানক স্বরে মুসা বলল, 'সাবধান করে দিলাম! কোনদিন যদি আর ওভাবে ব্যঙ্গ করো, একটা দাঁতও রাখব না, মনে রেখো।'

আহত নেকড়ের মত জ্বলে উঠল কডির চোখ। পাল্টা আঘাত হানার জন্যে হাত তুলতে গিয়েও থমকে গেল। মরফিকে কিভাবে পিটিয়েছে মুসা, শুনেছে টাকির মুখে।

ঘটনার আকস্মিকতায় স্তব্ধ হয়ে গেছে টেরি-বাহিনী। মুসার এই রূপ দেখেনি আর। নতুন দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে।

কডিকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে ঘুরে দাঁড়াল মুসা। কফিনের মধ্যে ঝুঁকল। প্রচণ্ড রাগ মনে। পাথর হয়ে গেছে যেন মনটা। দুনিয়ার কোন কিছুকেই আর পরোয়া করে না এ মুহূর্তে। কমলা রঙের ভয়ঙ্কর মুখটাকেও আর ভয়ানক লাগছে না দেখতে। সহজেই চুমু খেতে পারবে ওই গালে।

সব ক'টা চোখের দৃষ্টি এখন মুসার ওপর।

কফিনের কিনার খামচে ধরে উঠতে যাবে, ঠিক এই সময় মচমচ করে উঠল কি যেন।

থমকে গেল সে। সোজা হয়ে দাঁড়াল।

আবার মচমচ।

ফিরে তাকাল মুসা। টেরির চোখে ভয় দেখতে পেল। তার দোস্তদের চোখেও।

'কিসের শব্দ?' ফিসফিস করে বলল টাকি। জোরে বলতে ভয় পাচ্ছে।

নিশ্চিত হলো মুসা, আজ আর কোন চালাকির মধ্যে যায়নি টেরির দল। তাহলে ঘাবড়াত না। সত্যিকার লাশের সঙ্গেই মুসাকে কোলাকুলি করতে নিয়ে এসেছে ওরা।

আবার শব্দ।

অন্য কফিনগুলোর দিকে তাকাল মুসা।

একটা কফিনের ডালা নড়ে উঠতে দেখল। আরেকটা। তারপর আরেকটা।

ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে কফিনগুলোর ডালা।

সতেরো

রক্ত পানি করা চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে সরে এল মুসা। টলতে টলতে সরে গেল দেয়ালের দিকে।

কফিনের সারির দিকে তাকাল। ডালা ঠেলে তোলা হাতগুলো দেখতে পাচ্ছে। পচে ফুলে ওঠা সবজে-লাল হাত। দুর্ঘটনায় ডলা লেগে বিকৃত হয়ে যাওয়া বেগুনি হাত। মোমের মত সাদা ফ্যাকাশে হাত।

'আ-আ-আমরা বি-বি-ব্বিরক্ত করেছি ওদের,' ভালমত তোতলাতে শুরু করল মুসা। 'মি-মি-মৃত মানুষের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছি। প-প-প্প্রতিশোধ নিতে আ-আ-আসছে।'

একটা কফিনের ডালা পুরোপুরি উঠে গেছে। কুৎসিত, খসখসে গোঙানি শোনা গেল ওটার ভেতর থেকে। একটা মড়া উঠে বসল। পুরানো হতে হতে সবুজ হয়ে গেছে চামড়া। পচা-গলা মাথাটা ঘুরিয়ে তাকাল টেরির দিকে। চোখ খোলার চেষ্টা করছে। কিন্তু সেলাই করে পাতা দুটো লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল বলে খুলতে পারছে না।

গোঙানি, উহ্-আহ্, জোরাল গভীর দীর্ঘশ্বাস—নানা রকম ভয়ঙ্কর শব্দে ভরে গেল ঘরের বাতাস।

অন্য একটা কফিন থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করল আরেকটা মড়া। পচে, ফুলে বীভৎস হয়ে গেছে মুখটা। রক্তশূন্য চামড়ার রঙ মোমের মত। লাশ তো, তাই স্বাভাবিক মানুষের মত ক্ষিপ্রতা নেই বোধহয় গায়ে, ধীরে-সুস্থে, বেশ ভারী পায়ে নামছে।

তৃতীয় লাশটাও উঠে বসেছে এখন। বেগুনী লাশ। নাকের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আসা সাদা সাদা কৃমিগুলোকে ঝুলতে দেখে পেট গুলিয়ে উঠল

মুসার।

বিকট চিৎকার বেরিয়ে এল টেরির মুখ থেকে।

'অ-অ-অসম্ভব!' কডি বলল। 'এ হতেই পারে না!'

'মড়াদের বিরক্ত করেছি আমরা!' আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'ওদের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছি। ওরা আমাদের ছাড়বে না...'

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল একটা কাঠের আলমারির দরজা। দড়াম করে গিয়ে পাল্লাটা বাড়ি খেল শক্ত দেয়ালে।

পা টেনে টেনে বেরিয়ে এল একটা ভয়ঙ্কর-দর্শন লাশ। নিশিতে পাওয়া মানুষের মত ঘোরের মধ্যে হাঁটছে। ওটার চোখের পাতাও সেলাই করে লাগানো। খুলতে পারছে না। মাথার চামড়া অর্ধেক ছিলে এসে ঝুলে রয়েছে কপালে। সামনে দুই হাত বাড়িয়ে থপ থপ করে পা ফেলে এগোতে লাগল ধরার জন্যে।

চিৎকার করে উঠল মুসা।

চিৎকার করে উঠল কিশোর।

টেরি আর টাকি সরে চলে এল মুসার কাছে।

আরেকটা রক্ত জমানো গোঙানি শোনা গেল। ফিরে তাকাল সবাই। আরও একটা লাশ বেরিয়ে এসেছে। মাথায় চওড়া কানাওয়ালা হ্যাট। গায়ে ঢলঢলে একটা ট্রেঞ্চ কোট, নিজের আকারের চেয়ে অনেক বড়। টলতে টলতে এগিয়ে আসতে লাগল মুসাদের দিকে।

কুঁজো হয়ে এগোচ্ছে। লাশের চেহারা ঢেকে দিয়েছে হ্যাটের কানা। সামান্য মুখ তুলতেই যেটুকু অংশ চোখে পড়ল, তাতেই বুকের রক্ত পানি হয়ে যাওয়ার কথা অতি বড় সাহসীরও।

মুখের অর্ধেকটা আছে, বাকি অর্ধেকের মাংস গায়েব। খসে পড়ে গেছে। হাড়গুলো শুধু দেখা যাচ্ছে। শূন্য কোটর থেকে ঝুলছে একটা মরা ইঁদুর।

আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল কিশোর।

কুৎসিত গোঙানি। ঘড়ঘড়ানি। আর চাপা দীর্ঘশ্বাস। চলছে একটানা।

দুর্ঘটনায় মৃত লম্বা, বেগুনি রঙের থেঁতলানো, বিকৃত লাশটা নেতৃত্ব দিচ্ছে মড়াদের। মাথা নিচু করা, চোখ বোজা। অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাঁটছে। এক পা বাড়িয়ে দিচ্ছে সামনে, থমকাচ্ছে, তারপর আরেকটা পা ফেলছে।

থমকে দাঁড়াল হঠাৎ।

ঝাঁকি লেগে কাঁধ থেকে খসে পড়ে গেল একটা হাত। বিশ্রী শব্দ করে মেঝেতে পড়ল। লাফ দিয়ে চলে গেল একটা টেবিলের নিচে।

হাত খসে পড়াতে যেন কিছুই হয়নি লাশটার। পরোয়াই করল না। একটা সেকেন্ড বিরতি দিয়েই আবার আগের মত এগিয়ে আসতে শুরু করল।

'জলদি পালাও!' চিৎকার করে উঠল হ্যারল্ড। আতঙ্কে কুঁচকে গেছে চোখ-মুখ।

কিন্তু দেরি করে ফেলেছে।

জানালার দিকটাকে আড়াল করে অর্ধচন্দ্রাকারে সারি দিয়ে ওদের কোণঠাসা করে ফেলেছে লাশের দল।

দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে সবার।

কফিনের লাশটার দিকে তাকাল মুসা। একমাত্র মড়া, যেটা একইভাবে পড়ে রয়েছে। কফিন থেকে উঠে আসেনি। আসার কোন লক্ষণও দেখাচ্ছে না।

ওটার দিকে নজর নেই কারও। তাকিয়ে আছে এগিয়ে আসতে থাকা লাশগুলোর দিকে। টেনে টেনে হাঁটার কারণে জুতো ঘষার খসখস শব্দ হচ্ছে মেঝেতে।

চিৎকার করে উঠল আবার কিশোর, ‘মুসা, কিছু একটা করো!’

‘আমাকে বলছ!’ কেঁপে উঠল মুসার গলা। ‘আমি করব?’

‘থামাও ওদের!’ চেঁচিয়ে উঠে মুসাকে সামনে ঠেলে দিল টেরি। ‘মুসা…তুমিই পারবে! আমাদের মধ্যে একমাত্র তোমারই সাহস আছে!’

‘আমার!’ বিশ্বাস করতে পারছে না যেন মুসা।

‘হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার! বাজিটা জিতে গেছ তুমি!’ সাইরেনের মত কাঁপা কাঁপা শব্দে নিঃশ্বাস বেরোচ্ছে টেরির নাক দিয়ে। এমন ভয় পাওয়াই পেয়েছে, এতটাই ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মুখের চামড়া, তিলগুলোও এখন অদৃশ্য। ‘তুমি জিতে গেছ! তুমি জিতে গেছ! তুমি জিতে গেছ! তিনবার বললাম। তারমানে তোমার জেতা নিয়ে কারও সন্দেহ নেই আর। দোহাই তো-তো-তোমার, মুসা, কঁ-কঁ-কঁরো কিছু…’ আতঙ্কে তোতলানোর সঙ্গে চন্দ্রবিন্দুও যোগ হয়ে গেছে টেরির উচ্চারণে।

‘মুরগির মত কঁক্-কঁক্ করতে বলছ? মড়াগুলো ভয় পাবে তাতে?’

‘আরে না না! কঁক্-কঁক্ না! ওগুলোকে…’

‘ও, জবাই করব! মুরগির মত?’

‘পা-পা-প্পারলে তাই করো!’

‘কিন্তু ছুরি কোথায়?’ অসহায় ভঙ্গিতে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা।

‘শুঁ-শুঁ-শুঁটকির কাছে…’ কথাটা আটকে গেল কিশোরের। বের আর করতে পারল না।

দুই হাত নাড়তে লাগল টেরি, ‘ছু-ছু-ছুরি-টুরি কিছু নেই আ-আ-আ…’

‘গেছে আজ!’ হতাশ ভঙ্গিতে কপাল চাপড়াল কিশোর। ‘স-স-সব কটাকে তোতলা বানিয়ে দিয়েছে ভূ-ভূ-ভূ-ভূ…’ কোনমতেই বের করতে পারছে না শব্দটা। বের করার জন্যেই যেন জোরে এক ধাক্কা মারল মুসার পিঠে এবং হড়হড় করে স্পষ্ট কথা বেরিয়ে এল, ‘দৈত্যগুলোকে ঠেকাও! বাঁচাও আমাদের!’

ধাক্কা খেয়ে সামনে গিয়ে পড়ল মুসা।

একটা লাশ ওকে ধরে না ফেললে হুমড়ি খেয়ে পড়ত মেঝেতে। পচা, মাংস খসা বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল ওকে লাশটা।

আঠারো

‘ছাড়ো! ছাড়ো আমাকে!’ গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করল মুসা, ভয় নয়, হুমকি। কেঁচোর মত শরীর মোচড়াচ্ছে, ছটফট করছে, লাশের বাহু থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে। ‘নইলে ভূতগিরি

ঘুচিয়ে দেব আজ জন্মের মত!'

কিন্তু চোখ বোজা, সবুজ দানবটা ছাড়ল না ওকে। ঝাড়া লাগতে জট পাকানো চুলের বোঝা থেকে ঝরঝর করে ঝরে পড়তে লাগল মাছির সাদা সাদা শুঁয়াপোকা। পচা মুখটা নিয়ে এল চোখের সামনে। বাহুর চাপ আরও বেড়েছে। চাপ দিয়ে ভর্তা করে দেবে যেন হাড়-পাঁজরা।

হুটোপুটি শোনা গেল পেছনে।

কোনমতে ঘাড় ঘুরিয়ে মুসা দেখল, সামান্য সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করেছে টেরিরা, পড়িমড়ি করে জানালার দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। মজা দেখার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকার কথা কল্পনায়ও আনছে না আর ওরা।

সবার আগে জানালার কাছে পৌঁছল কড়ি। মুহূর্তে উড়ে চলে গেল যেন বাইরে।

মুসার কোমর জড়িয়ে ধরে কানের কাছে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করতে লাগল সবুজ মড়াটা।

সেসব দেখার সময় নেই নিটু আর হ্যারল্ডের। কার আগে কে জানালা টপকাবে এই নিয়ে হুড়াহুড়ি শুরু করল। ধাক্কা দিয়ে দুজনকে দুই পাশে ফেলে বেরোনোর চেষ্টা করল কিশোর। তাতে গেল সব জট পাকিয়ে, তিনজনের কেউ বেরোতে পারল না। মাথার ওপর দিয়ে ডাইভ দিল টাকি। কপাল ঠুকে গেল চৌকাঠে। ব্যথাটাকে পাত্তাই দিল না সে। ডিগবাজি খেয়ে গিয়ে পড়ল জানালার বাইরে। ফাঁক পেয়ে তার পর পরই বেরিয়ে গেল টেরি। ওর ঠ্যাং ধরে বেয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিল কিশোর। পারল না। পড়ে গেল মেঝেতে। টেরির পর একে একে বেরোল নিটু আর হ্যারল্ড।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। জানালায় উঠে বসল। চিৎকার করে ডাকতে লাগল, 'টেরি! টাকি! কড়ি! তোমাদের ঈশ্বরের দোহাই লাগে! আমাকে নিয়ে যাও। ফেলে পালিও না...'

কিন্তু কেউ তার কথার জবাব দিল না। কাদা-পানিতে জুতো ফেলার ছপছপ শব্দ শোনা যাচ্ছে কেবল।

লাফিয়ে অন্যপাশে নেমে গেল কিশোর। তার জুতোর শব্দও মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

চুপ হয়ে গেছে মুসা। তাকে নড়তে-চড়তে না দেখে সবুজ মড়াটাও শান্ত হয়ে গেছে। চাপ দিচ্ছে না আর। ঝটকা দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে পিছিয়ে এল মুসা।

দৌড়ে এল জানালার কাছে। মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিল জানালার বাইরে।

আবছা অন্ধকারে অনেকগুলো ছায়ামূর্তিকে ছুটে যেতে দেখল পাতাবাহারের বেড়ার দিকে।

মড়াগুলোর দিকে ফিরল আবার মুসা। মুচকি হাসি ফুটেছে মুখে। সবুজ মড়াটাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'পালিয়েছে সব। চলো, এই সুযোগে কেটে পড়া যাক।'

টান দিয়ে মুখ থেকে মুখোশটা খুলে নিল সবুজ মড়া। বেরিয়ে পড়ল রবিনের হাসিমুখ। 'কিশোর কোথায়?'

'ভঙ্গি দেখে যে কেউ ভাববে ভূতের তাড়া খেয়ে পালিয়েছে,' হাসতে হাসতে বলল মুসা। 'ওর কাণ্ড দেখেই আরও ভড়কে গেছে শুঁটকি-বাহিনী।'

'কাণ্ড তুমিও কম করনি। উহ্, দুজনে মিলে যা শুরু করলে, হাসি চেপে রাখাই কঠিন হয়ে গিয়েছিল আমার জন্যে!'

'তোমাদের অভিনয় আরও ভাল হয়েছে,' মেঝেতে চোখ পড়ল মুসার। মাছির পোকাগুলোর দিকে। অনড় পড়ে আছে। আজকাল প্ল্যাস্টিক দিয়ে কত রকমের জিনিস যে তৈরি করছে খেলনাওলারা। মুখ তুলল। 'দারুণ হয়েছে ছদ্মবেশ। কারও বাপেরও চেনার সাধ্য ছিল না।...সত্যি সত্যি ভূত ভেবে আরেকটু হলে আমিও পালাচ্ছিলাম!'

*

আধঘন্টা পর।

স্যালভিজ ইয়ার্ডে তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত ওঅর্কশপে গাদাগাদি করে বসেছে ওরা সাতজন। কিশোর, মুসা, রবিন, তাদের দুই বন্ধু টম ও বিড, এবং ওদের দুজনের বন্ধু বারটি আর ডিউক।

হাসতে হাসতে পেট ব্যথা হয়ে গেছে ওদের। তা-ও থামছে না হাসি। হসির দমকে কয়েকবার করে পানি এসেছে চোখের কোণে। মুছেছে, আবার হেসেছে।

'ওফ্, হাসতে হাসতেই কাহিল হয়ে গেছি!' মুসা বলল। 'কিশোর, আর সহ্য করতে পারছি না। ফ্রিজে কিছু নেই তোমাদের?'

'বসো। নিয়ে আসছি।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গোটা চারেক পিৎসা আর বড় এক জগ কমলার রস নিয়ে হাজির হলো কিশোর।

খাবারের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সবাই। খিদে পেয়েছে সবারই।

খেতে খেতে মুসা বলল, 'কিশোরের প্ল্যানটা যে এ ভাবে কাজে দেবে, ভাবতে পারিনি। সত্যি বলতে কি, শুরুতে তো রাগই হচ্ছিল আমার ওর ওপর, টেরির দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শত্রুতা করছে ভেবে।'

'আর এখন?' হেসে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'সেটা কি বুঝিয়ে বলতে হবে?'

'না, তা হবে না। তোমার রাগ হয়েছে, তাতে আর দোষ কি, ওর আচরণে আমিই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি, তোমার ভয়ের রোগটা সারানোর জন্যেই এই চালাকি করেছিল সে...'

'প্রশংসাটা বেশি হয়ে যাচ্ছে, বাদ দাও এবার,' হাত তুলল কিশোর। 'মুসা, তোমার ভয়টা গেছে তো?'

'একেবারে,' মাথা কাত করল মুসা।

'আর কিছুকে ভয় পাবে না কখনও?'

'জীবনেও না।'

'তা তো হলো,' বিড বলল। 'কিন্তু শুঁটকির গোষ্ঠী বাজির টাকা মিটিয়েছে?'

'দেবে আর কখন?' হাসতে হাসতে বলল কিশোর। 'প্রাণ নিয়ে পালানোর পথ পাচ্ছিল না, আবার টাকা। জানালার কাছে যা হুড়াহুড়িটা করল...' দৃশ্যটা মনে করে হো-হো করে হেসে উঠল আবার সে।

হাসিটা সংক্রমিত হলো সবার মাঝে।

আরেক দফা হাসাহাসি আর চোখ মোছামুছির পর কিশোর বলল,

'চিন্তা নেই, আশা করি কাল স্কুলেই আদায় করে ফেলতে পারব টাকাটা।'

'যদি দিতে না চায়?'

'তোমরা তো আছই। আবার এমন এক প্যাঁচে ফেলব, সেধে এসে পায়ে ধরে দিয়ে যাবে।'

*

খেয়েদেয়ে কিশোরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্যালভিজ ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এল মুসা, রবিন, টম, বিড ও তাদের বন্ধুরা। গেট পর্যন্ত তাদের এগিয়ে দিয়ে গেল কিশোর।

সবাই এক জায়গায় থাকে না। একসঙ্গে যতদূর যাওয়া যায়, গেল, তারপর আলাদা হয়ে যার যার বাড়ির দিকে রওনা হতে লাগল একে একে।

সবার শেষে আলাদা হলো মুসা আর রবিন।

নির্জন রাস্তা ধরে হনহন করে হেঁটে চলল মুসা। একটা জায়গায় দু'ধারে গাছের সারি। ঘন ঝোপঝাড়। তার মধ্যে দিয়ে চলে গেছে পথ।

সেখানটায় এসে থমকে দাঁড়াল মুসা। ভয়ে ভয়ে তাকাল অন্ধকারের দিকে। বুঝতে পারছে, মুখে যতই বলুক ভয় পাবে না, ভূতের ভয় সে মন থেকে তাড়াতে পারবে না কোনদিন।

চারপাশে তাকাল অন্য কোন পথচারী আছে কিনা সেই আশায়। কিন্তু এত রাতে কে আর বেরোবে অকারণে। কাউকে দেখল না।

অনন্তকাল ধরে দাঁড়িয়েও থাকা যায় না। দোয়া-দরূদ পড়ে ফুঁ দিয়ে নিল বুকে। তারপর 'যা থাকে কপালে' ভেবে দিল ভোঁ দৌড়।

টেরির কপাল খারাপ, দৌড়টা দেখতে পেল না। এ মুহূর্তটার জন্যে পঞ্চাশ হাজার ডলার বাজি ধরতেও দ্বিধা করত না তাহলে সে।

***
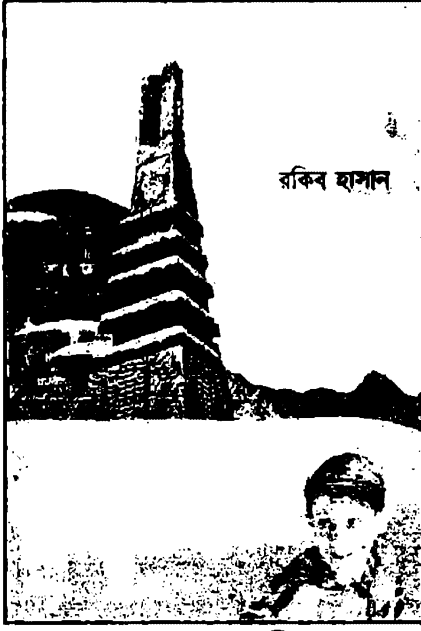
টাইম ট্র্যাভেল

প্রথম প্রকাশঃ ২০০২

'অকারণে সময় নষ্ট করছি আমরা,' ফিসফিস করে বলল দু'জনের মধ্যে লম্বা লোকটা। তার নাম মাজুল। 'নতুন কিছুই আবিষ্কার করেননি ডক্টর স্টিভেনস। করলে এতদিনে জেনে যেতাম।'

'সব সময়ই বড় বেশি অধৈর্য তুমি, গাজুল,' তিরস্কার করল দু'জনের মধ্যে বেঁটে লোকটা।

ব্রেন স্পেশালিস্ট বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডক্টর জ্যাক স্টিভেনসের বাড়িতে লুকিয়ে আছে ওরা। রান্নাঘরের আলমারির আড়ালে রয়েছে এখন। তিনি নতুন কোন ফরমুলা আবিষ্কার করেছেন কিনা জানতে এসেছে। যদি করে থাকেন, হয় ফরমুলাটা চুরি করবে, নয়তো কপি করে নিয়ে যাবে।

'ফরমুলা যদি না-ই পাই, তাহলে আরেক কাজ করব,' গাজুল বলল। 'এসেছি যখন, একেবারে খালি হাতে ফিরব না। আর কিছু না হোক, মনিবের জন্যে কয়েকটা গোলাম ধরে নিয়ে যাব। কি বলো?'

'ঠিক, ভাল বুদ্ধি,' উল্লসিত হয়ে মাথা ঝাঁকাল মাজুল। 'কিন্তু বুদ্ধিমান গোলাম পাব কোথায়? শহরটার লোকজনকে দেখে বোঝা যাচ্ছে একেবারে আদিম অবস্থাতেই রয়ে গেছে এরা। বুদ্ধিশুদ্ধিও বড় কম। বেশি বোকা।'

'বোকারা কিন্তু ভাল গোলাম হয়,' গাজুল বলল। 'কথা শোনানো যায়।'

'তা বটে। কিন্তু বোকা লোক যে পছন্দ করেন না মনিব,' মাজুল বলল। 'যাকগে। আমার খিদে পেয়েছে।'

আলমারির আড়াল থেকে সে বেরোনোর উপক্রম করতেই খপ করে তার হাত চেপে ধরল গাজুল। 'পাগল হলে নাকি? ডক্টর স্টিভেনস ঘোরাফেরা করছেন এদিকেই। দেখে ফেললে আমাদের লুকিয়ে থাকার কষ্টটাই মাটি হবে।'

'কিন্তু আমার খিদে পেয়েছে যে!'

'উনি এদিক থেকে চলে গেলেই বেরোব আমরা। খিদে তো আমারও পেয়েছে।' ফিসফিস করে বলল গাজুল। 'খিদের কথা বাদ দাও। যা বলছিলাম। আচ্ছা, এক কাজ তো করা যায়। বোকাগুলোকে চালাক করার জন্যে মগজশক্তি রসায়ন ব্যবহার করতে পারি। কয়েকটা অল্পবয়েসী কিশোর ছেলেকে ধরে নিয়ে যাই চলো। অল্প বয়েসী ছেলেগুলোর প্রচুর শক্তি থাকে শরীরে। খাটতে পারে। মগজটাকে উন্নত করে নেয়া গেলে ভাল গোলাম হবে। দেখলে খুশি হবেন বস।'

'হ্যাঁ, তা হবেন। কিন্তু পছন্দসই ওরকম কয়েকটা বোকা ছেলে পাব কোথায়

আমরা?'

জবাব দেয়ার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল গাজুল। কলিং বেল বাজানোর শব্দে থেমে গেল। এক মুহূর্ত কান পেতে রইল চুপচাপ। তারপর বলল, 'মনে হচ্ছে ডক্টর স্টিভেনসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে কেউ।'

দুই

কলিং বেলের বোতাম টিপে দিয়ে দরজার গোড়ায় বিছানো খড়ের বানানো ম্যাটের ওপর থেকে পিছিয়ে গেল কিশোর পাশা। ঘরের ভেতরে ঘণ্টা বাজার শব্দ শুনতে পেল।

ফিরে তাকাল তার দুই সহকারী মুসা আর রবিনের দিকে, 'কাজটা কি ঠিক হচ্ছে?'

'হচ্ছে।' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা চুলকে জবাব দিল রবিন, 'আঙ্কেল জ্যাক আমাদের সাহায্য করতে না পারলে দুনিয়ার আর কেউ পারবে না।'

দরজার গায়ে লাগানো পিতলের নামফলকটার দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। তাতে লেখা:

ডক্টর জ্যাক স্টিভেনস, ব্রেন এক্সপার্ট
রকি বীচ সাইন্স ল্যাবরেটরি

'কিন্তু সত্যিই যদি আমাদের বোকা ভেবে বসেন তিনি?' মুসার কণ্ঠেও অস্বস্তি।

'এটা আর নতুন কি?' করুণ শোনাল কিশোরের কণ্ঠ। 'সবাই তো আজকাল তা-ই ভাবছে আমাদের। কোনদিন, কখনই আর মনে হচ্ছে স্কুলের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ছেলে হতে পারব না আমরা।'

'ওই যে যা বললাম,' কিশোরের কথার সঙ্গে যোগ করল রবিন, 'আঙ্কেল জ্যাক যদি আমাদের বোকা ভেবে বসেনও, তিনি সাহায্য করতে না পারলে দুনিয়ার আর কেউ করতে পারবে না। তবে, আমি শিওর, তিনি আমাদের ফিরিয়ে দেবেন না। এটুকু ভরসা না থাকলে কি আর আসতাম।'

বাড়ির ভেতরে পদশব্দ কানে এল ওদের। এগিয়ে আসছে।

মাথা চুলকানো বন্ধ করে হাতটা সরিয়ে আনল রবিন।

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে টেনেটুনে কাপড়-চোপড় ঠিক করল কিশোর। অস্বস্তি বোধ করছে। প্যান্টের পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে দিল।

মুসার মুখ দেখে মনে হলো ডক্টরকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দৌড় মারবে। পালানোর জন্যে যেন অস্থির হয়ে উঠেছে সে। সবই এগুলো বোকামির লক্ষণ।

খুলে গেল দরজা। একটা মুহূর্ত ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন আঙ্কেল জ্যাক। তারপর বড় বড় হয়ে গেল চোখ। খুশি খুশি গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে রবিন!

তোরা! কি মনে করে?'

সাদা এলোমেলো চুল, ছড়ানো সাদা দাড়ি, গোলগাল লাল টকটকে হাসিখুশি মুখ, সব মিলিয়ে আঙ্কেল জ্যাককে দেখতে একেবারে সান্তা ক্লজের মত লাগছে। তাঁর চওড়া কাঁধ, বড় বড় হাতের থাবা। মস্ত ভুঁড়ি নেচে ওঠে হাসার সময়।

সব সময় সাদা পোশাক পরেন তিনি। সাদা সোয়েটার, সাদা প্যান্ট, সাদা জুতো। ল্যাবরেটরিতে কাজ করার সময় গায়ে দেন সাদা কোট।

'অ্যাই চেরি,' ভেতরের দিকে তাকিয়ে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে গলা চড়িয়ে হাঁক দিলেন তিনি, 'দেখে যাও কে এসেছে!' গমগমে কণ্ঠস্বর। সরে জায়গা করে দিলেন তিন গোয়েন্দাকে ঢোকার জন্যে।

রান্নাঘর থেকে খাবারের গন্ধ নাকে এসে লাগল। রোস্ট। সম্ভবত মুরগী। চট করে রবিনের দিকে তাকাল মুসা।

'খেতে বসেছিলে?' আঙ্কেলকে জিজ্ঞেস করল রবিন। 'না বসবে?'

'না, শেষ করে ফেলেছি,' আঙ্কেল জ্যাক বললেন। 'তোর আন্টি রান্নাঘরে, এঁটো থালা-বাসন মাজছে। কেন, খিদে পেয়েছে?'

মাথা নাড়ল রবিন, 'না, আমরা খেয়ে এসেছি।'

রান্নাঘরের দরজার দিকে ফিরে আবার হাঁক দিলেন আঙ্কেল জ্যাক, 'চেরি? এই চেরি?' রবিনের দিকে তাকালেন, 'তারপর? হঠাৎ কি মনে করে?'

দ্বিধা করতে লাগল রবিন। 'ইদানীং খুব বোকা হয়ে গেছি আমরা, আঙ্কেল।'

ভুরু কুঁচকালেন আঙ্কেল জ্যাক, 'বোকা হয়ে গেছিস মানে?'

'কি ভাবে বোঝাব ঠিক বুঝতে পারছি না,' কিশোর আর মুসার দিকে তাকাতে লাগল রবিন। শেষে কিশোরকে বলল, 'তুমিই বলো।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর। 'আমরা যে কতখানি বোকা হয়ে গেছি, একটা দিনের ঘটনা বললেই বুঝতে পারবেন...'

তিন

'স্কুল ছুটির পর দেখা কোরো তোমরা আমার সঙ্গে,' ক্লাসে গম্ভীর ভঙ্গিতে আমাদের বললেন ক্লাসটিচার মিস্টার ক্রেগ।

'কিন্তু আমরা তো কিছু করিনি!' অবাক হয়ে প্রতিবাদ জানালাম। জানামতে শাস্তি দেয়ার জন্যেই কেবল স্কুল ছুটির পর কাউকে থাকতে বলেন ক্লাসটিচার।

মিস্টার ক্রেগ শিক্ষক হিসেবে খুব ভাল। ভদ্রলোক। সব ছাত্রছাত্রীরাই তাঁকে পছন্দ করে। আমরাও করি।

দেখা করতে বলেছেন যখন, করতেই হবে।

স্কুল ছুটির ঘণ্টা বাজল। সব ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে গেল। বসে রইলাম কেবল আমি, মুসা আর রবিন।

তিনটে পরীক্ষার খাতা বের করলেন মিস্টার ক্রেগ। মুখ তুলে তাকালেন 'তোমাদের খাতা।'

মাথার চুলে হাত বোলালেন তিনি। চোখের পাতা সরু করে তাকালেন খাতাগুলোর দিকে। তারপর ঘোষণা করলেন, 'এই সেমিস্টারের অংক পরীক্ষায়ও সাংঘাতিক খারাপ করেছ তোমরা। পুরোপুরি ফেল।'

ঢোক গিললাম। রবিন গুঙিয়ে উঠল। আর মুসা চোখ নামিয়ে তাকিয়ে রইল নিজের জুতোর দিকে।

'তিনজনেই এতটা খারাপ করবে কল্পনাই করতে পারিনি,' নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন তিনি। 'এতটা খারাপ তো তোমরা ছিলে না কখনও। কি হয়েছে তোমাদের, বলো তো?'

নির্বাক হয়ে রইল মুসা আর রবিন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'জানি না, স্যার। কিছুই ঢোকে না মাথায়। কিছু বুঝতেও পারি না। অনেক কিছুই মনে থাকে না। অতীতের অনেক কথা মনে করতে পারি না। মনে হয় বিস্মরণ ঘটেছে আমাদের।'

'কিন্তু বিস্মরণের সঙ্গে বোকামির সম্পর্ক কি?'

'জানি না, স্যার,' বিড়বিড় করে বললাম।

বোকার মত মাথা চুলকে যাচ্ছে রবিন।

মুসা কোন কথা বলছে না।

খাতাগুলো আমাদের সামনে নাড়তে নাড়তে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার ক্রেগ, 'অন্য সব কথা থাক। অংকে তোমরা কেন খারাপ করেছ, সেটা বরং পর্যালোচনা করে দেখি।' খাতাগুলো ডেস্কে নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'তোমাদেরকে যে রিভিউ শীটগুলো দিয়েছিলাম, পড়েছ ওগুলো?'

'পড়েছি, স্যার,' একসঙ্গে জবাব দিলাম তিনজনে।

'বহুত মাথা ঘামিয়েছি এ নিয়ে,' রবিন বলল।

'কিন্তু এত কঠিন,' যোগ করল মুসা, 'কিছুই বুঝতে পারিনি।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন মিস্টার ক্রেগ। 'তোমাদের যে কিছু হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই আমার। সাহায্য দরকার? প্রয়োজন মনে করলে আমি তোমাদের সাহায্য করতে পারি। কি করতে পারি, বলো?'

'কি জানি, তা-ও তো বুঝতে পারছি না, স্যার,' মাথা চুলকানো বেড়ে গেল রবিনের।

'আসলে, অংক আমাদের মাথায় ঢোকে না, স্যার,' আমি জবাব দিলাম। 'অংক একেবারেই বুঝি না।'

'তুমি অংক বোঝো না এ কথা বিশ্বাস করতে বলো আমাকে?' ভুরু কুঁচকে বললেন মিস্টার ক্রেগ। 'আসলে পড়ালেখা বাদ দিয়ে নিশ্চয় গোয়েন্দাগিরি নিয়ে বেশি বেশি মেতে উঠেছ। পড়াশোনায় পুরো ফাঁকি দিচ্ছ।...যাকগে, যা হবার হয়েছে। এবারকার মত ছেড়ে দিলাম। এখন থেকে লেখাপড়ায় ভালমত মনোযোগ দেবে। কি, বুঝেছ?'

'বুঝেছি, স্যার,' মিস্টার ক্রেগকে এ ভাবে রেগে যেতে দেখে অবাক হলাম খুব।

কয়েক মিনিট পর স্কুল থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিলাম তিনজনে।

গরমকাল। অথচ প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া বইছে। রাস্তার মোড় পেরিয়ে এসে হাসাহাসি হই-চই কানে এল। টেরি আর তার দুই দোস্ত টাকি ও কড়ি খেলছে। আমাদের দেখে ফিরে তাকিয়ে টিটকারি দিতে শুরু করল ওরা। ইদানীং ওরাও আমাদের চেয়ে ভাল রেজাল্ট করে।

'এতটা বোকা কি করে হয়ে গেলাম আমরা?' বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে আপনমনেই বিড়বিড় করল রবিন।

ফিরে তাকাল মুসা, 'মাথার মধ্যে কিচ্ছু নেই আমাদের। মাঝে মাঝে এতই মন খারাপ হয়ে যায়, ইচ্ছে করে যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাই।'

কিশোর থামলে রবিন বলল, 'এবার আমার কথা শোনো...'

কিশোর যেদিনকার কথা বলল, সেদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে হলঘরে ঢুকতেই দেখা হয়ে গেল রিনিতার সঙ্গে।

রিনিতা আমার ছোট। আমার খালাত বোন। আমাদের বাড়িতে থাকতে এসেছে। ওর মা মারা গেছেন ক্যান্সারে। বাবা একসঙ্গে নিজের কাজকর্ম আর মেয়ের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেছেন। শেষে মা'কে অনুরোধ করেছেন মেয়েটাকে কিছুদিন দেখাশোনা করার জন্যে। একটু গুছিয়ে নিয়েই আবার তিনি মেয়েকে নিয়ে যাবেন।

রিনিতাকে নিয়ে এসেছে মা। স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে।

কার্পেটে পা ছড়িয়ে বসে খেলছে রিনিতা। হাতের কাছে, আশেপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে নানা রঙের অসংখ্য প্লাস্টিকের টুকরো। আমার দিকে তাকিয়ে মাতব্বরি চালে ভুরু নাচাল। 'এত দেরি কেন?'

রিনিতা আমাকে সব সময় খোঁচায়। নানা ভাবে যন্ত্রণা দেয়। একটা কথা বলতে পারি না। বললেই গিয়ে দশখান করে বানিয়ে বানিয়ে মা'র কাছে বিচার দেয়। মা'ও রিনিতার পক্ষ নিয়ে আমাকেই বকে। রাগে গা জ্বলে। মনে মনে ভাবি, "এই বিচ্ছু মেয়েটাকে বাড়িতে নিয়ে আসাটাই হয়ে গেছে এক মস্ত ভুল।'

যাই হোক, রিনিতার প্রশ্ন শুনে আগে হলে হয়তো রেগে উঠতাম। জবাব দিতাম, 'সেটা জেনে তোমার কি লাভ? নিজের চরকায় তেল দাও।' কিন্তু ইদানীং বোকা হয়ে যাওয়ার পর কেমন মানসিক ভাবেই দুর্বল হয়ে পড়েছি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিনমিন করে জবাব দিলাম, 'স্কুলের পরেও থাকতে হয়েছে।'

'কেন? ফেলটেল করেছ নাকি? ঠাসানি দিয়েছে টিচার?'

প্রশ্নটা এড়ানোর জন্যে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি করছ?'

'হাঁদা নাকি?' মুখ ঝামটা দিল রিনিতা। 'দেখছ না খেলছি? প্লাস্টিকের টুকরোগুলো দিয়ে প্রথমে একটা ঘর বানাব। বাস স্টেশন। তারপর একটা বাস।

স্টেশনের সামনে রাখব। কিন্তু দেখো না, ঠিকমত জোড়াই লাগাতে পারছি না। মায়ার জন্যে অপেক্ষা করছি। ও এলে একটা ব্যবস্থা হবেই।'

'দেখি, আমাকে দাও তো।'

'দূর,' আমার হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিল রিনিতা, 'তুমি কি লাগাবে? তুমি তো একটা হাঁদা। কালকে মনে নেই, সাধারণ একটা বাক্স বানাতে দিলাম, তাই পারলে না। স্কুলে এত দেরি করলে কেন? পড়া পারোনি বলে টিচার আটকে নাকি?'

ঘাবড়ে গেলাম। কোন প্রসঙ্গই সহজে ভোলে না রিনিতা। ওর এ সব কথা মা'র কানে গেলে জিজ্ঞেস করতে আসবে। তখন পড়ব আরও বিপদে।

'থাক থাক, সাহায্য করতে চেয়েছিলাম, ভাল লাগল না,' রিনিতাকে বলে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম সেখান থেকে।

চার

রবিন থামলে মুসার দিকে তাকালেন আঙ্কেল জ্যাক। 'এবার তোমার কোনও ঘটনার কথা বলো।'

হাত ওল্টাল মুসা। 'কি আর বলব? আমারগুলোও ওদের চেয়ে ভাল কিছু না।'

'তারমানে তুমি কিছু বলতে চাও না?'

মাথা নাড়ল মুসা। শুধু একটা কথাই বলি, 'এ ভাবে মাঝে মাঝেই বিপদে পড়তে হয়, অপদস্থ হতে হয় আমাদের তিনজনকে।'

'হুঁ,' গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন আঙ্কেল জ্যাক। চেয়ারে বসে সামনের দিকে ঝুঁকলেন। এক এক করে তাকালেন রবিন, কিশোর ও মুসার দিকে। 'তাহলে তোমাদের ধারণা তোমরা বোকা হয়ে গেছ?'

'কোন সন্দেহ নেই আর তাতে,' এক আঙুল দিয়ে গাল চুলকাল কিশোর।

বিস্কুট আর দুধ এনে সামনে রেখে গেছেন চেরি আন্টি। কিন্তু ছুঁয়েও দেখল না কিশোর কিংবা রবিন। এমনকি মুসাও খাবারের দিকে একবার তাকিয়ে সেই যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, আর তাকাচ্ছে না। বোকা হয়ে যাওয়াতে খাবারের লোভও যেন চলে গেছে তার। চেয়ারে পিঠ খাড়া করে শক্ত হয়ে বসে আছে তিনজনে। কোলের ওপর হাত রেখে।

'আসলে হয়তো বোকা নই আমরা,' কিশোর বলল। 'কিন্তু চালাকও নই। মাথায় ঘিলু বলতে কিচ্ছু নেই আমাদের।'

'বোকা নই মানেটা কি?' রবিন বলল। 'বোকাই আমরা।'

'একেকটা রামছাগল,' মুসা বলল। 'গাধা। চেহারাটা গাধার মত হলে সারাক্ষণ ব্যা-ব্যাই করতাম।'

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলেন আঙ্কেল জ্যাক। চোখের পাতা সরু করে

চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকালেন ওদের দিকে। 'আমাকে কি করতে বলো?'

'ইয়ে...' বলতে গিয়ে চুপ হয়ে গেল কিশোর। দ্বিধা করতে লাগল।

শেষে রবিন বলল, 'তুমি একজন বুদ্ধিমান লোক, তাই না আঙ্কেল? তুমি একজন বিজ্ঞানী।'

মাথা ঝাঁকালেন আঙ্কেল জ্যাক।

'আর বিজ্ঞানীদের সারাক্ষণই মাথা খাটানোর কাজ করতে হয়, ঠিক?'

আবার মাথা ঝাঁকালেন আঙ্কেল জ্যাক।

'এবং তুমি একজন ব্রেন স্পেশালিস্ট, তাই তো?' আবার প্রশ্ন করল রবিন।

তৃতীয়বার মাথা ঝাঁকালেন আঙ্কেল জ্যাক।

'সেজন্যেই এসেছি আপনার কাছে,' এতক্ষণে যেন কথা খুঁজে পেল কিশোর। 'কারণ আপনিই আমাদের বুদ্ধিমান বানানোর একটা উপায় বের করতে পারবেন।'

'আঙ্কেল,' অনুরোধের সুরে বলল রবিন, 'সত্যিই কি আমাদের জন্যে তুমি কিছু করতে পারো না? বুদ্ধি খানিকটা বাড়িয়ে দিতে পারো না আমাদের?'

চিবুক ডললেন আঙ্কেল জ্যাক। সোজা হলেন চেয়ারে।

'হ্যাঁ,' অবশেষে জবাব দিলেন তিনি, 'পারি। এমন একটা ওষুধ আমি দিতে পারি, যেটাতে মনে হচ্ছে কাজ হবে।'

'কি ওষুধ?' একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল তিন গোয়েন্দা।

পাঁচ

আবার সামনে ঝুঁকলেন আঙ্কেল জ্যাক। জবাব দিতে গিয়ে হঠাৎ ঘুরে তাকালেন রান্নাঘরের দরজার দিকে।

'কি হলো, আঙ্কেল?' জানতে চাইল রবিন।

আবার ওদের দিকে ঘুরলেন তিনি। 'শুনলে না? মনে হয় চেরি।' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন তিনি। 'অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন আমাদের ওপর নজর রেখেছে কেউ।'

দরজার দিকে তাকাল কিশোর। রবিন আর মুসার চোখও ঘুরে গেল সেদিকে। অস্বাভাবিক কোন কিছু চোখে পড়ল না।

'কই?' কিশোর বলল। 'দেখছি না তো কিছু।'

কাঁধ ঝাঁকালেন আঙ্কেল জ্যাক। 'টপ সিক্রেট কোন কাজ করার সময় সব বিজ্ঞানীরই বোধহয় এ রকম অনুভূতি হয়।' সাদা সোয়েটশার্টের আস্তিন টেনে নামালেন তিনি। গভীর ভাবে ভাবছেন মনে হচ্ছে কোন বিষয় নিয়ে।

'আঙ্কেল,' অস্থির হয়ে উঠল রবিন, 'তোমার কি মনে হয় আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে?'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে রইলেন আঙ্কেল জ্যাক। তারপর জবাব দিলেন,

'অ্যাঁ!…হ্যাঁ, পারব।'

উত্তেজিত ভঙ্গিতে চেয়ারের হাতলে চাপড় মারল মুসা। 'সত্যি বলছেন? সত্যি পারবেন?'

মাথা ঝাঁকালেন আঙ্কেল জ্যাক। 'হ্যাঁ। এ মুহূর্তে আমি অবশ্য এ ধরনেরই একটা জরুরী গবেষণায় ব্যস্ত। জিনিসটা তোমাদের ওপর প্রয়োগ করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু…'

'কিন্তু কি?' আগ্রহে সামনে ঝুঁকে এল মুসা।

আবার রান্নাঘরের দরজার দিকে তাকালেন আঙ্কেল জ্যাক। 'জিনিসটা ভীষণ বিপজ্জনক।'

ঘন ঘন চোখের পাতা পিটপিট করল কিশোর।

অস্ফুট শব্দ করে উঠল রবিন।

ঢোক গিলল মুসা। 'তাহলে?'

'বিপজ্জনক হবে কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না,' আবার বললেন আঙ্কেল জ্যাক। 'তবে হতেও পারে।'

'হোক বিপজ্জনক,' কিশোর বলল। 'কাজ হবে তো?'

মাথা দোলালেন আঙ্কেল জ্যাক, 'হ্যাঁ, তা হবে। কাজ হতে বাধ্য। আমি টেস্ট করেছি। টেস্ট করা না থাকলে তোমাদের ওপর প্রয়োগ করতে যেতাম না মরে গেলেও।'

'তাহলে…তাহলে প্রয়োগ করে দেখো না আমাদের ওপর,' অধৈর্য হয়ে উঠল রবিন।

'হ্যাঁ, করুন না, অসুবিধে নেই,' কিশোর বলল। মুসাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি বলো?'

'আমিও রাজি,' মুসা বলল।

ভ্রূকুটি করলেন আঙ্কেল জ্যাক। আবার একবার হারিয়ে গেলেন গভীর চিন্তায়।

তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে আচমকা ওদেরকে চমকে দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'বেশ। তাই করব। তোমাদের ওপর প্রয়োগ করব ওই ওষুধ। দেখা যাক, আমার গবেষণা কতখানি সফল হয়।'

ছয়

ওদেরকে লিভিং রুমে বসিয়ে রেখে উঠে গেলেন আঙ্কেল জ্যাক। নিজের মনে গুনগুন করতে করতে ঢুকে গেলেন গবেষণাগারের মধ্যে। কয়েক মিনিট পর গুনগুন করতে করতেই গিয়ে ঢুকলেন রান্নাঘরে।

রান্নাঘরের টেবিলে বসে মুদী দোকানের ফর্দ করছেন চেরি আন্টি। মুখ তুলে তাকালেন। সুন্দরী, মাথায় সোনালি চুল, মোলায়েম বাদামী চোখ, মুখে আন্তরিক

হাসি। 'কি ব্যাপার, জ্যাক? বাচ্চাগুলোর সঙ্গে তোমার টপ সিক্রেট ব্যক্তিগত আলোচনা শেষ হলো? ওদের সঙ্গে কথা বলতে যেতে পারি এখন?'

আন্টিকে বসে থাকতে ইশারা করলেন আঙ্কেল জ্যাক। আনমনে বিড়বিড় করলেন, 'বেচারারা!'

আলমারি খুলে শিশি-বোতল আর বয়াম ঘাঁটতে শুরু করলেন তিনি।

পাশে এসে দাঁড়ালেন চেরি আন্টি। 'কি হয়েছে? ওদেরকে এত বিমর্ষ দেখলাম কেন? কি বলতে এসেছে তোমাকে?'

যা খুঁজছিলেন পেয়ে গিয়ে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠলেন আঙ্কেল জ্যাক। আঙুরের রস ভর্তি একটা ছোট বোতল বের করলেন।

স্ত্রীর দিকে ঘুরলেন তিনি। 'রবিন আর তার দুই বন্ধুর কি করে যেন মগজে গেঁথে গেছে ওরা বোকা হয়ে গেছে।'

আঙুরের রসের বোতল থেকে চোখ সরিয়ে স্বামীর দিকে তাকালেন চেরি আন্টি। 'বুঝলাম না। বোকা হয়ে গেছে মানে?'

'বোকা হয়ে গেছে মানে বোকা হয়ে গেছে।' বোতলটার দিকে তাকিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকালেন আঙ্কেল জ্যাক। 'বড় মুষড়ে পড়েছে বেচারারা। ওরা আমার কাছে এসেছে এমন কোন ওষুধ আছে কিনা জানতে যেটা ওদের বুদ্ধিমান বানিয়ে দিতে পারে।'

হাঁ হয়ে ঝুলে পড়ল চেরি আন্টির নিচের চোয়াল। 'ওদেরকে কী বলেছ তুমি? বলেছ তো ওরা ঠিকই আছে, অকারণ দুশ্চিন্তা করে করে...'

ঠোঁটে আঙুল রেখে আন্টিকে চুপ থাকতে ইশারা করলেন আঙ্কেল জ্যাক। ফিসফিস করে বললেন, 'শুকনো কথায় আত্মবিশ্বাস তৈরি হবে না ওদের। কোন কারণে আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে—এটাই হলো ওদের সমস্যা। নিজেদের ওপরই আর কোন আস্থা নেই ওদের।'

'কি করবে তাহলে?' জিজ্ঞেস করলেন চেরি আন্টি।

'এই যে, ওষুধ দিচ্ছি,' জবাব দিলেন আঙ্কেল জ্যাক। 'ল্যাবরেটরি থেকে কম্পিউটারে একটা লেবেল প্রিন্ট করে এনেছি।'

বোতলটা কাউন্টারে রাখলেন আঙ্কেল জ্যাক। লেবেলটা বের করে দেখালেন আন্টিকে। তাতে লেখা: **বুদ্ধি বাড়ানোর টনিক।**

লেখাটার দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করলেন চেরি আন্টি, 'এ রকম কোন ওষুধের কথা তো জন্মেও শুনিনি!'

দরাজ হাসি ছড়িয়ে পড়ল আঙ্কেলের মুখে। 'আমিও শুনিনি। তবে ওদের আমি বলব এটা আমার নিজের আবিষ্কৃত ওষুধ, বুদ্ধি বাড়ায়। ওদের বিশ্বাস জন্মানোটাই হলো আসল কথা। ওষুধে কাজ করছে এটা ভাবতে আরম্ভ করলেই আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন চেরি আন্টি। 'দেখো কাজ হয় কিনা।'

তাড়াহুড়া করে লিভিং রুমের দিকে চলে গেলেন তিনি। ছেলেদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে।

বোতলের দিকে মনোযোগ দিলেন তিনি। সুন্দর করে লেবেলটা লাগিয়ে দিলেন বোতলের গায়ে। তারপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভালমত দেখলেন 'আঙুরের রস' লেখা আসল লেবেলটা কোনখান দিয়ে দেখা যায় কিনা।

'হয়েছে,' সন্তুষ্ট হয়ে নিজেই ঘোষণা দিয়ে জানালেন নিজেকে। 'চমৎকার। পুরানো লেবেলটা দেখা যায় না। এটাকে মগজ উন্নত করার কিংবা বুদ্ধি বাড়ানোর ওষুধ ভাবতে আর আপত্তি কোথায়?'

ভাগ্যিস, বুদ্ধিটা এসেছিল মাথায়। আপনমনে হাসলেন আঙ্কেল জ্যাক। বোতলটা হাতে নিয়ে রওনা দিলেন লিভিং রুমের দিকে।

এই সময় টেলিফোন বাজল। ফোনটা রয়েছে ল্যাবরেটরিতে। হলের শেষ মাথার ঘরটা ল্যাবরেটরি।

কাউন্টারে বোতলটা রেখে ছুটলেন ফোন ধরার জন্যে।

এই সুযোগে লুকানোর জায়গা থেকে বেরিয়ে এল মাজুল আর গাজুল।

ল্যাবরেটরির দরজার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল গাজুল, 'এটাই আমাদের সুযোগ।'

'কি করবে?' লিভিং রুমের দরজার দিকে তাকাতে তাকাতে জিজ্ঞেস করল মাজুল।

'দেখোই না কি করি।'

বোতলটা তুলে নিয়ে মুখটা খুলে ফেলল গাজুল।

'কি করছ?' জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে মাজুল।

'আহ, চুপ থাকো না! ওরা শুনতে পেলে দৌড়ে আসবে দেখার জন্যে। আমার প্ল্যানটাই তখন বাতিল। গোলাম বানানোর জন্যে আর ধরে নিয়ে যাওয়া যাবে না ছেলেগুলোকে।'

আর কিছু না বলে চুপচাপ তাকিয়ে রইল মাজুল।

বোতলটাকে কাত করে সমস্ত রস সিংকে ফেলে দিল গাজুল। কোমরে ঝোলানো একটা ব্যাগ থেকে আরেকটা বোতল বের করল। সেটা থেকে পানির মত রঙহীন তরল পদার্থ ঢালল প্রথম বোতলটায়। ছোট ছোট নানা রঙের শিশিও আছে ব্যাগটাতে। আঙুরের রসটা যে রঙের ছিল, সে-রকম রঙ মিশিয়ে দিল বোতলের তরল পদার্থে। দেখতে অবিকল আঙ্কেল জ্যাকের রেখে যাওয়া আঙুরের রসের মতই রঙ হয়ে গেল জিনিসটার।

সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল গাজুল। 'কিছু বুঝলে? আমাদের ল্যাবরেটরিতে তৈরি করা মগজ উন্নত করার সত্যিকারের ওষুধ মিশিয়ে দিলাম। মগজশক্তি রসায়ন মানুষের ব্রেনের ওপর কতখানি কাজ করবে জানি না। তবে আশা করি বোকা ছেলেগুলোর এবার খানিকটা হলেও বুদ্ধি বাড়বে। আর তা হলেই হয়ে গেল আমাদের কাজ।'

লেবেল লাগানো আঙুরের রসের বোতলটার মুখ লাগিয়ে আবার আগের জায়গায় রেখে দিল গাজুল।

ল্যাবরেটরির দিক থেকে পায়ের শব্দ শোনা গেল।

‘জলদি!’ তাড়া দিল গাজুল। ‘আলমারির পেছনে!’

বোতলটার দিকে তাকিয়ে আছে মাজুল। ‘কোন মানুষকে কখনও এ ফরমুলা খাওয়ানো হয়নি। কি ঘটবে কে জানে! যদি রিঅ্যাকশন হয়? মগজের ওষুধ, বলা যায় না, পাগলও তো হয়ে যেতে পারে। মরে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।’

সঙ্গীর কাঁধে জোরে এক ঠেলা মেরে আলমারির দিকে ঘুরিয়ে দিল গাজুল। ‘মারা গেলে আর কি করব। গবেষণা করতে গেলে এ রকম দু’চারজন মারা যেতেই পারে। দেখা যাক কি হয়…চলো চলো…’

সাত

রান্নাঘরে ফিরে এলেন আঙ্কেল জ্যাক।

বোতলটা তুলে নিয়ে লিভিং রুমের দিকে এগোলেন তিনি। কানে আসছে চেরি আন্টি আর ছেলেদের কথাবার্তা, হাসাহাসির শব্দ।

দরজার কাছে এসে এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন তিনি। তারপর মুচকি হেসে ঢুকে পড়লেন ঘরের মধ্যে। বোতলটা তুলে দেখালেন ছেলেদের। ‘এই যে, তোমাদের ওষুধ।’

বোতলটা প্রথমে কিশোরের হাতে দিলেন তিনি।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল কিশোর। চোখের পাতা সরু হয়ে এল। সন্দেহ ফুটল তাতে। ‘বুদ্ধি বাড়ানোর ওষুধ?’

মুখভঙ্গি নির্বিকার করে রেখে মাথা ঝাঁকালেন আঙ্কেল জ্যাক। ‘হ্যাঁ, আমার নিজের ফরমুলা। বহু বছর ধরে এর ওপর গবেষণা করেছি আমি।’

চেরি আন্টির পাশে কাউচে বসে পড়লেন তিনি। ‘জিনিসটা কি ভাবে কাজ করে ব্যাখ্যা করে বোঝানো খুব কঠিন। বুদ্ধিমান মানুষদেরই সহজে মাথায় ঢুকতে চাইবে না, আর তোমরা তো বোকাই হয়ে গেছ। তবু বলি, এটা হলো নিউরন আর প্রোটনের ব্যাপার-স্যাপার। তার যুক্ত হয়েছে মগজে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহের নিয়ম-কানুন…’

অত কঠিন কঠিন কথা শুনতে গিয়ে মাথা ঘুরে যাবার জোগাড় হলো মুসার। বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘কা-কা-ক্কাজ হবে তো?’

ভয়ে ভয়ে বলল রবিন, ‘মগজ বদলে দেবে?’ কিশোরের হাতের বোতলটার দিকে তাকাল সে।

‘না, তা বদলাবে না,’ আশ্বস্ত করলেন আঙ্কেল জ্যাক। আড়চোখে পরস্পরের দিকে তাকালেন তিনি আর চেরি আন্টি। আবার ছেলেদের দিকে ফিরলেন আঙ্কেল জ্যাক। ‘সোজা করে বলতে গেলে তোমাদের মগজের বুদ্ধি চলাচলের রাস্তার মধ্যে যে প্রতিবন্ধকতাগুলো সৃষ্টি হয়েছে, যার জন্যে বোকা হয়ে গেছ তোমরা, সেটা দূর

করতে সাহায্য করবে এই ওষুধ। তোমাদের মগজের মহাসড়কটা খুলে দেয়ার ব্যবস্থা করেছি আমি। মগজে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহকে আরও খোলাখুলি ভাবে প্রবাহিত করতেও সাহায্য করবে এই ওষুধ।'

এত বড় জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার পরেও সন্দেহ যেতে চাইল না কিশোরের। বোতলটার দিকে তাকাল আবার। 'তো কি করব আমরা এখন? কতটা করে ওষুধ খেতে হবে?'

'পুরোটাই,' আঙ্কেল জ্যাক বললেন। 'তিন দাগ ওষুধ আছে এখানে। সমান সমান তিন ভাগ করে খেয়ে ফেলবে আজ রাতে।'

'তারপর?' রবিনের প্রশ্ন।

'তারপর, স্রেফ ভুলে যাবে এটার কথা। মনে করারও আর প্রয়োজন নেই। জোর করে চালাক হওয়ার চেষ্টা কোরো না। সব কিছু ভুলে গিয়ে পড়ালেখায় মন দেবে। কোন কাজকেই অবহেলা করবে না। যত বেশি পরিশ্রম করবে, যত বেশি মনোযোগী হবে, তত দ্রুত বুদ্ধি খুলতে থাকবে তোমাদের।'

তাঁর গোল লাল টকটকে মুখে কোমল হাসি ছড়িয়ে পড়ল। 'তারপর দেখো কি ঘটে। আমার বিশ্বাস, তোমাদের মনের কষ্ট দূর হবে।'

'সত্যিই বুদ্ধিমান হব তো?' সন্দেহ যাচ্ছে না কিশোরের।

'হবে হবে...'

বাইরে গাড়ির হর্নের শব্দ হলো। দু'বার খাটো, একবার লম্বা।

'ওই যে, বোধহয় হ্যারি এল। আমার সহযোগী বিজ্ঞানী।' উঠে দাঁড়ালেন আঙ্কেল জ্যাক। 'জরুরী মীটিং আছে তার সঙ্গে।'

'ঠিক আছে, আমরা তাহলে যাই,' বোতলটা হাতে নিয়ে কিশোরও উঠে দাঁড়াল। 'রবিন, যাবে না?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, যাব তো বটেই।'

'কি হয় জানিও,' আঙ্কেল জ্যাক বললেন। 'আরেকটা কথা, এটা আমার অতি গোপন একটা আবিষ্কার। কাউকে বোলো না।'

বলবে না কথা দিয়ে, আঙ্কেল আর আন্টি দু'জনকেই ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল ওরা।

বোতলটা কোটের পকেটে ভরে রাখল কিশোর।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবে?'

'চলো, আগে আমাদের বাড়িতেই যাই। দেরি না করে ওষুধটা খেয়ে ফেলি। তারপর তোমাদের যেখানে ইচ্ছে যেও।'

কিশোরদের বাড়িতে ঢুকে সোজা মুসা আর রবিনকে নিজের ঘরে নিয়ে এল কিশোর। ওদেরকে ওখানে বসিয়ে রেখে নিচতলায় গিয়ে উঁকি মেরে দেখে এল মেরিচাচী কোথায়।

তিনি ওখানে নেই। তারমানে তাঁর অফিসে। কাজে ব্যস্ত। ইয়ার্ডের কর্মচারী বোরিস আর রোভার গেছে রাশেদ পাশার সঙ্গে পুরানো মাল কিনতে।

দ্রুত তিনটে গ্লাস তুলে নিয়ে আবার ওপরতলায় উঠে এল সে। টেবিলে রাখল

ওগুলো। সমান তিন ভাগে ভাগ করল ওষুধটাকে।

'সত্যি সত্যি কাজ হবে তো?' হালকা লালচে রঙের তরল পদার্থটার দিকে তাকিয়ে থেকে ফিসফিস করে বলল মুসা। 'আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না।'

নিজের গ্লাসটা তুলে নিল রবিন। 'আঙ্কেল জ্যাকের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারো। অসম্ভব বুদ্ধিমান। আমাদের সঙ্গে মিথ্যে বলবেন না।'

হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। 'কাণ্ডটা কি হবে ভাবো তো? বুদ্ধিমান হয়ে যাব আমরা। আর আমাদেরকে বোকা বলার সাহস পাবে না কেউ। কি সাংঘাতিক ব্যাপারই না হবে।'

'হ্যাঁ, সাংঘাতিক,' রবিন একমত হলো তার সঙ্গে।

একসঙ্গে গ্লাস তুলল ওরা। গ্লাসে গ্লাসে টোকা লাগিয়ে টোস্ট করল বড়দের মত করে।

উজ্জ্বল আলোয় ঝিক করে উঠল রঙিন তরল।

'খেতে কেমন লাগবে আল্লাহ্ই জানে,' দ্বিধা করছে কিশোর।

'যেমনই লাগে খেয়ে ফেলা যাক,' রবিন বলল। 'যত দেরি করব, ততই ভয় বাড়বে।'

একসঙ্গে ঠোঁট লাগিয়ে গ্লাসে চুমুক দিল তিনজনে। ইঞ্চিখানেক ওষুধ থাকতেই গ্লাসটা নামিয়ে রাখল মুসা। 'বিচ্ছিরি স্বাদ! আর এত ঘন!'

'খেয়ে ফেলো, মুসা, খেয়ে ফেলো,' কিশোর বলল। 'কাজে লেগেও যেতে পারে।'

'বোকা থাকা চলবে না আমাদের,' যোগ করল রবিন।

আবার গ্লাস ঠোঁটে ঠেকাল ওরা। কোনমতে মুখে ঢেলে গিলে ফেলল। গ্লাসগুলো নামিয়ে রাখল।

ঠোঁটে লেগে থাকা ওষুধ চেটে মুসা বলল, 'জঘন্য! এত ভয়াবহ স্বাদের জিনিস জীবনে মুখে দিইনি।'

'হুঁ। মিকশ্চারও অত খারাপ না,' কিশোর বলল। 'দুনিয়ার সবচেয়ে বাজে স্বাদের ওষুধ।' কয়েকবার ঢোক গিলে স্বাদটা জিভ থেকে নামিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল সে। ওয়াক ওয়াক করল। 'মনে হচ্ছে বেরিয়ে চলে আসবে।' মুসার দিকে তাকাল। 'চিউয়িং গাম আছে নাকি?'

পকেটে হাত দিল মুসা।

'কি, চালাক চালাক লাগছে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'উঁম!...মনে তো হচ্ছে,' জবাব দিল কিশোর।

'রাইনসরাস বানান করো তো।'

'উঁ?'

'রাইনসরাস। করো। বানান করো।'

দ্বিধা করতে লাগল কিশোর। ভাবছে। তারপর বলল, 'আর-আই-এন-ও...'

'থামো থামো,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল রবিন। 'কাজ করছে না ওষুধ।'

'এত দ্রুত নিশ্চয় কাজ করে না এই ওষুধ,' মুসা বলল। 'সময় দিতে হবে। ওই যে আঙ্কেল বললেন, চিন্তার রাস্তার প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে হবে...নিশ্চয় অতিরিক্ত ময়লা পড়ে গেছে। সাফ হতে সময় লাগবে।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। 'তা লাগুক। বুধবারের মধ্যে হয়ে গেলেই বাঁচি।'

'কেন? বুধবার কেন?'

'ভুলে গেছ, বুধবারে অংক পরীক্ষা?'

হাই তুলতে শুরু করল কিশোর। 'হঠাৎ করেই ঘুম পাচ্ছে আমার।'

'আমারও,' রবিন বলল।

'আমি তো চোখই টেনে খুলে রাখতে পারছি না,' টেবিলের ওপরই মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তে চাইল মুসা। 'বাড়ি যাওয়া এখন আমার পক্ষে দুঃসাধ্য!'

'থাক, যাওয়ার দরকার নেই,' কিশোর বলল। 'রাতে আমাদের এখানেই থেকে যাও। বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দাও রাতে ফিরবে না।'

ঘুমজড়িত স্বরে মুসা জবাব দিল, 'আমার ফোন করার ক্ষমতাও নেই।'

আট

পা টিপে টিপে ওপরতলায় উঠল মাজুল আর গাজুল।

না দেখে কিসে যেন পা বেধে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল মাজুল।

চাপা গলায় ধমকে উঠল গাজুল, 'আহ, আস্তে! দেখে হাঁটো! সারা বাড়ির লোক সব জাগিয়ে দেবে দেখছি।'

মাজুল বলল, 'এখানে কেন এলে, এখনও বলোনি কিন্তু।'

'মগজশক্তি রসায়ন তোমারও খাওয়া উচিত,' বিরক্তকণ্ঠে বলল গাজুল। 'আরে গাধা, এখানে এসেছি শিওর হতে, ওষুধটা খেল কিনা ছেলেগুলো, ওষুধে কাজ হলো কিনা দেখতে।'

ভারী পায়ে অন্ধকার হল ধরে হেঁটে চলল দু'জনে। কিশোরের শোবার ঘরের সামনে এসে থামল। উঁকি দিল ভেতরে।

'ওই যে একটা ছেলে,' ফিসফিস করে বলল গাজুল।

'বাকি দুটো কোথায়? এ বাড়িতেই তো ঢুকতে দেখলাম। আর বেরোয়নি।'

'আছে অন্য কোন ঘরে। গেস্টরুমে।'

নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল দু'জনে। টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। তিনটে গ্লাস পড়ে আছে। সব ক'টাতেই লালচে ওষুধের তলানি।

একটা গ্লাস তুলে নিয়ে শুঁকে দেখল গাজুল। হাসি ফুটল মুখে। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, খেয়েছে। তিনটে খালি গ্লাস। তিনজনেই খেয়েছে।'

ফিরে তাকিয়ে দেখল বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মাজুল।

কিশোরের মুখের কাছে ঝুঁকে দেখতে লাগল।

দেখতে দেখতে কুঁচকে গেল তার ভুরু।
হাত নেড়ে ডাকল, 'গাজুল, এদিকে এসো তো!'
'কি হলো?'
'দেখো তো মরেটরে গেল নাকি!'
শঙ্কিত হয়ে উঠল গাজুল। তাড়াতাড়ি বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল। কিশোরের নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখল। ফিরে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বলল, 'উহ, পিলে চমকে দিয়েছিলে! তোমাকে গাধা কি আর সাধে বলি। দিব্যি তো নিঃশ্বাস পড়ছে।'
লজ্জিত ভঙ্গিতে মাথা চুলকাল মাজুল। 'নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখার কথা মনেই হয়নি।'
'তা তো হবেই না। হয় তোমাকেও ওষুধ খাওয়ানো দরকার, নয়তো বাড়ি ফিরে ওঅর্কশপে গিয়ে মগজটা খুলে দেখা দরকার কোথায় কি গোলমাল হলো। তোমার এ সব বোকামির কথা মনিব শুনলে হয়তো তোমাকে বিকল বানিয়েই ফেলে রাখবে। কিংবা হাওয়া করে দেবে।'
ভয় দেখা দিল মাজুলের চোখে। 'না-না-না, দোহাই তোমার, বসকে বোলো না, প্লীজ! তুমি না আমার বন্ধু।'
'হুঁ। এখন থেকে মাথাটা খেলানোর চেষ্টা করবে।'
'করব। করব।'
'চলো, বেরিয়ে যাই,' গাজুল বলল। 'দেখা তো হলো।'
'বাকি ছেলে দুটোকে দেখবে না?'
'না, দরকার নেই। তিনটে গ্লাসে ওষুধ, তারমানে তিনজনেই খেয়েছে। আর এই ছেলেটা যখন ভাল আছে, বাকি তিনটেও থাকবে, সন্দেহ নেই তাতে।'

'কিশোর! এই কিশোর! কিশোর!'
ডাক শুনে চোখ মেলল কিশোর। দেখল জানালার পর্দা সরিয়ে দিচ্ছেন মেরিচাচী। রোদ এসে পড়েছে ঘরে।
'ওঠ, ওঠ। আর কত ঘুমাবি? স্কুলে যাবি না?' হাসলেন চাচী। হাসিটা সকালের সোনালি রোদের মতই উজ্জ্বল।
উঠে বসল কিশোর। মুখের কাছে হাত নিয়ে এসে দীর্ঘ হাই তুলল। ঘুমটা যেতে চাইছে না চোখ থেকে। হিংসে হলো চাচীর ওপর। রোজ সকালে এত হাসিখুশি থাকেন কি করে চাচী। তার মনে হতে লাগল ওরকম মেজাজে থাকতে হলে মগজ ভরা বুদ্ধি থাকা দরকার। যার যে জিনিসটার ঘাটতি থাকে সব সময় সেটা নিয়েই মাথা ঘামায় মানুষ।

স্কুল বাসে ওঠার পর অন্য দিনের তুলনায় পরিস্থিতির বিশেষ কোন উন্নতি হলো না ওদের বেলায়। সামনের দিকের একটা সীটে জানালার কাছে বসল কিশোর। জায়গা না পেয়ে মুসা আর রবিন চলে গেল পেছনের দিকে।
ব্যাগটা কোলের ওপর রেখে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল কিশোর। দিনটা

মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আছে। ধূসর, মেঘে ঢাকা ভারী আকাশ। বৃষ্টির সম্ভাবনা। গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের মাথায় হালকা কুয়াশা।

ফিরে তাকাল সে। পাশের সীটে বসেছে শারিয়া আর রয়। ওদের ক্লাসের দু'জন সবচেয়ে ভাল ছাত্র। নিজের অজান্তেই গুটিয়ে উঠল সে। 'দা নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার ক্রসওয়ার্ড পাজল নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে ওরা।

ভাল ছাত্র বলে দু'জনের খুব অহঙ্কার। প্রতিটি সূত্র এত জোরে জোরে বলছে, যাতে বাসের সবাই শুনতে পায়। বুঝতে পারে ওরা টাইমসের ক্রসওয়ার্ড পাজলের মত জটিল জিনিসের সমাধান করছে।

ক্লাসের আর কেউ এর সমাধান করতে পারে না, তিক্তকণ্ঠে ভাবল কিশোর। অসম্ভব কঠিন। সেজন্যেই বাসে উঠেই প্রতিদিন এটা নিয়ে মাথা ঘামানো শুরু করে যেন সবাইকে, বিশেষ করে কিশোবদেরকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে যে ওরা কতখানি বোকা।

'হাই কিশোর,' ডেকে বলল রয়, 'এ জিনিসটা ঠিক বুঝতে পারছি না। সাহায্য করবে?'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে পিত্তি জ্বালানো হাসি হাসল শারিয়া, 'আমরা বোকা বনে গেছি।'

কিশোরের বলতে ইচ্ছে করল, বোকা বনলে বনেই থাকো না। কিন্তু আরেকটা জিনিস মনের কোণে খচখচ করছিল বলেই আগ্রহী চোখে ফিরে তাকাল। ওষুধে কাজ হয়েছে কিনা, ওরা বুদ্ধিমান হয়েছে কিনা বোঝা দরকার।

রয় জিজ্ঞেস করল, 'এমন একটা বোকা গাধার নাম বলো তো, যেটার বানান সাত অক্ষর দিয়ে হয়।'

'গাধা তো এক রকমই হয়,' জবাব দিল কিশোর। 'আর সেটার বানান তিন অক্ষরে...'

'উঁহু,' আঙুল নাড়ল রয়, 'এই গাধাটার বানান সাত অক্ষর দিয়েই হয়।'

হেসে কুটিকুটি হতে লাগল শারিয়া।

এটা আমার মস্ত সুযোগ, কিশোর ভাবছে, মগজটা বুদ্ধিমান হয়েছে কিনা বোঝার। বহু সময় তো পার হয়েছে। এতক্ষণে ওষুধে ক্রিয়া করে ফেলার কথা। ইস, আঙ্কেল জ্যাকের ফরমুলাটা যদি কাজ করত! জবাবটা কি হবে, ভাবতে লাগল সে।

'পারছ না?' হাসতে হাসতে বলল রয়। 'দাঁড়াও, সূত্র দিয়ে দিই। দেব?'

ফ্যালফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর।

'ঠিক আছে, দিচ্ছি,' রয় বলল। 'কে-আই-এস-এইচ...'

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল শারিয়া, 'ও-আর-ই।'

প্রচণ্ড রসিকতায় মজা পেয়ে হো হো করে হেসে উঠল দু'জনে। ওদের সঙ্গে যোগ দিল আরও কয়েকজন ছেলেমেয়ে। শুঁটকি টেরি আর তার বন্ধুরাও রয়েছে সেই দলে।

রাগে, হতাশায়, দুঃখে চোখে পানি চলে এল কিশোরের। সীটের মধ্যে এলিয়ে

পড়ল। দৃষ্টি জানালার বাইরে। ভেসে বেড়ানো কুয়াশা আর ধূসর আকাশ মনটা আরও খারাপ করে দিল তার।

এত বোকা কি করে হয়ে গেলাম আমি! ভাবছে সে। এতটাই বোকা! মগজটাতে কি হলো আমার!

পেছনের সীট থেকে শোনা গেল আচমকা রবিনের চিৎকার। 'হায় হায়, আমার ব্যাগ!'

ফিরে তাকাল কিশোর। 'কি হয়েছে, রবিন?'

'আমার স্কুল ব্যাগ,' জবাব দিল রবিন। 'আনতে ভুলে গেছি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুসা বলল, 'আমি ব্যাগ এনেছি, কিন্তু টিফিন আনিনি। ভুলে গেছি। লাঞ্চের সময় খাব কি?'

সীটের সারির মাঝখান দিয়ে বাসের দুলুনির সঙ্গে সঙ্গে দুলতে দুলতে এগোল রবিন। চিৎকার করে অনুরোধ করতে লাগল ড্রাইভারকে, 'আমার ব্যাকপ্যাক, বই-খাতা, সব বাড়িতে ফেলে এসেছি। প্লীজ, বাসটা ঘোরান। ফিরিয়ে নিয়ে চলুন। প্লীজ!'

'সরি,' নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দিল ড্রাইভার। বিশালদেহী একজন মোটাসোটা মহিলা। ঠোঁট থেকে ঝুলছে একটা দাঁত খোঁচানোর কাঠি। ফিরেও তাকাল না রবিনের দিকে।

'কিন্তু আমার জিনিসগুলো তো দরকার,' মরিয়া হয়ে বলতে লাগল রবিন। 'নইলে, নইলে ক্লাস করব কি করে? স্কুলে গিয়ে কি করব?'

মুসাও উঠে এসেছে তার পেছন পেছন। ড্রাইভারকে অনুরোধ করতে লাগল সে-ও।

'সরি!' নির্বিকার কণ্ঠে একই জবাব দিল মহিলা।

মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল কিশোরের। আরও দমে গেল। এত বোকা তো ছিল না ওরা। হঠাৎ করে এমন কি ঘটে গেল যে মগজের এই অবস্থা হয়ে গেল?

দিনকে দিন খারাপের দিকেই যাচ্ছে। ভাল হওয়ার কোনই লক্ষণ নেই।

তার মনে হতে লাগল, আজকে বাসে ওঠার পর থেকে যা যা ঘটল এরচেয়ে খারাপ কিছু আর ঘটতে পারে না।

কিন্তু তার ধারণা ভুল।

নয়

ব্ল্যাকবোর্ডে লিখতে লিখতে থেমে গেলেন মিস্টার ক্রেগ। চক হাতে ঘুরে দাঁড়ালেন। 'কি হলো, কিশোর? এত হাসি কিসের?'

ক্লাসের সবগুলো চোখ এখন কিশোরের দিকে।

হাসি থামানোর চেষ্টা করছে কিশোর। কিন্তু এমন একটা ছবি ওর হাতে ধরিয়ে দিয়েছে টেরির দোস্ত কডি, না হেসে থাকতে পারছে না সে। তাকালেই হাসি। মিস্টার ক্রেগের কিম্ভূত একটা ছবি এঁকেছে কডি। নাক দিয়ে দুটো কালো ক্রিমি বেরিয়ে আসছে।

ছবির নিচে টেরি ক্যাপশন লিখে দিয়েছে: **পেটে পচা। তাই ক্রিমিও পেটে থাকতে চায় না।**

এই লেখাটাই বেশি হাসাচ্ছে কিশোরকে। ছবিটা দেখে তার মনে হচ্ছে: শিল্পী বটে কডি! ছবি আঁকায় ওর যে এত ভাল হাত, কই জানা ছিল না তো!

অংক করাচ্ছেন মিস্টার ক্রেগ। সারা ক্লাসের মনোযোগ সেদিকেই ছিল। পিনপতন নীরবতা। কেবল ব্ল্যাকবোর্ডে মিস্টার ক্রেগের চক ঘষার কিঁচকিঁচ শব্দ। এর মাঝে কিশোরের হো হো করে হেসে ওঠাটা যে কতটা বেমানান লেগেছে, ভাবতেই এখন সিঁটিয়ে গেল সে।

গাধা! গাধা আর কাকে বলে!

এগিয়ে এলেন মিস্টার ক্রেগ। কিশোরের কাছে এসে দাঁড়ালেন। তার হাতের ছবিটার দিকে তাকালেন।

আচমকা হাত বাড়িয়ে কেড়ে নিলেন ছবিটা। দেখার জন্যে চোখের সামনে নিয়ে গেলেন।

ঢোক গিলল কিশোর। মুখ তুলে তাকাল টিচারের দিকে। হাসি নেই তার মুখে। ভীষণ গম্ভীর।

আরও নীরব হয়ে গেছে ঘরটা। নিঃশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে।

'তুমি এঁকেছ?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার ক্রেগ। ফিসফিসানির মত শোনা গেল তাঁর কণ্ঠ।

'না,' কোনমতে জবাব দিল কিশোর। কান ঝাঁ-ঝাঁ করছে। ঘাড় গরম হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছে লাল হয়ে যাচ্ছে মুখ।

'হুঁ। কে এঁকেছে তাহলে?' মোলায়েম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার ক্রেগ।

'অ্যা!...' কডির কথা বলবে কিনা ঠিক করতে পারছে না কিশোর। 'জানি না!'

'আমার ছবি নাকি?' মিস্টার ক্রেগের প্রশ্ন।

'তা-তাও তো বুঝতে পারছি না, স্যার,' বলেই হা-হা করে হেসে উঠল কিশোর। আটকাতে পারল না হাসিটা।

গাধা! মস্ত গাধা! মনে মনে গাল দিল নিজেকে।

নীরবতা নেই আর ঘরে। সবাই হাসছে এখন। মিস্টার ক্রেগ বাদে।

হাসি থামার অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনি। তারপর ছবিটা কিশোরের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আঁকাটা ঠিক হয়নি। আমার চুল আরও লম্বা। নাকটা আরও খাটো।'

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল কিশোর। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আল্লাহ্ বাঁচিয়েছেন আমাকে, ভাবল। মিস্টার ক্রেগ ধমক দেননি। স্কুল ছুটির পর থাকতে বলেননি।

শাস্তি দেননি। বড় বাঁচা বেঁচে গেলাম।

কিন্তু নিঃশ্বাসটা একটু আগেভাগেই ফেলেছে কিশোর। তখনও অনেক কিছু বাকি।

'ক্লাসটাকে যখন আজ এতটাই সরগরম করে তুলতে পারলে, কিশোর পাশা,' মিস্টার ক্রেগ বললেন, 'যাও না, ব্ল্যাকবোর্ডে গিয়ে সবাইকে দেখিয়ে দাও সমীকরণটা কি ভাবে করতে হবে।'

'সমীকরণ? আমি?'

বুকের মধ্যে হাতুড়ির বাড়ি পড়া শুরু হলো কিশোরের। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে দেখে পায়ে শক্তি পাচ্ছে না। কোনমতে টলতে টলতে এগিয়ে গেল ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে।

সমীকরণটা পড়তে গিয়ে মাথা চুলকানো শুরু করল।

আরও একবার ভাবল মগজ উন্নত করার ওষুধটার কথা। এখনও কি ওষুধের কার্যকারিতা শুরু হওয়ার সময় হয়নি?

ইস্, যদি জেনে যেত কি করে সমাধান করতে হবে সমীকরণটার? কি মজাই না হতো। খসখস করে লিখে যেত মিস্টার ক্রেগ আর সহপাঠীদের বিস্মিত চোখের সামনে। ওকে আর বোকা বলার সাহস পেত না কেউ। বোকা তো সে ছিলও না। কিন্তু কেন যে···

ওষুধে কি কাজ শুরু করেছে?

যদি খালি···যদি খালি···

চকে লিখে রাখা অংকগুলোর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেমন যেন অন্য রকম লাগতে শুরু করল তার।

মনে হলো যেন একটা তীব্র বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল সমস্ত দেহে।

খাড়া হয়ে উঠল হাতের লোম। ভয়ে না মগজের কোন প্রতিক্রিয়ার কারণে, বুঝতে পারল না।

পারবে সে, বুঝে গেল। সমাধান করে ফেলতে পারবে সমীকরণটার।

'কি হলো, কিশোর? চুপ করে আছো কেন?' পেছন থেকে বললেন মিস্টার ক্রেগ।

অক্ষর আর নম্বরগুলোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল সে, 'কোনটার সমাধান করব, স্যার? কিভাবে?'

হেসে উঠল সারা ক্লাস। ব্যঙ্গের হাসি।

'ঠিক আছে, প্রথমে এক্স থেকেই শুরু করি,' গলা কাঁপছে কিশোরের।

একটুকরো চক তুলে নিয়ে লিখতে আরম্ভ করল সে।

লিখতে গিয়ে বেশি চাপ দিয়ে চকই ভেঙে ফেলল। অর্ধেকটা চক উড়ে গিয়ে পড়ল মেঝেতে। তাকাল না সে।

বুকের মধ্যে কাঁপছে। হচ্ছে তো অংকটা?

অদ্ভুত এক ভয়ের অনুভূতি। এ রকম অনুভূতি জীবনে হয়নি তার।

অবশেষে লেখা শেষ হলো। ফিরে তাকাল মিস্টার ক্রেগের দিকে। অনিশ্চিত

ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'হয়েছে, স্যার?'

বোর্ডের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোয়াল শক্ত হয়ে গেল মিস্টার ক্রেগের মুখ।

কঠিন হয়ে গেল দৃষ্টি।

অস্থির ভঙ্গিতে চুলে আঙুল চালালেন টিচার। চঞ্চল চোখের মণি দ্রুত ঘুরছে ব্ল্যাকবোর্ডের লেখাগুলোর ওপর।

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করলেন তিনি। 'অবিশ্বাস্য!'

হাসিটা চওড়া হলো কিশোরের।

ঢোক গিললেন মিস্টার ক্রেগ। চোখের পাতা সরু করে আনলেন। 'এগুলো কি করলে? এতক্ষণ ধরে লিখলে, কিছুই তো হয়নি।'

'তারমানে, স্যার?' হাসি মুছে গেল কিশোরের মুখ থেকে, 'হয়নি?'

'উঁহু!' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন টিচার। 'যে ভাবে লেখা শুরু করলে, আমি তো ভাবলাম পেরেই ফেলবে···কিন্তু···' কথাটা শেষ হলো না তাঁর।

'তারমানে, স্যার···ভুল?' ঢোক গিলল কিশোর। ভাঙা ভাঙা স্বর বেরোল কোলাব্যাঙের মত।

'পুরোপুরি ভুল,' হতাশ ভঙ্গিতে জানালেন মিস্টার ক্রেগ। 'শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।'

ফুটো বেলুনের মত চুপসে গেল কিশোর। তবে কেউ আর এখন হাসছে না তার দিকে তাকিয়ে। সবারই যেন দুঃখ হচ্ছে তার জন্যে।

'কিশোরকে কেউ সাহায্য করতে পারবে?' মিস্টার ক্রেগ বললেন। 'রবিন, মুসা–তোমরা তো কিশোরের বন্ধু। পারবে তার অংকটা করে দিতে?'

'না, স্যার,' জবাব দিল রবিন। 'আমি আমার বইপত্রই আনতে ভুলে গেছি। তা ছাড়া এই চ্যাপ্টারটা আমি পড়িওনি।'

মাথা চুলকে মুসা বলল, 'আমি, স্যার, আমার লাঞ্চবক্স আনতেই ভুলে গেছি।'

দশ

জানালার ঠিক বাইরেই ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ঘরের ভেতরে নজর রেখেছে দুই জোড়া চোখ।

মাজুলের দিকে ঘুরল গাজুল। 'নাহ্, এই অপদার্থগুলোকে দিয়ে হবে না। তিনটেই গাধা, গাধা, গাধা!'

বিরক্তিতে চোখ-মুখ কুঁচকে ফেলল সে। থু থু করে থুতু ফেলল মাটিতে।

'তারমানে মগজশক্তি রসায়নেও কোন কাজ করছে না?' জানালা দিয়ে আবার ক্লাসরূমের ভেতরে তাকাল মাজুল।

'উঁহু, করছে না। মানুষ হলো একেবারে নিচু জাতের প্রাণী। বুদ্ধিশুদ্ধি বলতে কিচ্ছু নেই ওদের।'

'কি আর করা,' মাজুল বলল। 'অকারণে আর এদের পেছনে লেগে না থেকে চলো আর কাউকে খুঁজি। এ স্কুলের কোনটাকে দিয়েই মনিবের কোন কাজ হবে না। বুদ্ধিমান মানুষ দরকার আমাদের। বুদ্ধিমান গোলাম।'

'মগজের ওষুধটা তো কাজ করছে না, আঙ্কেল,' টেলিফোনে ককিয়ে উঠল রবিন।

'তাঁকে বলো, মগজ খুলছে না আমাদের,' পাশে থেকে বলে দিল কিশোর।

'বলো, আগের মতই বোকা রয়ে গেছি,' মুসা বলল।

কিশোরের ঘরে বসে কথা বলছে ওরা।

'তোদেরকে ধৈর্য ধরতে বলেছিলাম,' আঙ্কেল বললেন। গবেষণাগারে কোনও ধরনের মেশিন চলছে। সেটার গর্জনকে ছাপিয়ে চিৎকার করে কথা বলতে হচ্ছে তাঁকে।

'কিন্তু আমরা তো ঠিকঠাকমতই ওষুধ খেয়েছি, বলো না,' কিশোর বলল। 'কাজ হচ্ছে না কেন? যা ভয়ঙ্কর একটা দিন কাটিয়েছি...আর...আর...'

'বরং আগের চেয়ে বোকা হয়ে গেছি,' ফোনে আঙ্কেলকে জানাল রবিন।

'ওটা তোর ভুল ধারণা,' আঙ্কেল জবাব দিলেন। 'তা ছাড়া এ ধরনের মগজ উন্নয়নকারী ওষুধগুলো রাতারাতি কাজ করে না। রক্তের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে যেতে প্রচুর সময় নেয়। তোদেরকে এখন...'

মেশিনের শব্দ থামল।

'কিসের শব্দ হচ্ছিল, আঙ্কেল?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'ব্লেন্ডার মেশিন,' আঙ্কেল জানালেন। 'গাজরের রস মেশাচ্ছি।'

'কিন্তু...আমরা কখন বুদ্ধিমান হব?' রবিন নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। 'কালকে আমাদের অংক পরীক্ষা। আমরা চাইছি ভাল একটা গ্রেড পেতে।'

'ভাল গ্রেড তো পরের কথা,' কিশোর বলল। 'পাস করব কিনা সন্দেহ। আমি শুধু পাস করলেই খুশি।'

ঘাড় কাত করে মুসাও কিশোরের সঙ্গে একাত্ম হলো। সেকথা আঙ্কেলকে জানাল রবিন।

'পাস করবে না মানে?' আঙ্কেল বললেন। 'অবশ্যই পাস করবে। কি বলেছিলাম তোদের, ভুলে গেছিস? ভাল করে পড়ালেখা করতে হবে। বেশি বেশি করে পরিশ্রম করতে হবে। ওষুধটার কথা মন থেকে উধাও করে দিয়ে একেবারে ভুলে যেতে হবে। তারপর দেখ না, কি ভাবে কাজ করছে। আগামীকালকের পরীক্ষার জন্যে ভাবনা নেই। পাস করে যাবি।'

'কিন্তু,' মাথা চুলকাল রবিন, 'এতক্ষণেও কি রক্তে মিশে যায়নি?'

'বললাম তো ওষুধটার কথা ভুলে যেতে,' আঙ্কেল জ্যাক বললেন। 'কাল আবার ফোন করিস আমাকে। আমি জানি, কালকে তোরা ভাল খবর দিতে পারবি।'

তাঁকে ধন্যবাদ আর গুড-বাই জানিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল রবিন।

'ভাল খবর,' তিক্তকণ্ঠে বিড়বিড় করল কিশোর। মেঝেতে রাখা ব্যাকপ্যাকটাতে ধাঁ করে এক লাথি মারল, যেন সমস্ত দোষ ওটার। 'ভাল খবরটা কি আকাশ থেকে পড়বে? অংকে তো গোল্লা পাব।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। 'কোন চ্যাপ্টারটা পড়তে হবে তাই তো জানি না।'

'স্কুলের কাউকে ফোন করে জেনে নেব নাকি?' রবিন বলল। 'রয়, কিংবা শারিয়া, কিংবা অন্য কেউ—বলব আমাদের সঙ্গে এসে বসে পড়তে?'

'মাথা খারাপ নাকি তোমার?' কিশোর বলল। 'ওরা আমাদের সঙ্গে বসে কস্মিনকালেও পড়বে না। আমাদের বোকামিকে ওরা রীতিমত ভয় পায়, এড়িয়ে চলে। বুঝতে পারো না সেসব?' ব্যাকপ্যাকে আবার লাথি মারতে গিয়ে আঙুলে পেল ব্যথা। আঁউ করে উঠল।

'এ সব রাগারাগি আর চিন্তা-ভাবনা করার চেয়ে এসো বসে বসে পড়ি,' রবিন বলল। 'আঙ্কেল কি করতে বলেছেন, শুনলে না? মন দিয়ে পড়তে বলেছেন। ওষুধের কথা ভুলে যেতে বলেছেন।'

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। 'বের করো তো দেখি অংক বইটা। আর রিভিউ শীটটা।'

'গলাটা শুকিয়ে গেছে,' মুসা বলল। 'কোকটোক কিছু আনো না।'

'যাচ্ছি,' বলে দরজার দিকে রওনা হলো কিশোর।

বারান্দায় বেরিয়েই 'উহ্' করে এক চিৎকার দিয়ে বুক চেপে ধরল।

'কি হলো, কি হলো।' বলে দৌড়ে এল মুসা ও রবিন।

হাসি শোনা গেল গলির মাথা থেকে। বলে উঠল হাসি হাসি একটা বালককণ্ঠ, 'ডার্টটা এত জোরে আঘাত করবে বুঝতে পারিনি।'

জ্বলন্ত চোখে সেদিকে তাকাল কিশোর। চিৎকার করে উঠল, 'তুমি কখন এলে?'

রবিন আর মুসাও বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে। বারান্দার মাথায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল আট বছর বয়েসী ছেলেটাকে। ওর নাম ডন। মেরিচাচীর বোনের ছেলে। ওর বাবা আইব্রাম হেনরি স্টোকার অনেক বড় বিজ্ঞানী। অ্যারিজোনায় থাকে ডনরা। মাঝে মাঝেই বেড়াতে আসে সে। বেশির ভাগ সময়ই একা আসে।

'কোথায় পেলে ওই ডার্ট?' রাগে আবার চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'ডার্ট কোন খেলনা জিনিস হলো না। আরেকটু…আরেকটু হলেই তো খুন করে ফেলেছিলে আমাকে!'

'না, তা করব কেন? এগুলো খেলনা ডার্ট,' এগিয়ে আসতে আসতে জবাব দিল ডন।

'কিন্তু ব্যথা তো কম লাগল না,' রাগ যাচ্ছে না কিশোরের। 'আর লাগালেও ঠিক হৃৎপিণ্ডের ওপরে।'

'তাই তো লাগাব,' মেঝে থেকে ডার্টটা কুড়িয়ে নিতে নিতে নির্বিকার ভঙ্গিতে জবাব দিল ডন। 'তাতে পয়েন্ট বেশি। পঞ্চাশ পয়েন্ট। তবে সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট মাথায় লাগাতে পারলে। মাথায় একশো। পেটে তিরিশ। হাতে আর পায়ে দশ পয়েন্ট করে।'

'ভাগো এখান থেকে!' ধমকে উঠল কিশোর। বুকের আহত জায়গাটা ডলতে ডলতে বলল, 'আবার কেন মরতে এসেছ এখানে? একা এলে নাকি?'

কিশোরের ধমকে হাসি মুছল না ছেলেটার। বরং মজা পাচ্ছে। তার কাজ সে করে ফেলেছে। 'হ্যাঁ, একা। থাকব কিছুদিন। বাবা গেছে বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে। ফিরতে দেরি হবে।'

'তারমানে জ্বালিয়ে মারবে!' বিড়বিড় করল কিশোর। 'নিজের জ্বালাতেই বাঁচি না...'

তার কথা যেন কানেই ঢুকল না ডনের। মুসার দিকে তাকাল, 'ডার্ট ছোঁড়াছুঁড়ি খেলবে নাকি, মুসাভাই?'

'নাহ্,' শুকনো কণ্ঠে জবাব দিল মুসা। 'কালকে অংক পরীক্ষা। পড়তে হবে।'

'পরীক্ষা দিয়ে আর কি করবে। ফেল করবে জানা কথা। তারচেয়ে এসো, ডার্ট খেলা যাক...'

ধৈর্য হারাল কিশোর। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'তুমি যাবে এখান থেকে!'

চমকাল না ডন। স্নায়ুর জোর সাংঘাতিক। ভুরু কুঁচকে কিশোরের দিকে তাকাল, 'কি হয়েছে তোমার, কিশোরভাই? অমন করছ কেন?'

জবাব দিল না কিশোর।

কিন্তু তার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বোধহয় বুঝতে পারল ডন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়। আর কিছু না বলে চলে গেল সে।

এগারো

পরদিন স্কুলে অংক পরীক্ষার পর কিশোর আর রবিনের কাছে এসে দাঁড়াল মুসা। 'পরীক্ষাটা কিন্তু খারাপ হয়নি, যাই বলো।'

কাঁধ ঝাঁকাল কিশোর। 'সবগুলো প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছি আমি। এটাকে শুভলক্ষণই বলতে পারো।'

'আমার অবশ্য কিছু কিছু জায়গায় ভাবতে হয়েছে,' রবিন বলল। 'তিন নম্বর সমীকরণটা তো রীতিমত ভাবনায় ফেলে দিয়েছিল। তবে সমাধান করে ফেলেছি। ঠিক হলো কিনা বোঝা যাবে মিস্টার ক্রেগের দেখার পর।'

'তবে কেন যেন মনে হচ্ছে,' কিশোর বলল, 'এবার পাস করে ফেলব। যদিও শিওর হতে পারছি না।'

ওদের পেছনে রয়ের সঙ্গে কথা বলতে শুনল শারিয়াকে। 'একেবারেই সহজ।'
'পানির মত,' রয় জবাব দিল।
অকারণেই জোরে জোরে হাসতে লাগল দু'জনে।
তিন গোয়েন্দাকে ব্যঙ্গ করল কিনা ওরা বোঝা গেল না। কিন্তু রাগ হতে থাকল মুসার। শুঁটকির চেয়ে কোন অংশেই ভাল না এই ছেলেমেয়ে দুটোও। এখন ওদের সময় খারাপ, তাই কিছু বলল না।
'আরও কঠিন অংক দিতে পারেন না, স্যার?' ডেকে বলল রয়।
'দেখা যাক, পরের বার,' জবাব দিলেন মিস্টার ক্রেগ।
'কিশোর,' হেসে জিজ্ঞেস করল রয়, 'তোমাদের কেমন হলো?'
'আশা করি তোমাদের চেয়ে ভাল হবে,' গম্ভীর স্বরে জবাব দিল কিশোর।
বিশ্বাস করল না রয় কিংবা শারিয়া। হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল দু'জনে।

'পরীক্ষার ফল জানাব এখন,' পরদিন বিকেলে ঘোষণা করলেন মিস্টার ক্রেগ।
ডেস্কের সারির মাঝখান দিয়ে হেঁটে হেঁটে খাতাগুলো বিতরণ করতে লাগলেন তিনি।
'সব মিলিয়ে খুশিই হয়েছি আমি,' মিস্টার ক্রেগ বললেন। 'কঠিন প্রশ্ন করেছিলাম। মোটামুটি সবাই ভাল করেছ তোমরা।'
রয়ের টেবিলের সামনে দাঁড়ালেন তিনি। 'ভাল করেছ, রয়।'
কিশোর ভাবছে, আমি কেমন করলাম? ডেস্কের ওপর দুই হাত রাখা। খুলছে আর মুঠোবদ্ধ হচ্ছে আঙুলগুলো। পাস করেছি তো? শুধু পাস করলেই আমি খুশি।
ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল মুসা আর রবিনের দিকে। পেছনের সারিতে পাশাপাশি বসেছে ওরা। মুসার কোন ভাবান্তর নেই। লেখাপড়ায় খুব ভাল সে কোনকালেই ছিল না। এখন আরও খারাপ হয়েছে। কিন্তু কিশোর আর রবিনের জন্যে ব্যাপারটা ভীষণ দুঃখজনক। বুদ্ধিমান বলে যারা চিরকাল সবার ঈর্ষার কারণ হতো, আজ তারাই অন্যের করুণার পাত্র। কেন এমন হয়ে গেল, সেটা একটা বিরাট রহস্য কিশোরের কাছে। কিন্তু এতই বোকা হয়ে পড়েছে সে, রহস্যটা উদঘাটনের কথাও ভাবছে না। আর ভেবেও লাভ হবে না। ক্ষমতাই নেই।
অস্বস্তি ভরা চোখে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। কথা বলল না।
খোদা, মনে মনে প্রার্থনা করল কিশোর, কোনমতে যেন পাস করে যাই। ফেল করার লজ্জা আর সহ্য করতে পারছি না। খোদা! খোদা! প্লীজ!
খাতা দেয়া শেষ করলেন মিস্টার ক্রেগ। ডেস্কে ফিরে গেলেন।
'স্যার, আমার খাতাটা?' কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
ফিরে তাকালেন মিস্টার ক্রেগ। হাসলেন। 'হ্যাঁ, তোমাদেরটা বাকি আছে। মুসা আর রবিনেরটাও দেব না। ছুটির পরে আমার সঙ্গে দেখা করবে তোমরা তিনজনে।'
সর্বনাশ! একেবারে দমে গেল কিশোর।

নিশ্চয় খারাপ সংবাদ! খুব খারাপ!

ছুটির পর ছেলেমেয়েদের বেরিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলেন মিস্টার ক্রেগ।

সবাই বেরিয়ে গেল। কিশোর, মুসা আর রবিন বাদে।

ওদের খাতা তিনটে বের করলেন মিস্টার ক্রেগ। শক্ত করে ধরে রেখে তাকালেন ওদের দিকে। তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটি করলেন। ভাঁজ পড়ল কপালে।

'তোমাদের জন্যে দুঃখ হচ্ছে আমার, সত্যি,' মোলায়েম কণ্ঠে বললেন তিনি। 'বড় বেশি হতাশ করলে তোমরা আমাকে।'

বারো

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর।

চোখ নামাল রবিন। মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল।

'তারমানে...তারমানে আবার ফেল করলাম!' বিড়বিড় করল মুসা।

জবাব দিলেন না মিস্টার ক্রেগ। লম্বা লম্বা পায়ে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়ালেন তিনি। তাকিয়ে রইলেন মেঘে ঢাকা ধূসর আকাশের দিকে।

'দোষটা বোধহয় আমারই ছিল,' ওদের দিকে পেছন দিয়ে রেখেছেন তিনি। 'ভাল করার জন্যে অনবরত চাপ দিয়ে যাচ্ছিলাম তোমাদের ওপর। মরিয়া হয়ে তাই এ কাজটা করে বসলে।'

আচমকা ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন ওদের দিকে। 'কিন্তু কল্পনাই করতে পারিনি এ ভাবে আমাকে ঠকাবে তোমরা। নকল করে লিখবে।'

'নকল!' বুঝতে পারল না কিশোর।

হাঁ হয়ে গেছে রবিন।

মুসা তাকিয়ে আছে চোখ বড় বড় করে।

'তিনজনেই ভাল করেছ তোমরা,' মিস্টার ক্রেগ বললেন। 'খুব ভাল। প্রতিটি অংকের সমাধান করেছ। একটা অংকও ভুল হয়নি। কি প্রমাণ হয় এতে? দেখে দেখে লিখেছ।' তিনটে খাতা তুলে নিয়ে ওদের দিকে ছুঁড়ে দিলেন তিনি। 'কেন করলে এ কাজ? আমাকে খুশি করার জন্যে নকল ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না?'

'কিন্তু...আমরা তো নকল করিনি!' কিশোর বলল।

'খুব মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করেছি আমরা,' রবিন বলল। 'আর কিছুই করিনি।'

'তাই তো,' মুসা বলল। 'কোন রকম চালাকি করিনি আমরা।'

আসলে তো মগজ উন্নত করার ওষুধ খেয়ে বুদ্ধি বেড়ে গেছে আমাদের, ভাবল কিশোর। কিন্তু টিচারকে বলল না সেকথা।

খাতার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে নম্বর দেখে বিস্ময়ে অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে

আসতে থাকল রবিনের মুখ থেকে। বিশ্বাস করতে পারছে না। তবে কি সত্যি কাজ করেছে মগজ উন্নত করার ওষুধ? বুদ্ধিমান হয়ে গেছে ওরা?

'তোমাদেরকে আমি পছন্দ করি,' মিস্টার ক্রেগের কথা শুনে মুখ তুলে তাকাল রবিন। 'তাই এবার আর প্রিন্সপ্যালের কাছে পাঠালাম না। তবে এরপর আর এ ধরনের অন্যায় করলে কিন্তু আর মাপ করব না।'

'কিন্তু···স্যার···আমরা···' কথা বের করতে পারছে না মুসা।

'সত্যি বলছি, নকলটকল কিচ্ছু আমরা করিনি,' কিশোর বলল।

অধৈর্য ভঙ্গিতে চোখ ওল্টালেন মিস্টার ক্রেগ। আঙুল তুলে নাড়লেন। 'বললাম তো, এবারকার মত মাপ করে দিলাম। এ কাজ কেন করেছ, তা-ও বুঝতে পারছি। দাও, দেখি, টেস্ট পেপারগুলো ছিঁড়ে ফেলি। কাল আবার নতুন খাতা দেব। নতুন প্রশ্নপত্র।'

'কিন্তু, স্যার, আমরা···' বলতে গেল কিশোর।

'বললাম তো, নতুন করে পরীক্ষা দিতে হবে তোমাদের,' কোন কথা শুনতে চাইলেন না মিস্টার ক্রেগ। 'মনোযোগ দিয়ে পড়বে আজ রাতে। যাতে পাস করতে পারো। আজকের কথা তাহলে আর মনে রাখব না আমি।'

টিচারের ধমক আর রাগারাগি নিয়ে মাথাই ঘামাল না ওরা। আনন্দে নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরল।

'বুদ্ধিমান হয়ে গেছি আমরা,' কিশোর বলল। 'মগজের স্থবিরতা কেটে গেছে। বোকামি শেষ।'

'সব আঙ্কেল জ্যাকের কৃতিত্ব,' রবিন বলল। 'তিনিই আমাদেরকে বুদ্ধিমান বানিয়ে দিয়েছেন। ভেবে দেখো, কিশোর, দুনিয়ায় কি একটা সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন তিনি। সমস্ত বোকাদেরকে তো বুদ্ধিমান বানাবেনই, মগজ উন্নত করার ওষুধ বেচে বেচে নিজেও কি পরিমাণ বড়লোক হয়ে যাবেন, কল্পনা করতে পারো?'

'সব বোকাদের নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই,' জবাবটা দিল মুসা। 'আমি শুধু আমাদের কথা ভাবছি। তুমি কল্পনা করতে পারো, স্কুলে সব বিষয়েই "এ প্লাস" পেয়ে গেলে কি একটা সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে যাবে?'

'এখনই অত আশা করে ফেলাটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না,' গম্ভীর সুরে কিশোর বলল। 'সব বিষয়ে "এ প্লাস" পাওয়ার বিষয়টা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলা উচিত। নইলে পরে দুঃখ পেতে হবে। নিশ্চয় আমাদের ভাগ্য ভাল, সব প্রশ্ন কমন পড়েছিল, তাই ওই পরীক্ষাটায় আমরা ভাল করে ফেলেছি। সবগুলোতেই যে এমন করব, তা না-ও হতে পারে। দেখা যাক, আগামী কাল কি হয়।'

'ওটাতেও "এ" পেয়ে যাব,' জোর দিয়ে বলল রবিন, 'এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ নেই আমার। এমনকি সেটা পাওয়ার জন্যে পড়তেও হবে না আমাদের।' মহা উল্লাসে ব্যাকপ্যাকটাকে ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিল সে।

বাকি পথটা যেন উড়ে পেরোল তিনজনে।

রবিনদের বাড়িতে ঢুকল ওরা। লিভিং রুমে ঢুকে রিনিতাকে দেখতে পেল। কতগুলো প্লাস্টিকের টুকরো জোড়া দিয়ে ম্যাপ বানানোর চেষ্টা করছে সে।

'এখনও এই নিয়েই পড়ে আছো,' রবিন বলল। 'এক খেলা খেলতে বিরক্ত লাগে না তোমার?'

'না লাগে না,' রিনিতা জবাব দিল।

মুসা হেসে জিজ্ঞেস করল, 'দেব জোড়া লাগিয়ে?'

'দিলে তো ভালই হতো। কিন্তু তোমরা হাঁদারা কি পারবে? মাথায় গোবর ছাড়া কিছু নেই।'

'দাও তো দেখি,' হাত বাড়াল কিশোর।

'থাক থাক, যেটুকু করেছি, সেটাও নষ্ট করার দরকার নেই,' কিশোরের হাতটা সরিয়ে দিল রিনিতা।

'আরে দিয়েই দেখো না,' রবিন বসে পড়ল রিনিতার পাশে। কিশোর আর মুসাও বসল।

প্রথমেই ইনস্ট্রাকশন শীট—যেটা দেখে দেখে সাজাতে হয়, সেটা ছিঁড়ে কুটি কুটি করল রবিন।

চিৎকার করে উঠল রিনিতা, 'হায় হায়, এ কি করলে! সাজাব কি করে এখন?' কাঁদতে শুরু করল সে।

হেসে উঠল রবিন। 'ওই শীটের আর প্রয়োজন পড়বে না।'

দ্রুতহাতে জোড়া দিতে শুরু করল সে। তাকে সাহায্য করল কিশোর আর মুসা।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্লাস্টিকের মস্ত একটা ওয়ার্ল্ড ম্যাপ তৈরি হয়ে গেল।

চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল রিনিতা। বিশ্বাস করতে পারছে না। তারপর বিস্ময়টা যেন বিস্ফোরিত হলো তার। চিৎকার করে উঠল, 'কি ভাবে করলে!'

'পানির মত সহজ,' হাসতে হাসতে বলল রবিন।

'তুমি কি ভেবেছিলে চিরকালই আমরা হাঁদা থেকে যাব,' হেসে বলল রবিন।

কিশোর কিছু বলল না। নীরবে উপভোগ করতে লাগল ব্যাপারটা।

জানালা দিয়ে চুরি করে পুরো ব্যাপারটাই লক্ষ করল গাজুল আর মাজুল।

মাজুল অবাক, 'তারমানে সত্যি সত্যি ওষুধে কাজ হয়ে গেল!'

হাসিমুখে মাথা ঝাঁকাল গাজুল। 'কেন, নিজের চোখেই দেখলে। যাক, বাঁচা গেল, বাবা। নতুন করে আর কারও খোঁজ করা লাগল না। আমাদের গোলাম আমরা পেয়ে গেছি।'

তেরো

'আঙ্কেল জ্যাক,' টেলিফোনে বলল রবিন, 'শুনলে তুমি বিশ্বাস করবে না।'

রিসিভারে ভেসে এল আঙ্কেল জ্যাকের বিমল হাসি। 'কি বিশ্বাস করব না?'

'অংক পরীক্ষায় আমরা সাংঘাতিক ভাল করে ফেলেছি,' উত্তেজিত কণ্ঠে জানাল রবিন। 'যে ওষুধটা তুমি আমাদের দিয়েছিলে, কাজ করেছে ওটা।'

জোরে জোরে হাসলেন আঙ্কেল। 'আমার কি মনে হচ্ছে জানিস? ওষুধে আসলে কিছু হয়নি। হয়েছে তোদের মনোযোগ দিয়ে পড়ালেখার কারণে।'

রবিনের দুই পাশে দাঁড়ানো মুসা আর কিশোর। টেলিফোনে কি বলছেন আঙ্কেল শোনার জন্যে রিসিভারের কাছে ঝুঁকে এল দু'জনে।

রবিনের কাছ থেকে রিসিভারটা কেড়ে নিয়ে কিশোর বলল, 'উঁহু, পড়ালেখার জন্যে কিচ্ছু হয়নি। আপনার ওষুধই আমাদেরকে বুদ্ধিমান বানিয়ে ছেড়েছে। নিশ্চিন্তে আপনি এটাকে বোতলজাত করে বাজারে ছাড়তে পারেন। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ধনী হয়ে যাবেন।'

'হুঁ, সে-রকম ওষুধ ছাড়তে পারলে সত্যিই হব।...তবে তোমাদের উপকার হয়েছে শুনে খুশি হলাম,' আঙ্কেল জ্যাক জবাব দিলেন। 'কিন্তু তাই বলে পড়ালেখা যেন আবার বন্ধ করে দিও না। পরীক্ষায় ভাল করার জন্যে ওটাই হলো সবচেয়ে জরুরী।'

আরও কিছুক্ষণ উত্তেজিত তিন কিশোরের সঙ্গে কথা বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন আঙ্কেল জ্যাক। স্ত্রীর দিকে ফিরলেন।

'অংক পরীক্ষায় অসাধারণ ভাল করে ফেলেছে ওরা,' হাসতে হাসতে বললেন তিনি। 'আত্মবিশ্বাস মানুষকে কোথায় নিয়ে যায় এই ঘটনাটাই তার প্রমাণ। আমি দিলাম ওদেরকে আঙুরের রস, আর ওরা ভাবছে...! হাহ্ হাহ্ হা!'

পরদিন স্কুল বাসে চড়ার আগে দুই সহকারীকে বলল কিশোর, 'সাবধান, আমরা যে বদলে গেছি এটা যাতে কেউ বুঝতে না পারে। বুঝতে দেয়া ঠিক হবে না।'

কিন্তু রবিন সামলে নিলেও মুসা সামলাতে পারল না। বুদ্ধিমান হয়ে গিয়ে তার আচার-আচরণই পাল্টে গেছে।

গাড়িতে সীটে বসে নিত্যদিনকার মতই নিউ ইয়র্ক টাইমস ক্রসওয়ার্ড পাজলের সমাধান করছে ওরা। আজ ওদের পাশের সীটে বসেছে মুসা। ইচ্ছে করেই। জানে, সে, রবিন কিংবা কিশোর যে-ই ওদের পাশে বসুক না কেন, সমস্যায় ফেলে মজা করতে চাইবে। রোজই তাই করে। ওরা যে ভাল ছাত্র, সেটা যে কোন ভাবেই হোক জাহিরের চেষ্টা করে।

অপেক্ষা করতে লাগল মুসা।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। ফিরে তাকাল রয়। জিজ্ঞেস করল, 'এই, বলো তো চার অক্ষরের একটা গাধার নাম, যেটার প্রথম অক্ষর ''এম'' দিয়ে শুরু।'

হেসে উঠল পাশে বসা শারিয়া। টেরিয়ার ডয়েল সহ আরও অনেক ছেলেমেয়েই হেসে উঠল।

আজ রয়কেই গাধা মনে হচ্ছে মুসার। রোজ একই রকম প্রশ্ন করে। নতুনত্ব নেই। কোন রকম জড়তা কিংবা আড়ষ্টতা না রেখে শান্তকণ্ঠে জবাব দিল মুসা, 'চার অক্ষরের পারব না, তবে তিন অক্ষরের গাধার নাম বলতে পারব। যেটার প্রথম অক্ষর ''আর'' দিয়ে শুরু।'

মুহূর্তে হাসি মুছে গেল রয়ের। কালো হয়ে গেল মুখ। 'বাহ্, কালটুসটার তো মুখ খুলে গেছে আজ। সেই সঙ্গে একটু যদি বুদ্ধি খুলত।'

টান দিয়ে রয়ের হাত থেকে ভাঁজ করা খবরের কাগজটা কেড়ে নিল মুসা।

'আরে আরে কি করছ!' চিৎকার করে উঠল শারিয়া। 'দাও, দাও।'

দিল না মুসা। 'তোমরা যে জিনিসটার সমাধান করতে পারো না, দেখাও আমাকে। বলে দিচ্ছি। নাকি সবই বলে দেব?'

বলপেন বের করে কাগজের ওপর লিখতে শুরু করল মুসা। এত দ্রুত, চোখ কপালে উঠে গেল শারিয়া আর রয়ের।

খসখস করে লিখে কাগজটা ফিরিয়ে দিল মুসা। 'নাও, দেখো এবার।'

কাগজের দিকে তাকানোর জন্যে ঝুঁকে এল রয় ও শারিয়া। মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। অস্ফুট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল শারিয়ার মুখ থেকে। চোখ বড় বড় করে তাকাল রয়। চোখে অবিশ্বাস। 'কি করে করলে?'

হাসিমুখে কাঁধ ঝাঁকাল মুসা। 'সহজ। একেবারেই সহজ। অক্ষরজ্ঞান যদি ভাল থাকে তোমার, ক্রসওয়ার্ড পাজল মেলানো কোন ব্যাপারই না।'

স্কুলে সেদিন ক্লাসে তিন গোয়েন্দাকে অংক পরীক্ষায় বসালেন মিস্টার ক্রেগ। বাকি সবার জন্যে অন্য পড়া।

তিন গোয়েন্দাকে অভয় দিয়ে বললেন, 'তাড়াহুড়া নেই। ভাবনা-চিন্তা করে সুন্দরমতই জবাব দাও। কোনটা যদি না পারো, ফেলে রাখো, পরে আমার কাছ থেকে জেনে নিও। ঠিক আছে?'

প্রশ্নপত্র আর খাতা নিয়ে যার যার ডেস্কে ফিরে এল কিশোর, মুসা ও রবিন।

ডেকে বললেন মিস্টার ক্রেগ, 'আন্দাজে করলে কিন্তু হবে না। পরে ধরব। কি ভাবে করলে বুঝিয়ে বলতে হবে আমাকে। এগুলো যদি পেরে যাও, আরও কঠিন প্রশ্ন দেয়া হবে। কি, বুঝলে?'

মাথা ঝাঁকাল তিনজনেই।

দশ মিনিট পরই মিস্টার ক্রেগের কাছে টেস্ট পেপার নিয়ে হাজির হলো কিশোর। কিছু কিছু সমীকরণ তিন ভাবে করে দেখিয়েছে সে।

সব প্রশ্নের জবাব দিতে রবিনের লাগল বারো মিনিট, মুসার চোদ্দ। ওরাও কিশোরের মত একই কাজ করেছে। মোট কথা যতভাবে করা যায় এই অংকগুলো,

সব ভাবেই করেছে।

অবাক হয়ে ওদের দিকে তাকালেন মিস্টার ক্রেগ। খাতার দিকে তাকালেন না। 'কি ব্যাপার? পারছ না? খুব কঠিন মনে হচ্ছে?'

'করেছি তো, স্যার?' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর।

খাতার দিকে তাকালেন মিস্টার ক্রেগ। প্রথমে দ্রুত দেখলেন ফলগুলো। তারপর ধীরে ধীরে।

'আ-আবার তো সেই একই কাণ্ড করেছ!' কথা আটকে যেতে শুরু করল মিস্টার ক্রেগের। 'সবগুলোই তো কারেক্ট। ভাল, ভাল। তারমানে সারারাত বসে পড়াশোনা করেছ তোমরা?'

'পড়িইনি, স্যার,' কোন কিছু না ভেবেই বলে ফেলল মুসা। 'বইয়ের দিকেই তাকাইনি একবারও। অংক একটা অতি সহজ সাবজেক্ট।'

*

স্কুল ছুটির পর রবিনদের বাড়ির পেছনের খোলা জায়গায় বল খেলছে তিনজনে। খেলছে মানে এ ওর কাছে ছুঁড়ে দিয়ে লোফালুফি করছে।

বেশ কয়েক দিন মেঘে ঢাকা থাকার পর মেঘ কেটে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে সূর্য। আকাশের ধূসর রঙ আর নেই। বাতাস চমৎকার। বসন্তকালের মত।

'স্কুল ছুটি হওয়ার আগেই সমস্ত হোমওঅর্ক করে ফেলেছি আমি,' মুসা বলল। রবারের বলটাকে রবিনের দিকে ছুঁড়ে মারল সে।

মিস করল রবিন। ধরতে পারল না। বলটা চলে গেল পাতাবাহারের বেড়ার দিকে। পেছন পেছন দৌড়ে গেল সে।

'কিন্তু তোমাকে তো বলেছিলাম সাবধানে থাকতে,' কিশোর বলল। 'আমরা যে বুদ্ধিমান হয়ে গেছি অত তাড়াহুড়া করে জানান দেয়ার কি প্রয়োজন ছিল? আর মিস্টার ক্রেগের অত ভুল ধরারই বা কি দরকার ছিল?'

'তাই তো,' বল নিয়ে ফিরে এসেছে রবিন। 'যতবার তিনি ভুল করছিলেন, হাত তুলছিল সে।'

'কিন্তু এত ভুল করতে থাকলে না তুলে কি করব?' মুসা বলল। 'বোর্ডে লিখতে গিয়ে ম্যাসাচুসেটস বানানও তিনি ভুল লিখলেন। বলব না? কাউকে না কাউকে তো ভুলটা ধরিয়ে দিতেই হবে। টিচার বলে কি মাপ?'

'কিন্তু, মুসা...' বলতে গেল কিশোর।

শুনল না মুসা। তার কথা বলে গেল, 'সিভিল ওঅর কবে শুরু হয়েছে, সালটা পর্যন্ত তিনি ভুল বললেন। শুধরে দেব না?'

'কিন্তু তোমার বার বার হাত তোলা দেখে কি রকম ভঙ্গি করছিল সবাই খেয়াল করেছ?' রবিন বলল। 'ভাবখানা যেন টিচারের ভুল ধরিয়ে দিয়ে তুমি মস্ত অপরাধ করে ফেলছ। আসলেই তোমার চুপ করে থাকা উচিত ছিল। তোমার ভয়ে শেষে পড়ানোই বাদ দিয়েছেন তিনি। এ রকম পর্যুদস্ত করাটা অবশ্য ঠিক হয়নি তোমার।'

কিশোর আর মুসার মুখে 'ঠিক হয়নি' শুনতে শুনতে রাগ হয়ে গেল মুসার।

এত জোরে ছুঁড়ে মারল বলটা, আবারও ধরতে পারল না রবিন। দৌড় দিল ঝোপের দিকে। বল খুঁজতে ঢুকে পড়ল ঝোপের মধ্যে। খানিক পরেই শোনা গেল তার চিৎকার, 'কিশোর, জলদি এসো!'

'কি হলো?' বলে দৌড় দিল কিশোর। পেছনে ছুটল মুসা।

ওরা দু'জনও ঝোপে ঢুকল।

মাটির দিকে দেখাল রবিন, 'দেখেছ? জুতোর ছাপ।'

ঝুঁকে বসে ভালমত দেখে গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর, 'হুঁ। তাজা ছাপ। অনেক বড় পা। ঘটনাটা কি? আমাদের ওপর নজর রাখছিল নাকি?'

'ওই দেখো,' মুসা বলল, 'ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে ছাপগুলো।'

ছাপ অনুসরণ করে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

পেছনের উঠান পার হয়ে রবিনদের লিভিং রুমের জানালার কাছে এসে শেষ হয়েছে। মাটিতে গভীর হয়ে বসা ছাপগুলো প্রমাণ করে ওখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেছে ছাপের মালিকেরা। উঁকিঝুঁকি মেরেছে ঘরের ভেতর।

আর কোন রকম সূত্র পাওয়া গেল না।

এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর, 'কিন্তু আমাদের ওপর নজর রাখতে এল কে? এবং কেন?'

চোদ্দো

সাতদিন পর।

স্কুলে তার লকারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। ব্যাকপ্যাকে জিনিসপত্র ভরছে। স্কুল ছুটি হয়েছে। বাড়ি যাবে।

উল্টোদিকের লকারের সামনে দাঁড়ানো রয়। হাসিমুখে তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'হাই রয়, দিনকাল কেমন যাচ্ছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে দায়সারা জবাব দিল রয়, 'ভাল।'

'আমাদের বাড়ি যাবে? কম্পিউটার গেম খেলব।'

মুখ বাঁকাল রয়। 'নাহ্।'

'কেন? এসো না, কি হয়েছে,' অনুরোধ করল কিশোর।

কাঁধ ঝাঁকাল রয়। 'উঁহু। তোমার সঙ্গে পারব না। একটা গেমও জিততে পারব না। মগজ অতিরিক্ত খুলে গেছে তোমার, বুদ্ধি বেড়ে গেছে।'

'কিন্তু...'

দড়াম করে লকারের দরজা বন্ধ করে দিয়ে তাড়াহুড়া করে ওখান থেকে সরে গেল রয়।

তাকে ধরতে যাবে কিনা ভাবছে কিশোর, কথা কানে এল। ঘুরে তাকিয়ে দেখে টেরি আর তার দুই দোস্ত টাকি ও কডি। ওপথ দিয়েই যাচ্ছে।

ওদের পথরোধ করল কিশোর। অনুরোধের সুরে বলল, 'টেরি, কেমন আছো? চলো না আমাদের বাড়িতে। খেলবে।'

আঁতকে উঠল টেরি। 'ওরিব্বাপরে! তোমার সঙ্গে? না বাবা, দৈত্যের সঙ্গে খেলতে আমরা রাজি না। এই টাকি, চল চল!'

প্রায় দৌড়ে চলে গেল টেরি আর তার দোস্তরা।

মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে রইল কিশোর। এতটাই বুদ্ধিমান হয়ে গেছে ওরা, অস্বাভাবিক মানুষে পরিণত হয়েছে, সবাই এখন ওদের ভয় পায়।

মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। এ সময় সেখানে এসে হাজির মুসা আর রবিন। ওদেরও মন খারাপ। মুসার মুখ দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলবে।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কেউ আমাদের সঙ্গে খেলতে রাজি হয় না,' করুণ সুরে মুসা বলল।

'যাকে বলি, সেই পালায়,' রবিন বলল। 'সবাই আমাদেরকে বলে ফ্রীক।'

'কেউ কেউ বলে জিন-ভূতের আসর হয়েছে, কেউ বলে কবরস্থানে গিয়ে প্রেতাত্মা ঢুকিয়েছি মগজে...শুনতে শুনতে আর ভাল লাগে না,' মুসা বলল।

'অতিরিক্ত বুদ্ধিমান হয়ে যাওয়াটাও যে এতটা বিপজ্জনক, সেটা তো জানতাম না,' রবিন বলল।

'বিপজ্জনক তো বটেই, প্রচণ্ড দুঃখেরও,' মুসা বলল। 'এরচেয়ে তো বোকা থাকাটাই ভাল ছিল।'

'না, তা ছিল না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'অস্বাভাবিক থাকাটাই বিপজ্জনক, সেটা বোকাই হোক আর বুদ্ধিমানই হোক। তিনজনেরই বুদ্ধি এখন এক রকম হয়ে গেছে আমাদের। কারও চেয়ে কেউ কম নই, তাই নিজেরাও আর আগের মত খেলতে পারছি না। কি যে করব বুঝতে পারছি না!'

বুদ্ধি দিল রবিন, 'চলো, আবার আঙ্কেল জ্যাকের কাছে যাই। তাকে গিয়ে বলি, আমাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিটা ফিরিয়ে দেয়ার কোন ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা।'

'পারলে তো ভালই হতো...' চিন্তিত ভঙ্গিতে ব্যাকপ্যাক পিঠে ফেলল কিশোর।

হলরুম ধরে এক সারিতে এগিয়ে চলল ওরা।

আগে আগে চলছে রবিন।

সামনে দুটো ছায়া পড়েছে হলরুমের মেঝেতে।

ধাক্কা লাগবে ভেবে আচমকা দাঁড়িয়ে গেল রবিন।

তার পিঠের ওপর এসে পড়ল মুসা। 'কি হলো?'

নীরবে হাত তুলে দেখাল রবিন।

একপাশ থেকে বেরিয়ে এল ছায়া দুটো।

'বাবা! মা! তোমরা?' অবাক হলো রবিন।

ওদের দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন মিস্টার ও মিসেস মিলফোর্ড। গম্ভীর থমথমে চেহারা।

পেটের মধ্যে খামচি দিয়ে ধরার মত অনুভূতি হলো রবিনের। কিছু ঘটেনি

তো? জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে, মা?'

'জবাবটা তোমরাই ভাল দিতে পারবে,' এক এক করে রবিন, মুসা ও কিশোরের ওপর দৃষ্টি ঘুরে এল মিস্টার মিলফোর্ডের। রবিনের ওপর এসে স্থির হলো আবার। 'মিস্টার ক্রেগ আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন। মুসার মা-বাবা আর কিশোরের চাচা-চাচীকেও ডেকেছেন।'

'কি করেছ তোমরা?' মিসেস মিলফোর্ড জিজ্ঞেস করলেন।

'কই, কিছু তো করিনি,' জবাব দিল কিশোর।

'কিচ্ছু করিনি আমরা!' রবিন বলল।

'এসো আমাদের সঙ্গে। প্রিন্সিপ্যাল মিসেস অ্যান্ডারসনের ঘরে যেতে বলা হয়েছে আমাদের।'

'মিসেস অ্যান্ডারসন?' ভুরু কুঁচকাল মুসা। 'তাঁর ওখানে যাব কেন? কোন অপরাধ তো করিনি আমরা। হচ্ছেটা কি?'

ইচ্ছে না থাকলেও যেতে হলো। দশ সেকেন্ড পর পিন্সিপ্যালের অফিসের সামনের ঘরে ঢুকল ওরা। সামনের ঘরটা খালি। চারটে প্রায় বাজে। কর্মচারীদের সবার ছুটি হয়ে গেছে। বাড়ি চলে গেছে সেক্রেটারিরা।

পেছনের ঘর, অর্থাৎ মিসেস অ্যান্ডারসনের অফিসের দরজার দিকে এগোল সবাই। ঢোকার আগেই দরজায় বেরিয়ে এলেন তিনি। স্বাগত জানালেন ওদের। ডেকে ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে ঘরের মাঝখানে একটা লম্বা টেবিলের সামনে বসা দেখা গেল কিশোরের চাচা-চাচী আর মুসার বাবা-মা'কে। টেবিলের একধারে বসা মিস্টার ক্রেগ। আরও একজন লোক আছেন সেখানে, মিস্টার বেলসন। স্কুল পরিচালকদের সভাপতি। সবাই গম্ভীর।

মিসেস অ্যান্ডারসন এমনিতে হাসিখুশি, আন্তরিক, সবার সঙ্গেই উষ্ণ ব্যবহার করেন। কিন্তু এখন তিনিও গম্ভীর। রবিনের বাবা-মা'কেও বসতে অনুরোধ করলেন তিনি।

শীতল দৃষ্টিতে তিন গোয়েন্দার দিকে তাকালেন মিস্টার বেলসন। ফ্যাকাসে চামড়া, চকচকে টাক, কঠোর চেহারা। ধূসর সুট আর সরু নীল টাই পরেছেন। যতবার দেখেছে তাঁকে গোয়েন্দারা, এই একই পোশাকে। এগুলো ছাড়া যেন আর কোন কাপড় নেই তাঁর।

বাইরের ঘর আর অফিসের মাঝের দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে এলেন মিসেস অ্যান্ডারসন। ঘুরে গিয়ে বসলেন নিজের চেয়ারে। নিজের দুই হাতের দিকে তাকালেন। মুখ তুললেন। আসার জন্যে ধন্যবাদ দিলেন সবাইকে। ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারছে কিশোর, অস্বস্তিতে ভুগছেন মিসেস অ্যান্ডারসন।

'কি ভাবে কথাটা শুরু করব ঠিক বুঝতে পারছি না,' অবশেষে শুরু করলেন তিনি। 'অদ্ভুত এক সমস্যায় পড়ে গেছি আমরা।'

পনেরো

'সমস্যা!' মিসেস মিলফোর্ড বললেন। ভ্রূকুটি করলেন ছেলেদের দিকে তাকিয়ে।

'গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে কোন রকম অঘটন ঘটিয়েছে নাকি ওরা?' জানতে চাইলেন মেরিচাচী।

আবার নিজের দুই হাতের দিকে তাকালেন মিসেস অ্যান্ডারসন। হাত দুটো টেবিলের ওপর ফেলে রেখে মুখ তুললেন। 'না, কোন ধরনের অঘটন ওরা ঘটায়নি। কোন অপরাধ কিংবা অন্যায়ও করেনি। সমস্যাটা অন্য রকম।'

কিশোর, মুসা, রবিনের মুখের ওপর থেকে ঘুরে এল মিসেস অ্যান্ডারসনের দৃষ্টি। 'আবারও বলছি, কি ভাবে কথাটা শুরু করব আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু না বললেও চলছে না।'

সোয়েটারের আস্তিনে বেরিয়ে থাকা একটা সুতো টেনে ছেঁড়ার চেষ্টা করলেন মিস্টার ক্রেগ।

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলেন মিস্টার বেলসন। নড়েচড়ে বসলেন চেয়ারে।

'স্কুলের সবাইকে ঘাবড়ে দিচ্ছে কিশোর, মুসা ও রবিন,' অবশেষে কথাটা যেন ছুঁড়ে দিলেন মিসেস অ্যান্ডারসন। 'শুধু তাই না, টিচারদেরকেও ওরা ভয় পাইয়ে দিয়েছে।'

'কিন্তু, আমরা···' বলতে গেল কিশোর।

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন মিসেস অ্যান্ডারসন। তিন গোয়েন্দার অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'মহাবুদ্ধিমান হয়ে গেছে আপনাদের ছেলেগুলো। আগে কেন বুঝতে পারিনি সেটাও এক রহস্য। তবে গত হপ্তা দুয়েক ধরে যা ঘটছে, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই আমাদের।'

'মহাবুদ্ধিমান?' চোয়াল ডললেন রাশেদ পাশা। চোখ তুলে তাকালেন তিন গোয়েন্দার দিকে। 'মহা না হোক, তবে ওরা যে আর দশটা সাধারণ ছেলের চেয়ে বুদ্ধিমান সেটা আমরা অনেক আগে থেকেই জানি।'

'সেটা তো আমরাও জানতাম,' মিসেস অ্যান্ডারসন বললেন। 'কিন্তু গত কিছুদিন ধরে অদ্ভুত কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে ওরা। কিছুদিন এতটাই বোকা হয়ে রইল, যে ক্লাস পরীক্ষার সমস্ত টেস্টে ফেল করতে থাকল। আচার-আচরণে বোকামির চূড়ান্ত। কিন্তু গত দিন পনেরো ধরে হয়েছে উল্টোটা—বুদ্ধিমত্তার চূড়ান্ত।'

'কিন্তু বুদ্ধিমত্তার মধ্যে খারাপটা কি দেখলেন, তা তো বুঝতে পারছি না,' না বলে আর পারলেন না মুসার আম্মা মিসেস আমান।

'তা ঠিক,' মাথা ঝাঁকালেন মিসেস অ্যান্ডারসন। 'খারাপ কিছু নেই। প্রতিটি

পরীক্ষায় একশোতে একশো নাম্বার পায় ওরা। ক্লাসের যত বই আছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আগাগোড়া মুখস্থ। বইয়ের পর বই, বইয়ের পর বই পড়ে শেষ করে ফেলে ওরা, একটা অক্ষরও ভোলে না সেগুলোর। যে কোন বিষয়ের ওপর রচনা লিখতে দিলেও, যত কঠিন সাবজেক্টই হোক, বিশ-তিরিশ পৃষ্ঠার রচনা লিখে ফেলে অনায়াসে।'

'এটা তো দারুণ খবর!' হাসলেন মেরিচাচী। 'সাংঘাতিক! তারমানে গোয়েন্দাগিরির ভূত গেছে মাথা থেকে। আজকাল পড়াশোনার প্রতি বেশি মনোযোগী হয়েছে।'

'ঠিকই বলেছেন, এটা দারুণ খবরই,' মোলায়েম স্বরে মিসেস অ্যান্ডারসন বললেন। 'সাংঘাতিক। কিন্তু মোটেও ভাল অর্থে নয়। বুদ্ধি এত বেশি বেড়ে গেছে, ক্লাসে সারাক্ষণ টিচারদের ভুল শুধরে দিতে থাকে। পাঠ্যবইতে ভুল খুঁজে পায়। ওদের কাণ্ড-কারখানায় ওদেরকে রীতিমত ভয় পায় এখন সহপাঠীরা। তারা জানে, কোন প্রতিযোগিতাতেই আপনাদের ছেলেদের সঙ্গে পারবে না ওরা। ওদের ধারণা, অস্বাভাবিক...মানে, অলৌকিক কোন ব্যাপার ঘটছে কিশোর, মুসা আর রবিনকে ঘিরে।'

'না না, খারাপ কিছু ঘটাচ্ছে না ওরা,' মেরিচাচীকে কথা বলার জন্যে মুখ খুলতে দেখে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন মিস্টার ক্রেগ। ঝুঁকে এসেছেন সামনের দিকে। 'খুবই ভাল ছেলে ওরা। আসলে, যা করছে তার ওপর ওদের কোন হাত নেই। অনেক বেশি জানে ওরা। অনেক, অনেক বেশি। এই বয়েসের ছেলেদের তুলনায় সীমাহীন জ্ঞান ওদের, অস্বাভাবিক জ্ঞান। যেটা সত্যিই বিপজ্জনক, বুঝতেই পারছেন। স্কুলের পরিবেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে ওরা।'

'আমি লক্ষ করেছি,' মিস্টার বেলসন বললেন, 'ছেলেমেয়েরা এখন আর ওদের সঙ্গে খেলতে চায় না, কথা বলতে চায় না, দূরে দূরে থাকে, সব সময় এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করে। স্কুলের পরিবেশের জন্যে মোটেও সেটা ভাল কিছু নয়, বুঝতেই পারছেন।'

ঘরের সবগুলো চোখ এখন ওদের দিকে, দেখতে পাচ্ছে কিশোর। দুরুদুরু করছে বুকের মধ্যে। তার মনে হচ্ছে ঘটনাটা বাস্তবে ঘটছে না। যেন স্বপ্নের মধ্যে রয়েছে ওরা। অতিরিক্ত বুদ্ধিমান হয়ে যাওয়াটা যে এতখানি বিপজ্জনক কল্পনাই করতে পারেনি কোনদিন।

তারমানে আর সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছে ওরা। আলাদা করে ফেলা হচ্ছে ওদেরকে। ভবিষ্যতে আরও কি ঘটতে পারে কল্পনা করে মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল শীতল শিহরণ।

তারমানে কোন ধরনের ফ্রিকে পরিণত হয়েছি আমি? মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করল সে।

আমার কোন বন্ধু থাকবে না। সবাই আমাকে ঘৃণা করবে।

টিচাররাও আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে, কারণ আমি ওদের ভুল ধরে দিই।

তাহলে কি ঘটবে আমার?

দুই সহকারীর দিকে তাকাল সে। মুসা আর রবিন—ওরাও আর তার সহকারী থাকতে চাইবে না। কারণ ওদের মগজও তার মত একই রকম বুদ্ধিমান হয়ে গেছে।

মাথা নিচু করে আছে মুসা।

নিজের নখ খুঁটছে রবিন।

দু'জনেই ভয় পেয়েছে। প্রচণ্ড ভয়।

'চুপ করে আছো কেন?' মিসেস অ্যান্ডারসন বললেন। 'কিছু বলো তোমরা।'

আচমকা বলে উঠল রবিন, 'কি বলব? এর কোন ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারব না!'

'একটা জিনিস হতে পারে…' বলতে গেল মুসা।

খপ করে তার হাত চেপে ধরল কিশোর, 'না না, মুসা, বোলো না! আঙ্কেল জ্যাককে আমরা কথা দিয়েছি কারও কাছে ফাঁস করব না।'

'কিন্তু না বললে দেখছ না কি রকম বিপদে পড়ে যাচ্ছি?' রবিন বলল। 'না বলে পারা যাবে না।'

'কি না বলে পারা যাবে না?' ধমকের সুরে বললেন রবিনের মা। 'আমার ভাই কি করেছে? বলো, জলদি! না বললে আমিই ওকে জিজ্ঞেস করছি।' ফোনের দিকে হাত বাড়ালেন তিনি।

'মগজ উন্নত করার ওষুধ খাইয়ে দিয়েছে আমাদেরকে,' বলে ফেলল রবিন।

'রবিন, থামো!' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

কিন্তু যা বলার বলে ফেলেছে রবিন। আর গোপন রাখা যাবে না। সুতরাং বাকিটাও বলে ফেলল রবিন, 'আমাদেরকে এক বোতল মগজ উন্নত করার ওষুধ দিয়েছিল আঙ্কেল জ্যাক। বুদ্ধি বাড়ানোর জন্যে। হঠাৎ করে কেন জানি বোকা হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। তার কাছে গিয়ে সব বললাম। বুদ্ধি বাড়ানোর ওষুধ নিয়ে গবেষণা করছে আঙ্কেল জ্যাক, আমাদের কাকুতি-মিনতি শুনে একটা বোতল দিয়ে দিয়েছিল, তিনজনে ভাগ করে খাওয়ার জন্যে। এবং তাতে কাজ হয়ে গেছে। ওষুধ আমাদের বুদ্ধি বাড়িয়ে দিয়েছে।'

'কিন্তু এত বোকাই বা হয়ে গিয়েছিলে কেন, হঠাৎ করে?' মেরিচাচী প্রশ্ন করলেন। টিচারদের দিকে তাকালেন। 'বোকা যে হয়ে গিয়েছিল, সেটা আমিও লক্ষ করেছি।'

মিস্টার আমান বললেন, 'আমিও।'

'তাহলেই তো বোঝা যাচ্ছে,' মিস্টার ক্রেগ বললেন, 'একটা পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল ওদের।'

'একটা নয়, দুটো,' দুই আঙুল তুললেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'একবার অতিরিক্ত বোকা হয়ে যাওয়া, একবার অতিরিক্ত বুদ্ধিমান।' কিশোরের দিকে তাকালেন তিনি। 'চালাকটা কি করে হলে, তা তো বুঝলাম। কিন্তু বোকা হলে কি করে?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'জানি না!'

চুপ হয়ে গেল সবাই।

ঘরে পিনপতন নীরবতা।

দীর্ঘক্ষণ পর জোরে নিঃশ্বাস ফেলে নীরবতা ভাঙলেন মিসেস অ্যান্ডারসন। 'কোন ধরনের জাদু-করা-ফরমুলা এ রকম বুদ্ধিমান বানিয়েছে তোমাদেরকে আমি জানি না,' তিন গোয়েন্দাকে বললেন তিনি। 'তবে একটা কথা জানি। এ স্কুল তোমাদেরকে ছাড়তে হবে। আর তোমাদেরকে এখানে রাখা সম্ভব হবে না আমাদের পক্ষে।'

ষোলো

আরও কিছুদিন পর।

কিশোরদের লিভিং রূমে বসে আছে তিন গোয়েন্দা। টিভি দেখছে।

'...এই তিনটে ছেলে স্কুল বোর্ডের সঙ্গে আইনী লড়াই লড়ছে এখন,' রিপোর্টার বলছে। 'প্রশ্ন উঠেছে, শিক্ষার জন্যে ওদের কি আর স্কুলে পড়ার দরকার আছে? স্কুল বলছে, নেই। ওদের অভিভাবকেরা বলছে, আছে। সুতরাং লড়াইটা চলছেই...'

পাশের ঘরে ফোনে কথা বলছেন মেরিচাচী। তাঁর এক বান্ধবীর সঙ্গে। 'না, আমাদের উকিল বলছে, জিতটা আমাদেরই হবে।...না না...নিশ্চয় নিশ্চয়...অন্য স্কুলের খোঁজেও রয়েছি আমরা। একটা প্রাইভেট স্কুলের সঙ্গে কথাও বলেছি। নিতে রাজি হয়েছে ওরা।...কি বললেন?...ও, আঙ্কেল জ্যাক। তিনি তো নেই এখন এখানে। সুইডেন চলে গেছেন একটা বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগ দিতে। তাঁর স্ত্রীও গেছেন সঙ্গে।...নাহ্, কোনভাবেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না।'

সামনের দরজার বেল বাজল।

খুলতে যাওয়ার জন্যে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েও বসে পড়ল কিশোর।

নিশ্চয় আরেকজন সাংবাদিক। একই প্রশ্ন করতে থাকবে। গত কয়েক দিনে কম করে হলেও ডজনখানেক সাক্ষাৎকার দিয়েছে ওরা।

আগে ভাবত রেডিও-টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দেয়াটা মজার ব্যাপার। কিন্তু এখন আর মজা নেই। লোকে যখন ওদেরকে ফ্রীক ভাবতে আরম্ভ করেছে। স্কুল থেকেও যখন বাড়িতে বসে থাকতে হচ্ছে, স্কুলে যেতে দেয়া হচ্ছে না ওদেরকে। তা ছাড়া কে দেখবে এখন ওদের অনুষ্ঠান? কেউ তো ওদের পছন্দ করে না।

ওই ওষুধ আমাদের জীবনটাকেই ধ্বংস করে দিয়েছে, ভেবে মনটা তেতো হয়ে গেল কিশোরের।

সোফা থেকে উঠে এসে দাঁড়াল দরজার কাছে। টেলিফোনে মেরিচাচী কি বলছেন ভাল করে শোনার জন্যে। এখন আর রবিনের আম্মার সঙ্গে নয়, একটা

টিভি কোম্পানিকে ধমকাচ্ছেন তিনি, 'না, কোনমতেই যাবে না। ওই মগজ উন্নত করার ওষুধে কোন আগ্রহ নেই আমাদের।...বুঝলাম আপনাদের কোম্পানি খুব ভাল ফলের রস বানায়, কিন্তু আমার ছেলে আপনাদের বিজ্ঞাপন করতে যাবে না। সরি।'

আস্তে করে সরে চলে এল কিশোর। আবার আগের জায়গায় এসে বসল। কানে আসছে মেরিচাচীর রাগত কণ্ঠ।

'কার সঙ্গে কথা বলছেন?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'টেলিভিশন। আমাদের দিয়ে বিজ্ঞাপন করাতে চাইছে,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল কিশোর।

আগের দিনের কথা মনে পড়ল রবিনের। একটা লোক এসে বলল ওদের এজেন্ট হতে চায়। সাংঘাতিক এক পরিকল্পনা নিয়ে এসেছে সে। ওদেরকে ব্যবহার করে জুতো, ক্যান্ডি, সুগার কর্নের বিজ্ঞাপন করতে চায়। টেলিভিশনে শনিবার সকালের কমিক শো'তেও ওদের দিয়ে অভিনয় করাতে ইচ্ছুক। তাতে, তার ধারণা কোটি কোটি ডলার আয় হয়ে যাবে খুব সহজেই।

'ভালই তো,' রাজি হয়ে যাচ্ছিল মুসা। 'কোটিপতি হয়ে যাব আমরা। বিখ্যাত হয়ে যাব।'

'হুঁ, তা তো বটেই,' মুখ বাঁকিয়েছে কিশোর, 'বিখ্যাত ফ্রীক। অস্বাভাবিক মানুষ। সবাই আমাদেরকে আঙুল তুলে দেখাবে। আমাদের নিয়ে রসিকতা করবে। কোনদিন যদি স্বাভাবিক হইও আবার, মানুষ আর আমাদেরকে স্বাভাবিক ভাবে নেবে না।'

করুণ কণ্ঠে রবিন বলেছে, 'টাকা-পয়সা খ্যাতি কিছুই চাই না আমি। আমি শুধু স্বাভাবিক মানুষ হয়ে স্কুলে ফিরে যেতে চাই। সবার সঙ্গে স্বাভাবিক মানুষের মত মিশতে চাই।'

পরিবারের লোকজন চাইছে ওরা অপেক্ষা করুক। সাবধান থাকুক। হুট করে কোন কিছুতে সই করে না দিক। অন্তত স্কুলে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে আইনী লড়াইটার একটা কিনারা না হওয়া পর্যন্ত।

কিন্তু তাই বলে যে লোক আসা বন্ধ হচ্ছে তা না। নানা ধরনের লোক। খবরের কাগজ, বিজ্ঞাপন এজেন্ট, দোকানদার তো আছেই, প্রচুর ছেলেমেয়েরাও আসছে ওদের কাছে পড়ার জন্যে। আরেক দল আসছে ওদের পরামর্শ নিতে। কোন না কোন সমস্যায় পড়েছে ওরা। কি করলে সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, সেটা জানতে।

তারপর, সেদিন বিকেলেরই ঘটনা। পেছনের আঙিনায় খেলছে কিশোর, রবিন আর মুসা। ওদের সঙ্গে ডন। এই সময় ড্রাইভওয়েতে ঢুকল একটা কালো রঙের ট্রাক। ফ্রিসবি খেলছিল ওরা। খেলা থামিয়ে ফিরে তাকাল। লম্বা, গাঢ় রঙের সুট পরা দু'জন লোককে সদর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে দেখল।

খেলা বাদ দিয়ে সেদিকে রওনা হলো ওরা। লোকগুলো কেন এসেছে দেখতে।

ততক্ষণে দরজা খুলে দিয়েছেন মেরিচাচী। ঘরে ঢুকেছে লোকগুলো।

'মিসেস পাশা,' একটা লোককে বলতে শুনল, 'আপনার স্বামীর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই আমরা। এখান থেকে যাব মিস্টার মিলফোর্ড আর মিস্টার আমানের বাড়িতে। একটা টেস্টের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।'

'টেস্ট?' বুঝতে পারলেন না মেরিচাচী। ভ্রূকুটি করলেন।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল লোকটা। 'ইউনিভার্সিটি রিসার্চ ল্যাব থেকে এসেছি আমরা। আপনাদের ছেলেদের আমরা ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যেতে চাই। ওদেরকে নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করব। এই যেমন ইনটেলিজেন্স টেস্ট। বেশ কিছু টেস্ট করব আমরা।'

ঘরে ঢুকেছে তিন গোয়েন্দা। ওদের দিকে ফিরে তাকাল অন্য লোকটা। 'আমরা দেখতে চাই কতখানি বুদ্ধিমান তোমরা। হয়তো সরকারের কাছেও তোমরা মূল্যবান হয়ে উঠবে। দেশের জন্যে নিশ্চয় কাজ করতে চাও তোমরা, চাও না?'

জবাব দিল না ওরা। নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল গম্ভীর চেহারার লোকটার দিকে।

'দেশের জন্যে কাজ তো সবাই করতে চায়,' ওদের হয়ে জবাব দিলেন মেরিচাচী।

'মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্যে ওদেরকে চাই আমরা,' প্রথম লোকটা বলল। 'প্রথমে ওদের লিখিত পরীক্ষা নেব আমরা। তারপর ডাক্তারদের সঙ্গে ওদের ইন্টারভিউ। এবং, তারপর অবশ্যই সার্জারি।'

'সার্জারি?' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মেরিচাচীর কণ্ঠ।

'হ্যাঁ। ওদের মগজ থেকে কিছু কোষের নমুনা নিতে চান ডাক্তাররা।'

সতেরো

আর শোনার অপেক্ষা করল না মুসা। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল ওরা। খোলা দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। ওর ভয়টা সংক্রমিত হলো রবিন আর কিশোরের মাঝেও।

দুড়দাড় করে সামনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে বেড়ার দিকে দৌড় দিল তিনজনে।

পেছন পেছন চিৎকার করতে করতে ছুটল ডন, 'আরে দাঁড়াও দাঁড়াও! মুসাভাই, তোমার ফ্রিসবিটা নেবে না?'

ফিরেও তাকাল না ওরা। ছুটতেই থাকল। পাতাবাহারের বেড়ার একটা ফোকরে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে মুচড়ে মুচড়ে বেরিয়ে চলে এল অন্যপাশে। থামল না। দৌড়াতেই থাকল।

পড়শীদের বাড়ি পেরোল। মোড় নিয়ে ছুটল আরেক দিকে। পেছনে জুতোর শব্দ। ডাকতে ডাকতে আসছে সেই দু'জন লোক। সামনে আরেকটা বাড়ি।

পাতাবাহারের পুরু বেড়ার ওপাশে ঘন ঝোপ। সোজা তার মধ্যে গিয়ে ডাইভ দিয়ে পড়ল মুসা। রবিন আর কিশোরও ঢুকল ওর পেছন পেছন।

কিন্তু এখানেও নিরাপদ নয় বুঝতে পেরে লাফিয়ে উঠে আবার দিল দৌড়। বাড়ির আঙিনা পার হয়ে বেরিয়ে এল একটা সরু গলিতে। ছুটল সেটা ধরে। মেইন রোডের দিকে।

মেইন রোডে ওঠার আগে আবার মোড় নিল। গোটা ছয়েক ব্লক পেরোনোর পর দম নেয়ার জন্যে থামল। ফোঁস ফোঁস করে হাঁপাচ্ছে। হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক। হাঁটুতে ভর দিয়ে বাঁকা হয়ে হাঁপাতে লাগল কিশোর। বসে পড়ল রবিন। মুসা কোমরে হাত দিয়ে হাঁপাচ্ছে।

'ব্যাটারা আসছে নাকি?' হাঁপানোর ফাঁকে কোনমতে বলল রবিন।

ফিরে তাকাল মুসা। 'না। দেখতে তো পাচ্ছি না।' সামনের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল পরিচিত একটা বাড়ি। 'আরে, রয়দের বাড়ির কাছে চলে এসেছি!'

কোন রকম দ্বিধা না করে বাড়িটার দিকে দৌড় দিল ওরা। একছুটে ঢুকে পড়ল পেছনের আঙিনায়। পেছনের একটা জানালায় এসে থাবা দিতে দিতে চিৎকার করে ডাকল মুসা, 'এই, বাড়ি আছো? রয়?'

কয়েক সেকেন্ড পর দরজা খুলে দিল রয়। তিন গোয়েন্দাকে দেখে চোখ বড় বড় হয়ে গেল। 'তোমরা?'

'হ্যাঁ, রয়,' হাঁপানো বন্ধ হচ্ছে না মুসার। না জিরালে আর হবে কি করে। 'ভেতরে আসতে পারি? তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছি আমরা।'

'অ্যাঁ!...হ্যাঁ, এসো না, এসো।' সরে ঢোকার জায়গা করে দিল রয়। রান্নাঘরে নিয়ে এলো কিশোরদেরকে। সেখানে শারিয়া আর ইমাকে বসে থাকতে দেখা গেল। টেবিলে বইখাতা ছড়ানো। তিন গোয়েন্দাকে দেখে ওরাও অবাক।

'দরজাটা লাগিয়ে দাও,' রয়কে অনুরোধ করল কিশোর।

'ঘটনাটা কি?' রয় জিজ্ঞেস করল।

শ্রাগ করল কিশোর। শার্টের বোতাম খুলে দিল। ঘেমে নেয়ে গেছে। কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে।

'আমরা পালিয়ে এসেছি,' কিশোর বলল। 'আর কোন উপায় না দেখে শেষে তোমাদের বাড়িটায় ঢুকে পড়েছি।'

টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল সে। বইখাতাগুলোর দিকে তাকাল। 'কি করছ? স্কুলের পড়া?'

একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল শারিয়া। তারপর জবাব দিল, 'ইতিহাস পড়ছি। ভীষণ কঠিন। মনে হচ্ছে সারা সেমিস্টার ধরে পড়েও শেষ করতে পারব না।'

মুখ থেকে বের করে গোলাপী রঙের একটা বাবলগামের বেলুন বানাল ইমা। এক মুহূর্ত ঠোঁটে আটকে রেখে আবার ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলল। 'তোমরা কি স্কুলে ফেরত যাচ্ছ?'

'যেতে পারি,' কিশোর বলল। 'জানি না এখনও।'

আবার এক মুহূর্তের নীরবতা। কিশোরদেরকে তার বাড়িতে দেখে ভ্যাবাচ্যাকা

এগোতে যাবে, হঠাৎ পাশের একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল মাজুল আর গাজুল।

আঠারো

হাঁ করে তাকিয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। বুঝতে পারছে না এই দু'জন আবার কারা। অন্য কোন ব্রেন রিসার্চ ইনস্টিটিউটের লোক না তো? এরা আবার মগজের কোন অংশটা চায়?

পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে শুরু করল লোকগুলো। ভঙ্গিটা কেমন যান্ত্রিক। ধীরে ধীরে পা ফেলছে। একতালে। একসঙ্গে।

কিশোরের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ করে দিল ওকে। বলে দিতে লাগল, লোকগুলো বিপজ্জনক।

সামনে এসে দাঁড়াল গাজুল আর মাজুল।

'কে আপনারা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'তোমাদের নতুন প্রভুর চর,' দু'জনের মধ্যে লম্বা লোকটা, গাজুল বলল।

'আমাদের মনিবের সেবা করার জন্যে নিয়ে যাব তোমাদেরকে,' মাজুল বলল। 'গোলাম বানাব তোমাদের।'

'গোলাম!' লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। কারা ওরা? এ প্রশ্নের জবাব তার অতি বুদ্ধিমান মগজও দিতে পারছে না। 'রসিকতা করছেন, তাই না?'

'আমরা রসিকতা করি না,' শীতল কণ্ঠে জবাব দিল গাজুল।

'অন্য কোন গ্রহ থেকে এসেছেন নাকি আপনারা?' মুসা জিজ্ঞেস করল ভয়ে ভয়ে। 'কণ্ঠস্বর অমন কেন? কেমন যান্ত্রিক। সিনেমায় দেখা রোবটগুলোর মত।'

'না, আমরা ভিনগ্রহবাসী নই, এই পৃথিবীরই মানুষ। তোমাদের কথাবার্তাই তো বরং আমাদের কাছে বিশ্রী লাগছে। কেমন আদিম আদিম। তোমাদের শোধরাতে সময় লাগবে। তবে শোধরাতে পারব। একবার আমাদের ঘাঁটিতে নিয়ে নিই। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।'

লোকগুলো রসিকতা করছে না, বুঝতে পারল কিশোর। পালানোর তাগিদ অনুভব করল।

আচমকা নড়ে উঠল সে। রবিনের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে চিৎকার করে বলল, 'মুসা, পালাও!'

তিনজন তিন দিকে দৌড় মারল ওরা। প্রাণপণে ছুটতে লাগল।

কিছুদূর এসে পেছনে পায়ের শব্দ না শুনে ফিরে তাকাল মুসা।

'কিশোর, ওরা আসছে না!'

ফিরে তাকাল কিশোর আর রবিন।

আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে লোকগুলো। চেহারাতেও তেমন কোন ভাবান্তর নেই। রাগ, হতাশা, ক্ষোভ, কোন কিছু নেই। নির্বিকার। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে ওরা যেন জানে কোনমতেই পালাতে পারবে না তিন গোয়েন্দা। ধরা পড়বেই।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত স্থির তাকিয়ে থেকে ঘুরে দাঁড়াল আবার কিশোর। হাঁটতে শুরু করল।

'কোথায় যাবে?' রবিনের প্রশ্ন।

'বাড়িতে।'

'কিন্তু লোকগুলো? রসিকতা করছিল?'

'না। আমাদেরকে ধরার নতুন কোন ফন্দি আঁটছে ওরা। বুঝতে পারছি না কি করবে!'

স্যালভিজ ইয়ার্ডের পেছনের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল ওরা।

সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল মেরিচাচীকে।

গাড়ির চাবি হাতে গ্যারেজের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন রাশেদ পাশা।

নেমে এলেন মেরিচাচী। কিশোরের সামনে দাঁড়ালেন। 'এত দেরি করলি কেন?'

'আবার দুটো লোক আমাদের ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল,' জবাব দিল কিশোর।

'কারা ওরা?'

'কি জানি! অদ্ভুত নাম, গাজুল আর মাজুল। বলল ওদের মনিবের জন্যে আমাদের নিয়ে যেতে চায় ওরা। গোলাম বানাবে।'

চট করে রাশেদ পাশার দিকে তাকালেন মেরিচাচী। 'কি কাণ্ডই না শুরু হলো। যন্ত্রণা! এর একটা বিহিত করা দরকার। পুলিশে ডায়ারি করাব নাকি? কি বলো?'

'দেখা যাক,' চিন্তিত ভঙ্গিতে গাল চুলকালেন রাশেদ পাশা। 'আগে স্কুলের সমস্যাটার একটা ফয়সালা করে আসি। কিশোর, তোরা ভেতরে যা। আমরা না আসা পর্যন্ত ঘর থেকে বেরোবি না। কাউকে ঢুকতে দিবি না। কারও সঙ্গে কথা বলবি না। যে-ই আসে আসুক।'

পেছনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল তিনজনে।

চকলেটের গন্ধ আসছে।

খিদেটা চাগিয়ে উঠল মুসার। 'নিশ্চয় কেক বানাচ্ছিলেন আন্টি। দেখো তো, কোথায় আছে?'

'এই যে, এখানে,' কাউন্টারের ওপাশ থেকে জবাব এল। মাথা তুলল ডন। একটা ট্রে বের করে কাউন্টারের ওপরে রাখল। তাতে ইয়া বড় এক কেক। এক টুকরো কেটে নিয়ে আয়েশ করে চিবাচ্ছে সে।

এত দৌড়াদৌড়ি ও এত পরিশ্রম গেছে যে, কিশোর আর রবিনেরও খিদে

লেগেছে। কেকটা দেখে আর সহ্য হলো না। দৌড়ে গেল তিনজনেই। ঝাঁপিয়ে পড়ল কেকের ওপর।

দেখতে দেখতে সাবাড় করে ফেলল অত বড় কেকটা।

রেফ্রিজারেটর থেকে কোকের বোতল বের করল কিশোর। তিনটে গ্লাসে ঢালল। রবিন আর মুসার হাতে একটা করে গ্লাস তুলে দিয়ে নিজে নিল তৃতীয়টা। ডনকে বলল, 'তুমি খেতে চাইলে ঢেলে নাও।'

রবিন বলল কিশোরকে, 'চলো, লিভিং রূমে গিয়ে বসি। সিনেমা-টিনেমা দেখে সময় কাটাই।'

কিন্তু লিভিং রূমে ঢুকেই থমকে দাঁড়াতে হলো ওদের। হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে গাজুল আর মাজুল।

মাজুলের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করল গাজুল।

মুহূর্তে ডনের পাশে চলে এল মাজুল। তার কলার চেপে ধরল। লাফ দিয়ে ডান হাতে বেরিয়ে এসেছে একটা পিস্তলের মত জিনিস। সেটা তুলে তাক করল একটা পাথরের ফ্লাওয়ার ভাসের দিকে। টিপে দিল ট্রিগার।

আগুনে পানি পড়লে ছ্যাঁৎ করে যেমন শব্দ হয়, তেমনি একটা শব্দ করে মুহূর্তে নেই হয়ে গেল জিনিসটা। একেবারে গায়েব।

হাঁ হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

'তাহলে বুঝলে তো,' হাসিমুখে বলল গাজুল, 'তোমাদেরও কি অবস্থা করতে পারি আমরা। কিন্তু করব না। কারণ গোলাম বানানোর জন্যে বহু কষ্টে তোমাদের খুঁজে বের করেছি আমরা। গোলাম হওয়ার উপযুক্ত বানিয়েছি। বোকা থেকে বুদ্ধিমান বানিয়েছি। এখন তোমরা আমাদের কাছে মূল্যবান। তবে তাই বলে ওই বাচ্চা ছেলেটাকেও কিছু করব না, তা ভেবো না। আমাদের কাছে ওর এক কানাকড়ি দাম নেই।'

পিস্তলটা ডনের মাথায় ঠেকিয়ে চাপ দিল মাজুল।

ব্যথা লাগল। চিৎকার করে উঠল ডন। লাথি মারল মাজুলের হাঁটুতে।

পা'টা সরিয়ে নিল মাজুল। ব্যথা পেল কিনা বোঝা গেল না। কারণ টুঁ শব্দও করল না সে। তবে পিস্তলের নলের মুখটা আরও ঠেসে ধরল ডনের মাথায়।

ব্যথায় ককাতে লাগল ডন।

পা বাড়াল মুসা।

'উঁহু,' আঙুল নেড়ে সাবধান করল গাজুল, 'কোন কিছু করার চেষ্টা করলে ও মারা যাবে,' ডনকে দেখাল সে। 'ও মরে যাবার পরও তোমাদেরকে ছাড়া হবে না। হয় আমাদের কথা মানবে, নয়তো মরবে।'

'কি করতে বলেন আমাদের?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কোন রকম ঝামেলা না করে আমাদের সঙ্গে চলো,' গাজুল বলল।

'কোথায়?'

'যেখানে আমি নিয়ে যাব।'

আরেকবার ডনের দিকে তাকাল কিশোর। মাজুলের হাতের পিস্তলটার দিকে

তাকাল। 'শুধু আমি গেলে হয় না?'

'না, তোমাদের তিনজনকেই যেতে হবে।'

রবিন বলল, 'ঝামেলা বাধিয়ে লাভ নেই, কিশোর। তুমি গেলে আমিও যাব। ডন বাঁচুক।'

'আমিও যাব,' দ্বিধা না করে বলল মুসা।

হাসি ফুটল গাজুলের মুখে। 'মানুষদের এ ধরনের আন্তরিকতাগুলো আমাকে অবাক করে। কেমন বোকার মত অন্যের জন্যে প্রাণ দিতে রাজি হয়ে যায়। যাকগে, আমার কি।' মাজুলের দিকে তাকাল সে। 'মাজুল, আমি ও-কে না বলা পর্যন্ত এখানে থাকো। ওকে আটকে রাখো। আমি ওদের নিয়ে যাচ্ছি। ও-কে বললে তুমিও চলে আসবে।'

'এটাকে কি করব?' ডনের কথা জিজ্ঞেস করল মাজুল।

'তোমার যা খুশি,' গাজুল বলল।

'তাহলে আমরা যাব না,' সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে বসল কিশোর। 'ওকে বাঁচানোর জন্যে আমরা যেতে রাজি হয়েছি। আমাদেরকে কথা দিতে হবে ডনের কোন ক্ষতি হবে না।'

এক মুহূর্ত ভাবল গাজুল। ঘাড় কাত করল। 'ঠিক আছে, কথা দিচ্ছি। ছেলেটার কোন ক্ষতি হবে না। এখন চলো।'

'আপনার কথার বিশ্বাস কি?'

'আমরা কথা দিলে কথা রাখি, এটাই আমাদের নিয়ম। সেজন্যে ভেবেচিন্তে কথা দিই। নাও, চলো তো এখন, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

উনিশ

বাইরের আঙিনায় একটা কালো কাঁচে ঢাকা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

কিশোর, মুসা আর রবিনকে এনে সেটাতে তুলল গাজুল। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল।

ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে গাড়ির গতি যতটা সম্ভব বাড়িয়ে দিল গাজুল। শহর থেকে বেরোতে সময় লাগল না। সোজা চলল বুনো অঞ্চলের দিকে।

বনের মধ্যে ঢুকল গাড়ি। আঁকাবাঁকা কাঁচা রাস্তা পার হয়ে এসে ঢুকল বনের মাঝখানের এক টুকরো খোলা জায়গায়।

গাড়ি থেকে তিন গোয়েন্দাকে নামতে বলল গাজুল।

অবাক হয়ে কিশোর দেখল, খোলা জায়গাটায় বিশাল একটা গোলকের মত জিনিস দাঁড়িয়ে আছে। আটটা পা। গায়ে নাম লেখা: **টাইম ট্র্যাভেল-৭।**

নামটা স্মৃতির পাতায় কোথায় যেন অনুরণন তুলল। চেনা চেনা মনে হচ্ছে তার, কিন্তু চিনতে পারছে না গোলকটাকে। কোথায় দেখেছে এ জিনিস? মনে করতে পারল না।

গোলকের কাছে তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে এল গাজুল। মোবাইল ফোনের মত একটা যন্ত্র বের করে কথা বলল। গুঞ্জন উঠল গোলকের ভেতরে। আট পায়ের মাঝখানে একটা গোল চাকতির মত ঢাকনা খুলে গিয়ে ঝুলে পড়ল ধীরে ধীরে। মই নেমে এল গোলকের পেটের ভেতর থেকে। সেটা বেয়ে উঠে যেতে আদেশ করল গাজুল।

উঠে গেল তিন গোয়েন্দা। জিনিসটাকে স্পেসশিপের মত লাগল ওদের কাছে। ভেতরে আলো এত উজ্জ্বল, চোখ মিটমিট করতে লাগল ওরা।

চারপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগল কিশোর। ছোট ছোট ডজনখানেক খুপরিমত চোখে পড়ল। এমন করে সাজানো, মৌচাকের মত দেখতে। মৌচাকের ভেতরে যেমন খুপরি করা থাকে।

গাজুলকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল তারই মত আরেকজন। ধাক্কা দিয়ে দিয়ে নিয়ে গিয়ে তিন গোয়েন্দাকে ঢোকাল একটা কিউবের মত দেখতে চারকোনা ঘরে। জেলখানার দরজার মত দরজাটা ঠেলে দিল। রূপালী রঙের শিকগুলো ঝলমল করছে। মৃদু আলোকিত টিউব লাইটের মত। তালা লাগানোর শব্দ কানে এল ওদের।

'এ তো দেখি খাঁচার মধ্যে এনে ভরেছে আমাদের,' মুসা বলল। 'জানোয়ারের খাঁচা।'

রূপালী রঙের একটা সরু গলি ধরে চলে গেল লোকগুলো। খাঁচার দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল গোয়েন্দারা। তীব্র আলো চোখে সইয়ে নেয়ার অপেক্ষা করছে। বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে হৃৎপিণ্ডটা।

'নিশ্চয় এখুনি উড়াল দেবে এই জিনিসটা,' রবিন বলল। 'আর কোনদিন আমরা আমাদের বাড়িঘর দেখতে পাব না। বাবা-মা, বন্ধু-বান্ধব কাউকে দেখব না।' শেষ দিকে ভারী হয়ে এল তার কণ্ঠস্বর।

বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে মুসা বলল, 'তবু যাই হোক, ডনকে তো বাঁচাতে পারলাম। কি বলো, কিশোর?'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল শুধু কিশোর।

'সত্যি কি বাঁচাতে পারলাম?' রবিনের প্রশ্ন। 'কি মনে হয় তোমার, কিশোর, মাজুল আর গাজুল কথা রাখবে?'

'শিওর হওয়ার তো কোন উপায় নেই। তবু ভালটাই আশা করি। ধরে নিলাম রাখবে।'

'তা তো বুঝলাম,' দুই হাতে শিক চেপে ধরল রবিন। 'কিন্তু আমাদের কি হবে এখন?'

'এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার একটা উপায় বের করতেই হবে আমাদের,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'একবার এটা উড়ে গেলে বাড়ি ফেরার পথ চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে যাবে আমাদের।'

চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল খাঁচাটার চারপাশে তাকাল সে। যে দরজাটা দিয়ে ঢুকেছে ওরা সেটা ছাড়া বেরোনোর আর কোন দরজা নেই। আছে কেবল খাঁচার

পর খাঁচা, ওপরে, নিচে, চারপাশে মুরগীর খাঁচা একটার ওপর আরেকটা যেমন করে সাজিয়ে রাখা হয় সে-ভাবে।

দরজার শিকগুলোতে হাত বুলিয়ে দেখল কিশোর। এমন ভাবে মিশে রয়েছে, দেখাই যায় না কোথায় আছে। হাত বোলাতে বোলাতে বলে উঠল সে, 'দাঁড়াও দাঁড়াও, কোথায় আছে বুঝতে পারছি!'

দরজার শিক ধরে টান দিল সে। ঠেলা দিল। ঝাঁকি দিল। পাশে ঠেলে সরানোর চেষ্টা করল। প্রথমে ডানে, তারপর বাঁয়ে।

'নাহ্, নাড়াতেই পারছি না,' জোরে এক নিঃশ্বাস ফেলে বলল সে।

'তিনজনে মিলে ঠেললে কেমন হয়?' মুসা বলল।

'উঁহু, লাভ হবে না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'নিরেট ধাতু। কিছুই করতে পারব না। তার ওপর রয়েছে তালা। আর মজার ব্যাপারটা হলো, তালাটা দেখতেও পাচ্ছি না আমরা। কিন্তু জানি, আছে ওটা ওখানে। কোন হুড়কো-টুড়কোও দেখা যাচ্ছে না, দেখো।'

ভুরু কুঁচকে বলল রবিন, 'কিছুই করতে পারছি না। অথচ মজাটা দেখো, অতি বুদ্ধিমান হওয়ার কারণে স্কুল থেকেই বের করে দিল আমাদেরকে। বুদ্ধিমান হয়ে তাহলে লাভটা কি হলো?'

'লাভ হবে,' কিশোর বলল। 'ভাবতে থাকলে।'

'তাহলে ভাবছ না কেন?'

উজ্জ্বল শিকগুলোর ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকাল কিশোর। গাজুলকে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল। কখন কোনখান দিয়ে এসে উদয় হয়েছে বুঝতেও পারেনি গোয়েন্দারা। ঠিক তার পেছনে মাজুলকে উঁকি দিতে দেখল কিশোর।

গাজুল বলল, 'আমাদের কথা আমরা রেখেছি। ছেলেটাকে ছেড়ে দিয়ে এসেছে মাজুল। এখন আমরা রওনা হব। স্নায়ু শান্ত করো। আমাদের যদি শোনাতে না চাও জোরে কথা বলবে না। এতক্ষণ যা যা বলেছ, কন্ট্রোল প্যানেল থেকে সব শুনতে পেয়েছি আমরা।'

'আমাদের ছেড়ে দিন,' হাতজোড় করে অনুরোধ করল মুসা। 'দোহাই আপনাদের। আমরা গোলাম হতে পারব না।'

'হ্যাঁ, ঠিক,' তার সঙ্গে সুর মেলাল কিশোর। 'ভাল গোলাম আমরা কোনদিনই হতে পারব না। বেকার ধরে নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের। আপনাদের মনিব আমাদের পেয়ে মোটেও খুশি হবেন না। বরং প্রচণ্ড রেগে যাবেন। আপনারা জানেন না, আমাদের স্বভাব-চরিত্র একটুও ভাল না। কাজ করতে ইচ্ছে করে না আমাদের। কেউ আমাদের কথা শোনাতে পারে না। সব সময় খালি কুচিন্তা ঘোরে আমাদের মগজে। ক্ষতিকর চিন্তা। এ রকম শয়তান মানসিকতার কাউকে দিয়ে কি আর গোলামের কাজ করানো যায়?'

'কিন্তু আমরা করাব,' গাজুল বলল। 'গোলামদের কি ভাবে কাজ করাতে হয় জানা আছে আমাদের।'

মাজুলকে নিয়ে চলে গেল সে।
নিজেদের সম্পর্কে এত এত খারাপ কথা বলেও লাভ হলো না। গুঙিয়ে উঠল কিশোর।
শিক চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইল তিনজনে।
'আর কিছু করার নেই, কি বলো?' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল মুসা। 'কোনই লাভ হলো না। কিছুই করতে পারব না আমরা।'
'কিন্তু উপায় আছে কিনা ভাবতে দোষ কি?' রবিন বলল। 'অতি বুদ্ধিমান হয়ে গেছি আমরা। বুদ্ধি খরচ করে যদি নিজেদের বাঁচাতেই না পারলাম, তাহলে আর এ বুদ্ধি দিয়ে করবটা কি?'
স্থির দৃষ্টিতে রবিনের দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল কিশোর। 'ঠিক। কাজেই যদি না লাগল এত বুদ্ধি দিয়ে করবটা কি? এই বুদ্ধির জন্যেই যত যন্ত্রণা। আজ আমাদের এই দুরবস্থা। গোলাম বানানোর জন্যে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাদেরকে।'
মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল তার দুই সহকারী।
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরব হয়ে রইল তিনজনে। তাকিয়ে রইল ওদের সামনের রূপালী রঙের মৌচাকের মত খুপরিগুলোর দিকে।
তারপর ঘুরে তাকাল রবিন। বিড়বিড় করে বলল কিশোরকে, 'ভাবো। ভেবে বের করো না কিছু।'
'নাহ্,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে জবাব দিল কিশোর, 'কোন উপায় দেখছি না। কিছুই বের করতে পারছি না। কিচ্ছু না। তোমরা চেষ্টা করো না।'
'তুমি পারছ না আর আমরা পারব কোত্থেকে?' হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বলল মুসা।
'আমি এখন ভাবতেই পারছি না কিছু,' কিশোর বলল। 'মগজের ভেতরটা কেমন ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। স্পষ্ট হচ্ছে না কিছু। এই গোলকযানটাতে ঢোকার পর থেকেই ধীরে ধীরে ভারী হয়ে যাচ্ছে মাথাটা।'
কিশোরের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রবিন। কি বুঝল কে জানে। ঢোক গিলল। চোখ বড় বড় হয়ে গেল। চিৎকার করে উঠল হঠাৎ, 'আমারও হচ্ছে এ রকম! মগজের ওষুধ! নিশ্চয় কার্যকারিতা হারাচ্ছে! শেষ হয়ে যাচ্ছে ওষুধের ক্ষমতা!'
কাঁপতে শুরু করল খাঁচাটা। দুলতে শুরু করল। ঢেউয়ের মধ্যে পড়া নৌকার মত। পেছনে শোনা গেল ইঞ্জিনের জোরাল গর্জন। শক্ত করে শিক চেপে ধরল ওরা।
থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে পুরো গোলকটা।
'উড়াল দিচ্ছে এটা!' চিৎকার করে উঠল মুসা। 'উড়ে যাচ্ছে! এখন কি করব?'

বিশ

'ওখানে নেমে হয়তো ওদের বোকা বানাতে পারব,' কম্পিত কণ্ঠে বলল মুসা। 'হয়তো কথা বলতে পারব ওদের মনিবের সঙ্গে। বাড়ি পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করব। পাঠিয়ে দিতেও পারেন।'

'কি কারণটা আছে দেয়ার?' খাঁচার রূপালী শিকে কপাল ঠেকিয়ে বলল কিশোর, 'মোটেও বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে না আর নিজেকে। স্পষ্ট করে কিছুই ভাবতে পারছি না। কিছু বুঝতেও পারছি না।'

'বুঝতে তো আমিও পারছি না,' রবিন বলল। 'কেন এমন হচ্ছে? বেশি ভয় পাওয়ার জন্যে? গাজুল ঠিকই বলে গেছে—যদি শান্ত হতে পারি আমরা, স্নায়ুকে শান্ত করতে পারি, হয়তো···' কথা শেষ না করেই চুপ হয়ে গেল সে।

ওর দিকে তাকিয়ে থেকে মুসা বলল, 'আমাদেরকে অতি বুদ্ধিমান বানানোর চেষ্টা করেছিল ওরা। নামার পর যখন দেখবে আবার বোকা হয়ে গেছি আমরা, কি করবে তখন? মেরে ফেলবে? নাকি বাড়ি পাঠিয়ে দেবে?'

জবাব দেয়ার সময় পেল না রবিন কিংবা মুসা।

মাজুল এসে হাজির হয়েছে খাঁচার সামনে। গর্জে উঠে বলল, 'তোমাদের মিথ্যে কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে আমাদের। কি ভেবেছ তোমরা? মিথ্যে বলে আমাদের ফাঁকি দিতে পারবে? একটা কথা জেনে রাখো, মগজশক্তি রসায়নের কার্যকারিতা কখনও কমে না, মরার আগে কোনদিন কমবে না। অতএব ভাঁওতাবাজি বন্ধ করো।'

'কিন্তু, আপনি বুঝতে পারছেন না,' কিশোর বলল, 'আমাদের বেলায় কমেছে···'

'চুপ, গোলামের দল!' ধমকে উঠল মাজুল। 'আমাদের বোকা বানাতে পারবে না।' কতগুলো কাগজ খাঁচার ফাঁক দিয়ে ঠেলে দিল সে।

কাগজগুলো হাতে নিল কিশোর। বোকার মত তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'কি এগুলো?'

'দেখতে পাচ্ছ না? ধাঁধা,' মাজুল বলল। 'মগজকে ব্যস্ত রাখো। বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হবে।'

নিরাসক্ত ভঙ্গিতে কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। 'কি করে আপনার ধারণা হলো, এ সব ছাইপাঁশ আমাদের ভাল লাগবে?'

'ভাল লাগুক বা না লাগুক, তোমাদেরকে এগুলোর সমাধান করতেই হবে,' একঘেয়ে কণ্ঠে বলল মাজুল। 'মগজটাকে সাফ রাখতে হবে তোমাদের। ভোঁতা মগজ একদম পছন্দ করেন না আমাদের মনিব।'

'কিন্তু···কিন্তু আমরা তো···'

'ওসব বুঝিটুঝি না। করতেই হবে তোমাদেরকে।'

'মস্ত বড় একটা ভুল করছেন আপনারা,' রবিন বলল। 'অকারণে আমাদের টেনে না নিয়ে গিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে আসুন। আমাদেরকে দিয়ে কোন উপকার হবে না আপনাদের। কোন কাজ হবে না। গোলাম হওয়ার উপযুক্ত নই আমরা।'

জবাব দিল না মাজুল। ঘুরে রওনা হয়ে গেল। ফিরে গেল কন্ট্রোল ডেকে।

'ও…ও আমাদেরকে বিশ্বাস করল না,' গুঙিয়ে উঠল কিশোর। 'সত্যিই যে ওষুধের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বিশ্বাস করানো গেল না ওকে।'

'কি করব আমরা এখন?' কেঁদে ফেলবে যেন রবিন।

মাথায় হাত দিয়ে চুপচাপ বসে থাকল মুসা। কোন কথা বলল না।

প্রথম ক্রসওয়ার্ড পাজলটার দিকে তাকাল কিশোর। পড়ে শোনাল রবিন আর মুসাকে। বলল, 'চার অক্ষরের শব্দ, উল্টো দিকে যেতে হবে।'

চিবুক ডলল রবিন। 'হুঁম!' অনেকক্ষণ ধরে ভাবল। 'সূত্রটা কি বলো তো আবার। ভুলে গেছি।'

'ভুলে তো যাবেই, এত কঠিন। আমিও মাথামুণ্ড কিছু বুঝতে পারছি না। দূর বাদ দাও এটা। দেখি তো পরেরটা…'

গলা বাড়িয়ে দেখল রবিন। 'তিন অক্ষরের…এই, মুসা, দেখো না পারো নাকি।'

'পারব তো না-ই, আমার দেখতেও ইচ্ছে করছে না,' নিরাসক্ত গলায় বলে চোখ ফিরিয়ে আরেক দিকে তাকিয়ে রইল মুসা।

নীরব হয়ে গেল তিনজনে।

কিন্তু হাল ছাড়ল না কিশোর। কাগজটার দিকে তাকিয়ে থেকে বিড়বিড় করল, 'ডগ দিয়ে শুরু করলে কেমন হয়? ডগ মানে কুকুর।'

হাতের পেন্সিলটা নামিয়ে কাগজে 'ডগ' শব্দটা লিখতে গিয়ে থেমে গেল সে। 'কোনটাতে লিখব? সাদা ঘরটায় না কালো ঘরটায়?'

'মনে হয় সাদা ঘরটায়,' রবিন বলল। 'না না, কালো ঘরটায়। ধূর, বুঝতে পারছি না। এক কাজ করো। সাদাটাতেই লেখো।'

পেন্সিল নামাল আবার কিশোর। খসখস করে ঘষল কাগজে। 'আরি, লেখা বেরোচ্ছে না কেন?'

'বেরোবে কি করে? ধরেছই তো উল্টো করে,' রবিন বলল।

'আমি আগেই দেখেছি,' তিক্ত হাসি হেসে বলল মুসা। 'ইরেজারের দিকটা দিয়ে লেখা শুরু করেছে সে।'

'তাহলে বললে না কেন?' কিশোর বলল।

'ইচ্ছে করল না।'

চোখের পাতা সরু করে পেন্সিলের পেছনে লাগানো রবারটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। বিড়বিড় করে বলল, 'ইরেজার কি জিনিস?'

চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল রবিন। 'তাই তো! আমিও তো জানি না।'

কিশোরের হাত থেকে কাগজ আর পেন্সিল খসে পড়ে গেল। করুণ কণ্ঠে বলে উঠল, 'আবার বোকা হয়ে গেছি আমরা!... আগের চেয়ে হাঁদা!'

কেঁপে উঠল রবিন। কান্নার স্বরের মত ফোঁপানি বেরিয়ে এল গলা থেকে। 'কোন সন্দেহ নেই তাতে। ওষুধের ক্রিয়া শেষ হয়ে গেছে। মস্ত ক্ষতি করে দিয়ে গেছে আমাদের। একেবারে বোকা বানিয়ে ফেলেছে।'

আতঙ্কিত হয়ে পড়ল কিশোর। জোরে জোরে মাথা নাড়তে শুরু করল। 'কি করব আমরা এখন? এতটাই বোকা হয়ে গেছি পালানোর কোন বুদ্ধিই আর কোনদিন বের করতে পারব না।'

ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করল রবিন।

তার কান্না দেখে মুসারও কান্না পেতে লাগল। মুখটাকে করুণ করে তুলে কিশোরকে জিজ্ঞেস করল, 'বেরোব কি ভাবে আমরা এখন? বুদ্ধি ঘোলা হয়ে গেছে। বাঁচার তো কোন উপায়ই আর বের করতে পারব না!'

একুশ

দেয়ালে হেলান দিয়ে ধাতব মেঝেতে বসে থাকল ওরা। চোখে শূন্য দৃষ্টি।

খাঁচার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল গাজুল আর মাজুল।

'পৌঁছে গেছি আমরা,' গাজুল জানাল।

এমন ভঙ্গিতে কিশোর, মুসা আর রবিন তিনজনেই মাথা ঝাঁকাতে লাগল যেন সদ্য ঘুম থেকে উঠেছে।

'কখন নামলাম?' মুসার প্রশ্ন। 'কোন শব্দ তো শুনলাম না। ঝাঁকুনি তো লাগল না।'

'কতক্ষণ লাগল আসতে?' রবিন অবাক। 'কখন রওনা হয়েছি, মনে করতে পারছি না।'

হাতঘড়ির দিকে তাকাল কিশোর। 'এ জিনিসটা দিয়ে সম্ভবত সময় মাপা যায়। কিন্তু কি ভাবে মাপতে হয়, ভুলে গেছি।'

খপ করে কিশোরের হাত চেপে ধরল রবিন। চোখের সামনে তুলে ধরে বলল, 'একটা বড় কাঁটা দেখা যাচ্ছে। আরেকটা ছোট কাঁটা। কোনটা দিয়ে কি হয়, বলো তো?'

'হেই, বাজে বোকো না!' ধমকে উঠল গাজুল। 'তোমাদের বকবকানি শোনার সময় আমাদের নেই। মনে করেছো তোমাদের চালাকি আমরা ধরতে পারিনি। খুব ভালমতই পেরেছি। আমরা জানি কতখানি বুদ্ধিমান তোমরা।'

খাঁচার একটা শিক চেপে ধরল গাজুল। তালা খোলার শব্দ হলো। এক ধরনের গুঞ্জন। তারপর পিছলে সরে গেল কয়েকটা শিক লাগানো একটা ফ্রেম। খুলে গেল দরজা।

জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে গাজুল আর মাজুল।

'আমি খুব উত্তেজিত বোধ করছি,' মাজুল বলল।

'আমিও করছি,' গাজুল বলল। 'আর উত্তেজিত হবই না বা কেন। এত চমৎকার তিনটে গোলাম নিয়ে এসেছি মনিবের জন্যে। তিনি ভীষণ খুশি হবেন।'

'উত্তেজিত আমরাও হচ্ছি,' কিশোর বলল। 'মনিব দেখব। কখনও তো দেখিনি। তা ভাই মনিব জিনিসটা কোন ধরনের জীব? শিং আছে? লেজ কয়টা?'

রবিন বলল, 'তাই তো! মনিব দেখব।' বাচ্চা মেয়ের মত হাততালি দিতে লাগল, 'কি মজা! কি মজা!' মুসার দিকে তাকাল। 'মুসা, তোমার আনন্দ লাগছে না?'

'না,' ভয়ে ভয়ে বলল মুসা। 'যদি কামড়ে দেয়?'

'চুপ! চুপ করো!' গর্জে উঠল গাজুল। 'বেরোও। এসো আমাদের সঙ্গে। আমাদের প্লেন ল্যান্ড করেছে মনিবের গম্বুজের ভেতরে। বেরোতে বেশি দেরি করলে মনিব ভীষণ রেগে যাবেন।'

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'গম্বুজের ভেতরে! বলেন কি! ঢুকল কি করে?'

'সে গেলেই দেখতে পাবে,' গর্বের সঙ্গে জবাব দিল গাজুল। পরক্ষণে বদলে গেল মুখের ভাব। ধমক দিয়ে বলল, 'খবরদার, বেশি কথা বলবে না। তোমাদের মনে রাখা উচিত, তোমরা গোলাম। কোন প্রশ্ন করবে না। কৌতূহল দেখাবে না। কথা বলতে যখন বলা হবে শুধু তখনই বলবে। মনে থাকবে?'

'নাহ্, থাকবে না,' জোরে নিঃশ্বাস ফেলে জবাব দিল কিশোর। 'কি জানি কি হয়ে গেছে আমাদের, কিছুই মনে থাকে না। যাকগে, মন নিয়ে অত চিন্তার কিছু নেই। তা আমাদের কাজটা কি? কি কি গোলামি করতে হবে?'

'মনিবের ব্যক্তিগত গোলাম হিসেবে তোমাদের কাজ হবে তাঁর ল্যাবরেটরিতে থাকা, সারাক্ষণ সহযোগিতা করা। যেহেতু তোমরা অতিবুদ্ধিমান গোলাম, তোমরা তাঁর সমস্ত অংক করে দেবে,' গাজুল বলল। 'কঠিন কঠিন সব ক্যালকুলেশন। অবশ্য সবই কম্পিউটারে। তোমরা…'

আতঙ্কে চোখ বড় বড় হয়ে গেল কিশোরের। 'কম্পিউটার! অংক! এগুলো আবার কি জিনিস?'

তাকে ধমক লাগাল রবিন, 'গাধা নাকি! অংক কি জিনিস বোঝো না? নম্বর, নম্বর। একগাদা নম্বর।'

'নম্বর না, সংখ্যার হিসেব,' অধৈর্য ভঙ্গিতে চিৎকার করে উঠল গাজুল।

'কিন্তু নম্বরের হিসেব তো আমরা কিছুই জানি না,' বোকার মত রবিন আর মুসার দিকে তাকাতে লাগল কিশোর। 'কি ভাবে কি করব, বলো তো? শেষে আমাদেরকে তাড়িয়ে দেবেন মনিব…'

'উঁহু, শিং দিয়ে গুঁতো মারবে,' শুধরে দিল তাকে মুসা। 'গাজুল-মাজুল যে ভাবে মনিবের নামে ভয় পাচ্ছে, আমার মনে হয় তার শিংগুলো খুব চোখা আর বড় বড়…'

'এই থামবে তোমরা!' চিৎকার করে বলল মাজুল। গাজুলের দিকে ফিরল। 'ঘটনাটা কি বলো তো ওদের? এমন করছে কেন?'

'ও কিছু না,' গাজুল জবাব দিল, 'ভয় পেয়েছে। ওদের কথায় কান দিও না। আমরা জানি ওরা কতখানি বুদ্ধিমান। চলো চলো, মনিবের সঙ্গে দেখাটা সেরে ফেলি।'

'হ্যাঁ, চলো।'

তিন গোয়েন্দার দিকে তাকাল গাজুল। 'কি হলো, হাঁ করে দেখছ কি? বেরোতে বললাম না? নাকি লেজারের শক দেয়া লাগবে।'

নির্বোধের মত প্রশ্ন করল কিশোর, 'সেটা আবার কি জিনিস? শিঙের চেয়ে খারাপ?'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মাজুল। 'নাহ্, মনে হচ্ছে ধরে প্রথমে ক্লিনিং রুমে নিয়ে যেতে হবে এগুলোকে। লাল রক্তের ওপর আর আস্থা রাখতে পারছি না আমি।'

'তবে কি নীল রক্তও আছে?' বেফাঁস প্রশ্ন করে ফেলল যেন কিশোর।

'নীল নেই, তবে রুপালী রক্ত আছে। তোমাদের লাল রক্তের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাশালী, নষ্ট প্রায় হয়ই না, আর রাসায়নিক পদার্থ পরিবহনের ক্ষমতাও লাল রক্তের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। সত্যিই যদি তোমরা ভান না করে থাকো, তোমাদের বুদ্ধি কমে গিয়ে থাকে, লাল রক্ত সব ফেলে দিয়ে দেহে রুপালী রক্ত ভরলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। নাও, চলো এখন।'

গোলকযান থেকে ওদেরকে বের করে লম্বা একটা রুপালী হলওয়েতে নিয়ে এল গাজুল-মাজুল। ঘরের সব কিছুই যেন ক্রোম আর আয়নায় তৈরি। গোলকযানটার মতই এখানেও সব কিছু চকচকে, যেন রুপালী আগুনের আভায় জ্বলছে।

হাঁটার সময় পায়ের শব্দ জোরাল হয়ে কানে বাজে। দ্রুত হাঁটছে গাজুল আর মাজুল। ওদের সঙ্গে সমতা রাখার জন্যে রীতিমত দৌড়াতে হলো তিন গোয়েন্দাকে।

চকচকে একটা ডাবল ডোরের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। দাঁড়াতেই আপনাআপনি যেন পিছলে নিঃশব্দে খুলে গেল দরজার পাল্লা। গাজুল-মাজুলের পিছু পিছু রুপালী একটা বড় বাক্সের মধ্যে এসে ঢুকল গোয়েন্দারা।

'এই এলিভেটর আমাদেরকে ক্লিনিং রুমে নিয়ে যাবে,' গাজুল বলল। 'মনে রাখবে, তোমরা গোলাম। কারও সঙ্গে কথা বলবে না তোমরা।'

পেছনে নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ওপর দিকে ওটার টান অনুভব করল কিশোর। বুঝতে পারল ওপরে উঠছে এলিভেটর।

'এত বুদ্ধিমান তিনটে ছেলেকে গোলাম হিসেবে ধরে এনেছি দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না,' খুশি খুশি গলায় গাজুলকে বলল মাজুল। 'মনিব আমাদের ওপর খুব খুশি হবেন। সবাই হিংসে করবে আমাদের। তাই না?'

'তা করবে,' জবাব দিল গাজুল। 'ঝামেলা পাকানোর ওস্তাদ ওরা, বোঝা

যাচ্ছে, তবে গোলাম হিসেবে খারাপ হবে না।'

থামল এলিভেটর। দরজা খুলে গেল। পিঠে ধাক্কা গুঁতো মেরে নামতে আদেশ করা হলো তিন গোয়েন্দাকে। আরও বেশি উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত একটা হলওয়েতে নামল ওরা। কাঁচের মত চকচকে মসৃণ দেয়াল আর মেঝে থেকে আলোর আভা বেরোচ্ছে। আয়নার তৈরি ছাত। এত উজ্জ্বল, তাকানো যায় না সেদিকে। আপনা থেকেই চোখের পাতা বুজে আসে।

রবিনের শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল ভয়ের শীতল শিহরণ। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। হঠাৎ করেই ভাবনাটা চলে এল মাথায়, অন্য কোন গ্রহে নিয়ে আসা হয়নি তো ওদের? চারপাশের পরিবেশ তো বটেই, গাজুল-মাজুলের আচরণও সন্দেহজনক। ওদের কথাবার্তা ঠিক স্বাভাবিক মানুষের মত নয়। স্বাভাবিক মানুষের মত চিন্তা-ভাবনাও করে না ওরা। তারমানে অন্য কোন গ্রহেই ওদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে! কিডন্যাপ করা হয়েছে ওদেরকে। ভিনগ্রহবাসীদের রাজার গোলাম বানানোর জন্যে।

মুসা কিছু ভাবতে পারছে না। আতঙ্কে চিন্তাশক্তিই যেন ভোঁতা হয়ে গেছে ওর।

আর লম্বা, চকচকে হলওয়ে ধরে হাঁটার সময় কিশোরের মনে হচ্ছে, বাস্তবে নেই ওরা, স্বপ্নের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু সে জানে, এটা বাস্তব। মুসা আর রবিনের চেয়ে কম ভয় পাচ্ছে না সে।

হল পার হয়ে এসে মস্ত একটা ছড়ানো জায়গা। চারকোনা বাক্সের মত অসংখ্য ছোট ছোট ঘর। কাঁচের বাক্সের মত। তার ভেতরে গাজুল-মাজুলের মত ছোট ছোট মানুষেরা শুয়ে আছে। যেন মানুষ বানানোর কারখানা এটা।

চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে দেখছে তিন গোয়েন্দা। হাঁ হয়ে ঝুলে পড়েছে মুসার নিচের চোয়াল। বাক্সগুলোর উল্টো দিকের মস্ত দেয়ালের একটা দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল। বেরিয়ে এল একজন মানুষ। যান্ত্রিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'এই রোবটগুলোকে আনলে কোত্থেকে? এদের জন্ম তো এখানে হয়েছে বলে মনে হয় না।'

'না, এরা রোবট নয়, মানুষ,' জবাব দিল গাজুল।

'অ!' বিড়বিড় করল লোকটা।

'কিন্তু মানুষ আনতে গেলে কেন?' জিজ্ঞেস করল আরেকটা লোক। 'জ্বালাবে তো। জ্বালিয়ে মারবে।'

'জ্বালানোর কারণটা বন্ধ করে নিলেই হবে,' গাজুল বলল। 'তখন গোলাম হিসেবে এদের তুলনা হবে না। তাড়াতাড়ি করা দরকার। অপেক্ষা করতে করতে মনিব শেষে খেপে যাবেন।'

আরেকটা ওরকম বাক্সওয়ালা ঘর পেরিয়ে এল ওরা। এটার মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত বোঝাই কাঁচের বাক্স। সবগুলো মানবশিশুতে ভর্তি। যেন ইনকিউবেটরে রাখা ডিম ফুটে মুরগীর বাচ্চা বেরোনোর মত করে জন্ম দেয়া হয়েছে এই শিশুদের।

দূর থেকে অদ্ভুত বাজনার শব্দ ভেসে এল। বৈদ্যুতিক করাত দিয়ে কাঠ চেরাই করার সঙ্গে মৌমাছির গুঞ্জন মিশিয়ে দিলে যে রকম শুনতে লাগবে, শব্দটা অনেকটা সেই রকম। একঘেয়ে। শুনতে শুনতে কেমন যেন ঝিম ধরে আসে।

'এই যে এটাই,' একটা বিশাল ঘর দেখিয়ে বলল গাজুল। 'এসে গেছি ক্লিনিং রুমের কাছে। এখানেই তোমাদেরকে ধোলাই করা হবে। ডানে ঘোরো।'

থেমে গেল কিশোর। ডানে-বাঁয়ে তাকাতে লাগল। 'ডানদিকটা কোন দিকে? বুঝতে পারছি না তো। ডান কোনদিকে হয়?'

'তাই তো!' হাবার মত চারপাশে তাকাতে লাগল মুসা। 'ডান কোনটা?'

হাত তুলে দু'দিকে দেখিয়ে মুসাকে বোঝাতে চাইল রবিন, 'একবার এদিকে ডান। একবার এদিকে ডান। চতুর্দিকই ডান দিক। কিন্তু কোনদিকে যাব কিভাবে মনে রাখব? কোনদিকে যাচ্ছি, সেটা মনে রাখা তো আরও কঠিন।'

'থামো!' চিৎকার করে উঠল গাজুল। 'এ সব বদমাশি বন্ধ করো! বোকামির ভান করে এখনও ফাঁকি দেবার চেষ্টা। ভেবেছ আমি কিছু বুঝতে পারছি না, না? এসো, এদিক দিয়ে এসো।'

বড়, উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত একটা ঘরে ওদেরকে ঠেলে দিল সে। বড় বড় রূপালী রঙের ধাতব টেবিল সাজানো রয়েছে ঘরটাতে। দেয়াল ঘেঁষে বসানো অদ্ভুত সব ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করছে টেকনিশিয়ানরা।

দেয়ালের সাইজ দেখে মনে হয় মাইলখানেক লম্বা। আয়না বসানো ছাতের কাছাকাছি বেরিয়ে থাকা ঝোলা বারান্দার মত দেখতে ক্যাটওয়াকে চলাফেরা করছে টেকনিশয়ানরা। ওখানেও যন্ত্রপাতি বসানো। নানা ধরনের শব্দ বেরোচ্ছে ওগুলো থেকে। তবে কোনটাই তেমন উচ্চকিত কিংবা জোরাল নয়। কানে পীড়া দেয় না।

তার নিজের চেয়ে লম্বা আরেকজন লোককে হাতের ইশারায় ডাক দিল গাজুল। লোকটা কাছে এলে বিজাতীয় ভাষায় তাকে কি যেন বলতে লাগল সে। এক বর্ণও বুঝতে পারল না তিন গোয়েন্দা।

কথা শেষ হলে ওদের দিকে ফিরে তাকাল সে। 'নতুন গোলামদের দেখার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন মনিব। প্রথমে তোমাদের ভেতরের যন্ত্রপাতি সব ধোলাই করে সাফ করা হবে। তবে প্রথমেই সেটা করতে গেলে মারা যেতে পারো তোমরা, তাই দেহের সমস্ত লাল রক্ত বের করে ফেলে রূপালী রক্ত ভরতে হবে আগে, আমাদের মত। রূপালী রক্ত ভীষণ টেকসই। যত ধোলাইই করা হোক না কেন, মরবে না তখন আর। বুদ্ধিতেও কোন রকম গোলমাল যদি থেকে থাকে, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আবার লম্বা লোকটার দিকে ফিরে তাকিয়ে কি যেন বলল গাজুল।

দেয়ালের দিকে ফিরে তিনজন লোককে ডেকে কথা বলল লম্বা লোকটা। অদ্ভুত সেই ভাষার এক বর্ণও বুঝতে পারল না তিন গোয়েন্দা। গাট্টাগোট্টা তিনজন লোক এগিয়ে এল। হাতে তিনটে কিম্ভূত যন্ত্র। প্রতিটি যন্ত্র থেকে একটা করে মোটা নল বেরিয়ে আছে। নলের মাথায় চোখা সুচের মত জিনিস। সেগুলো

গোয়েন্দাদের দিকে বাড়িয়ে দিল ওরা।

'কি-কি-ক্কি করছেন আপনারা!' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

'ভয় নেই, ডান হাতটা বাড়াও তো,' গাজুল বলল। 'একটুও ব্যথা পাবে না। সুচের মাথায় ব্যথানিরোধক লাগানো আছে। এক দিক দিয়ে তোমাদের লাল রক্ত বেরোতে থাকবে, আরেক দিক দিয়ে রূপালী রক্ত ঢুকবে। দেখবে, দুনিয়াটাই পাল্টে গেছে তখন। খুব আরাম পাবে। নাও, হাতটা বাড়াও। তাড়াতাড়ি করো। মনিব অপেক্ষা করছেন।'

মুসা আর রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। ওদের চোখেও আতঙ্ক।

কিশোর বলল, 'তারমানে···তারমানে আপনাদের দেহেও রূপালী রক্ত?'

হেসে মাথা ঝাঁকাল গাজুল। 'হ্যাঁ। আমাদের দেহে আর যন্ত্রপাতিতে আরও কিছু পরিবর্তন আছে, যেগুলো তোমাদের নেই। আমাদের মগজটাও অন্য রকম, তোমাদের মত না।'

'কোনও ধরনের রোবট না তো?' কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল রবিনের।

মাথা ঝাঁকাল গাজুল, 'তা বলতে পারো। রোবটমানব। তবে রোবট হয়ে অসুবিধে নেই। মানুষ হওয়ার চেয়ে রোবট হওয়া অনেক শান্তির। কথা অনেক হলো। নাও, দেখি, ডান হাতটা বাড়াও তো এখন। আধঘণ্টার মধ্যেই দুঃখ-কষ্ট, বাড়ির জন্যে মন কেমন করা–কোন কিছুই থাকবে না আর তোমাদের।'

বাইশ

কিশোরের হাতটা ধরার জন্যে হাত বাড়াল একজন রোবটমানব।

চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'না না!'

ততক্ষণে রবিনের হাত চেপে ধরেছে একটা রোবট।

কিন্তু মুসাকে ধরতে যেতেই আচমকা ঘুরে দৌড় মারল সে। চিৎকার করে বলতে লাগল, 'কিশোর, রবিন, পালাও!'

রূপালী টেবিলগুলোর ফাঁক-ফোকর দিয়ে ছুটতে থাকল ওরা। প্রথমে কিছু বুঝতে পারল না কর্মরত রোবটরা। তারপর গাজুলের চিৎকারে তাড়া করে এল কয়েকজন।

ফিরে তাকাল কিশোর। গাজুল-মাজুল সহ আরও সাত-আটটা রোবট ওদের পিছু নিয়েছে।

প্রাণপণে ছুটতে লাগল তিন গোয়েন্দা। বেরিয়ে এল আরেকটা আয়না বসানো চকচকে হলরূমে। এত উজ্জ্বল, এত তীব্র আলো, চোখ মেলে রাখাই কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

'কোথায় যাচ্ছি?' চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'জানি না!' জবাব দিল কিশোর। 'কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, কোথায় যাচ্ছি কি করে বলব?'

অন্ধের মত হোঁচট খেয়ে পড়ল সামনের দিকে। দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে চিৎকার বেরিয়ে এল আপনাআপনি।

সাঁড়াশির মত কঠিন আঙুল চেপে ধরল ওকে পেছন থেকে।

ছাড়া পাওয়ার জন্যে চিৎকার-চেঁচামেচি, ধস্তাধস্তি শুরু করল সে।

কিন্তু ধরা পড়ে গেছে। রবিন আর মুসাও ছাড়া পাওয়ার জন্যে চিৎকার করছে। হাত-পা ছুঁড়ছে। লাভ নেই। রোবটমানবেরা ওদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।

কাছে এসে দাঁড়াল গাজুল-মাজুল।

গম্ভীর কণ্ঠে গাজুল বলল, 'অকারণ চেষ্টা, গোলামেরা। এখান থেকে পালিয়ে বাঁচতে আর পারবে না তোমরা কোনমতেই।'

'বাড়ি যাওয়া আর হবে না তোমাদের কোনদিন,' হাসতে হাসতে বলল মাজুল। 'আর যদি হয়ও, লাল রক্ত নিয়ে যেতে পারবে না। রূপালী রক্ত নিয়ে যেতে হবে। তা-ও কোনও অপারেশনে, যদি মনিব মনে করেন তোমাদেরকে পাঠানো দরকার।'

দরজার দিকে ফিরে তাকাল গাজুল। যন্ত্রহাতে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে সেই তিনজন রক্তবদলকারী টেকনিশিয়ান। হাত নেড়ে তাদেরকে ডেকে বলল গাজুল, 'এসো। বদলে দাও।'

তিন গোয়েন্দাকে যারা ধরেছে তাদের উদ্দেশে বলল সে, 'শক্ত করে ধরে রাখো। ছাড়বে না।'

দরজায় দাঁড়ানো একজন টেকনিশিয়ান বলল, 'এখানে না বদলে ক্লিনিং রূমেই নিয়ে এসো না। রক্ত বদলানোর পর তো ধোলাই করার জন্যে সেখানে নিতেই হবে।'

কি যেন ভাবল গাজুল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, নিয়ে চলো।'

আবার ক্লিনিং রূমে নিয়ে আসা হলো তিন গোয়েন্দাকে। রূপালী টেবিলে তোলা হলো। চিত করে শুইয়ে দিয়ে হাত-পা চেপে ধরা হলো।

যন্ত্রের সুইচ টিপে দিতে লাগল টেকনিশিয়ানরা। মৃদু গুঞ্জন তুলে চালু হয়ে গেল মেশিন। সবার চোখ এখন এদিকে। ক্যাটওয়াকে যারা কাজ করছিল, কাজ থামিয়ে দিয়ে তারাও তাকিয়ে আছে।

'আর...আর বোধহয় বাঁচতে পারলাম না,' গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'গাজুল ঠিকই বলেছে। আমরা শেষ।'

ফুঁপিয়ে উঠল রবিন। কান্নার মত স্বর বেরোল গলা থেকে।

কিশোর তাকিয়ে আছে তার পাশে দাঁড়ানো রোবটমানবের হাতের যন্ত্রটার দিকে। সুচের মত জিনিসটা তার ডান হাতের ওপর নিয়ে এসেছে রোবট। হাতের শিরা খুঁজছে ফুটিয়ে দেয়ার জন্যে।

চামড়া স্পর্শ করল সুচ।

তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা।

শিরার মধ্যে বিঁধে গেল সুচ।

শীতল আতঙ্ক যেন গ্রাস করল কিশোরকে। অবশ হয়ে এল হাত-পা। মাথার মধ্যে অদ্ভুত এক অনুভূতি। মুক্তির আর কোন উপায় নেই। কিছুই করার নেই আর। হাল ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজল।

ঠিক এই সময় ক্যাটওয়াকের কাছ থেকে গমগম করে উঠল একটা ভারী কণ্ঠ, 'কোথায়? কই? কাদের নিয়ে আসা হয়েছে?'

কণ্ঠটা কেমন চেনা চেনা লাগল কিশোরের।

চোখ মেলল আবার।

ক্যাটওয়াকের দিকে তাকিয়ে কণ্ঠের মালিককে দেখেই স্থির হয়ে গেল। বুঝতে পারল কেন চেনা চেনা লাগছিল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

ক্যাটওয়াকে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং ডক্টর মুন! মহাক্ষমতাধর অসাধারণ ক্ষমতাশালী সেই বিজ্ঞানী, যাঁর সঙ্গে বহুবার মোলাকাত হয়েছে ওদের।

ডক্টর মুনকে দেখে নিশ্চিত হলো রবিন, ভিনগ্রহে নয়, পৃথিবীতেই রয়েছে ওরা, ডক্টর মুনের কোনও গোপন আস্তানায়।

তিন গোয়েন্দাকেও দেখতে পেলেন ডক্টর মুন। বিমল হাসি ফুটল তাঁর মুখে। আদেশ দিলেন, 'অ্যাই ছাড়ো। ছেড়ে দাও ওদের।'

বিনীত ভঙ্গিতে গাজুল বলল, 'রক্ত বদলানো এখনও শেষ হয়নি, মালিক।'

'না হোক,' আদেশ দিলেন ডক্টর মুন। 'নিয়ে এসো ওদেরকে আমার চেম্বারে।'

রবিনের দিকে ফিরে তাকিয়ে ফিসফিস করে মুসা বলল, 'মনে হচ্ছে বেঁচে গেলাম এ যাত্রা।'

'কি জানি!' জবাব দিল রবিন। 'কিংবা হয়তো আরও বড় কোন বিপদে পড়তে যাচ্ছি। ডক্টর মুনকে আমরা যে পরিমাণ ভুগিয়েছি এতকাল, এবার নিশ্চয় প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বেন না।'

সাদা আলো জ্বলছে ডক্টর মুনের চেম্বারে। তবে ক্লিনিং রূমের মত এত উজ্জ্বল চোখ ধাঁধানো নয়, চোখে পীড়াদায়কও নয়।

ঘুরে গিয়ে মস্ত ডেস্কের ওপাশে বসলেন ডক্টর মুন। তাঁর দুই পাশে গিয়ে দাঁড়াল দু'জন বডিগার্ড। ওরা স্বাভাবিক লাল রক্তের মানুষ নাকি রোবটমানব, দেখে বোঝার উপায় নেই। গম্ভীর, ভাবলেশহীন চেহারা।

তিন গোয়েন্দাকে ধরে নিয়ে ঘরে ঢুকেছে তিনজন প্রহরী। তাদের সঙ্গে গাজুল-মাজুল।

ডেস্কের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো গোয়েন্দাদেরকে। হাসিমুখে তাদের দুই পাশে এসে দাঁড়াল গাজুল-মাজুল।

'আপনার জন্যে নতুন গোলাম নিয়ে এলাম, মালিক,' মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করে

বলল গাজুল।
'ভীষণ বুদ্ধিমান ওরা,' যোগ করল মাজুল।
ভুরু কুঁচকে তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে রইলেন ডক্টর মুন। 'কিন্তু ওরা বুদ্ধিমান হয় কি করে? ওদেরকে তো বোকা বানিয়ে দিয়েছিলাম আমি।'
বুঝতে পারল না গাজুল। 'বোকা বানিয়ে দিয়েছিলেন?'
'হ্যাঁ,' ডক্টর মুন বললেন। 'আমাদের একটা টাইম ট্র্যাভেল মেশিন নিয়ে পালিয়েছিল ওরা। নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল লেকের পানিতে। ওটাতে চড়েই কিছুদিন আগে ফিরে এসেছিল আবার।'
'তারপর?' কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল গাজুল।
'মগজের মান নামানোর ওষুধ দিয়ে দিলাম বোকা বানিয়ে। ফেরত পাঠিয়ে দিলাম বাড়িতে। ওরা আমার পুরানো শত্রু। আমার কাজে বার বার বাগড়া দিয়েছে। বহু ক্ষতি করেছে। মেরে ফেলা যেত, কিন্তু তার কোন প্রয়োজন মনে করলাম না। এমন একটা কিছু করে দিতে চাইলাম, যাতে আমার কোন ক্ষতি করতে না পারে আর কোনদিন। ভাবলাম, কি করলে সেটা সম্ভব? বোকা বানিয়ে দিলে। বুদ্ধি না থাকলে আমার বিরুদ্ধে লাগতে পারবে না আর কখনও।'
হাসিমুখে গাজুল জানাল, 'শাস্তি ওদের ভালমতই হয়েছে, মালিক। স্কুলে টিচার, বন্ধু-বান্ধবরা সারাক্ষণ ওদের নিয়ে দূর-দূর ছ্যা-ছ্যা করেছে, ইয়ার্কি মেরেছে, হাসাহাসি করেছে। তবে ইদানীং সেই অবস্থাটা আর ছিল না। তবে ওদের ভয় পাওয়া শুরু করেছিল পরিচিতজনেরা। ফ্রীক ভাবতে আরম্ভ করেছিল।'
'তার মানে?'
'মগজশক্তি রসায়ন দিয়ে বুদ্ধিমান বানিয়ে ফেলেছি। এত বেশি বুদ্ধিমান হয়ে গেছে ওরা এখন, ওদের বুদ্ধিমত্তার যন্ত্রণায় টিকতে না পেরে স্কুল থেকেই বের করে দিয়েছে ওদেরকে টিচাররা। বন্ধু-বান্ধবরা ভয়ে মিশতে চায় না। খুব ভাল গোলাম হবে আপনার, মালিক।'
'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন ডক্টর মুন। 'ভুল করেছ। মস্ত ভুল। স্বাভাবিক বুদ্ধি যখন ছিল এদের, তখনই এরা আমার ক্ষতি করেছে একের পর এক। আগের চেয়েও বুদ্ধি যদি বেড়ে গিয়ে থাকে তাহলে তো দানবে পরিণত হয়েছে এখন। এদের এত বুদ্ধিমান রাখা যাবে না কোনমতেই। আমার ল্যাবরেটরিই ধ্বংস করে দিয়ে বেরিয়ে যাবে কোনদিন। তবে ওষুধ খাইয়ে যখন ফেলেছই, দেখা যাক কি রকম বুদ্ধিমান ওরা হয়েছে, তারপর আবার বোকা বানিয়ে দিলেই হবে। আর স্মৃতিশক্তিটাও ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে।...কিশোর পাশা, বলো তো আমি কে?'
'আপনি আমাদের মালিক,' নির্বিকার ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর।
'মুসা, রবিন, তোমরা বলো তো আমি কে?'
'আপনি গাজুল-মাজুল-হাজুল-বাজুল সবার মালিক,' জবাব দিল মুসা।
রবিন বলল, 'আপনি রোবটমানব টাকরাভুম ওরফে গাকরা মিয়া।'
রাগ ঝিলিক দিয়ে উঠল ডক্টর মুনের চোখে। কোনমতে দমন করলেন। ঝট

করে তাকালেন একবার গাজুল-মাজুলের দিকে। কুঁকড়ে গেল ওরা।

গাজুল বলল, 'ওরা বোকা সাজার ভান করছে।' কিন্তু গলায় জোর নেই তার।

মাজুল বলল, 'মালিক, ওদের অংক দিয়ে দেখুন। মুহূর্তে করে ফেলবে। যত কঠিনই দেন না কেন।'

আবার কিশোরের দিকে তাকালেন ডক্টর মুন। দুই আঙুল তুলল। 'বলো তো এখানে ক'টা আঙুল?'

নির্দ্বিধায় জবাব দিল কিশোর, 'সাড়ে দশটা।'

মুসাকে জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর মুন, 'তুমি বলো, দুই আর তিন যোগ করলে কত হয়।'

'বিশ।'

'হাঁদারাম!' ধমকে উঠল রবিন। 'দুই আর তিন যোগ করলে বিশ হয় নাকি? একুশ হয়, একুশ একুশ।'

'আরে কি শুরু করলে কি তোমরা?' কিশোর বলল। 'আমরা যে বুদ্ধিমান হয়ে গেছি, এটা বুঝিয়ে দিতে চাও নাকি? তাহলে তো ধরে গোলাম বানাবে।'

তাড়াতাড়ি জিভ কাটল রবিন, 'না না, তা কেন বোঝাব। এই মুসা, দুইয়ে আর তিনে এগারো হয়, বুঝলে? বারো বললেও অবশ্য ভুল হবে না।'

হা-হা করে হাসল কিশোর। 'গাধাটা কি বলেরে!'

'গাধা! গাধা!' করে সমানে চেঁচাতে লাগল মুসা আর রবিন। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাবার মত হি-হি করে হাসতে লাগল।

'যথেষ্ট হয়েছে!' চিৎকার করে উঠলেন ডক্টর মুন। 'থামো!'

রাগত চোখে গাজুলের দিকে তাকালেন আবার তিনি। ঘামতে আরম্ভ করেছে গাজুল।

কর্কশ কণ্ঠে ডক্টর মুন বললেন, 'কি, কোথায় বুদ্ধিমান? আগের চেয়ে তো হাঁদা হয়েছে আরও। এত বোকা তো আমিও বানাইনি। বললাম না মগজশক্তি রসায়ন লাল রক্তে কাজ করে না।'

হাত কচলে গাজুল বলল, 'কিন্তু মালিক, আমি সত্যি বলছি, বুদ্ধিমত্তার জন্যে ওদেরকে স্কুল থেকে বের করে দেয়া হয়েছে।'

'তাহলে বোকা হলো কি করে?' ভুরু নাচালেন ডক্টর মুন।

ধীরে ধীরে পেছনে সরে যেতে লাগল মাজুল।

ধমকে উঠলেন ডক্টর মুন, 'যাচ্ছ কোথায়?'

পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে গেল মাজুল।

কঠিন কণ্ঠে গাজুল-মাজুলের উদ্দেশে বললেন ডক্টর মুন, 'নিশ্চয় রিঅ্যাকশন হয়েছে ওষুধে। আমি নিশ্চিত, লাল রক্তে কাজ করে না এই ওষুধ। আর করলেও বেশিদিন কার্যকর থাকে না।' গর্জে উঠলেন হঠাৎ, 'তোমাদের পাঠানো হয়েছে স্বাভাবিক মগজের বুদ্ধিমান মানুষকে ধরে আনতে। এ কাকে নিয়ে এলে তোমরা? কে বলেছিল আমি নিজে হাঁদা বানিয়ে রাখা কতগুলো ছেলেকে ওষুধ খাইয়ে বুদ্ধিমান বানিয়ে ধরে আনতে? তোমরা আমাকে

ঠকিয়েছ!'

ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল গাজুল আর মাজুল।

করজোড়ে বলল গাজুল, 'ভুল হয়ে গেছে, মালিক। এবারের মত মাফ করে দিন।'

ডক্টর মুন বললেন, 'ভাল করেই জানো তোমরা এখানকার নিয়ম। এখানে ভুলের কোন ক্ষমা নেই। বিজ্ঞান গবেষণায় সামান্যতম ভুলও বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে। তোমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখলে ভবিষ্যতে আরও বড় কোন ভুল করে বসবে। আমার ল্যাবরেটরিতে এ ধরনের রিস্ক আমি নিতে পারি না। কষ্ট করার ভয়ে হাতের কাছে পাওয়া বোকাদেরকে ওষুধ খাইয়ে যারা বুদ্ধিমান বানানোর চেষ্টা করে, তাদের মত অলসদের দিয়ে আমার কোন উপকার হবে না।'

ডেস্কের ড্রয়ারের দিকে ডান হাতটা নেমে গেল ডক্টর মুনের।

কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝে গিয়ে চিৎকার করে উঠল গাজুল, 'না না, মালিক, আর কোনদিন ভুল হবে না...'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই হাতটা বেরিয়ে এল আবার ডক্টর মুনের। হাতে একটা বড় পিস্তলের মত অস্ত্র। গাজুলের দিকে তাক করে টিপে দিলেন ট্রিগার। নলের মুখ থেকে বেরিয়ে এল একটা সাদা আলোকরশ্মি।

মুহূর্তে নেই হয়ে গেল গাজুল। সে যেখানে ছিল সেখানে টেনিস বলের সমান একটা রূপালী ধোঁয়ার কুণ্ডলী তৈরি হলো। ধীরে ধীরে উঠে যেতে লাগল ছাতের দিকে।

ঘুরে দরজার দিকে দৌড় মারল মাজুল।

কিন্তু দুই পা-ও যেতে পারল না। সাদা আলোকরশ্মি এসে লাগল তার পিঠে। চোখের পলকে গাজুলের অবস্থা হলো তারও।

হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল তিন গোয়েন্দা। ডক্টর মুন বাদে সবার চোখে আতঙ্ক দেখতে পেল।

অস্ত্রটা আবার ড্রয়ারে রেখে দিলেন ডক্টর মুন। প্রহরীদের বললেন, 'নিয়ে যাও এদের। টেকনিশিয়ানদের বলো, রক্ত বদলাক, কিংবা যত খুশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাক এদের ওপর। যদি কাজের উপযুক্ত করতে পারে, ভালো, নয়তো গায়েব করে দিক। হাবা দিয়ে আমাদের কোন কাজ হবে না। ওদের বাড়িতে ফেরত পাঠানোরও আর কোন যুক্তি নেই। যাও, নিয়ে যাও।'

তেইশ

আবার ক্লিনিং রুমে নিয়ে আসা হলো তিন গোয়েন্দাকে।

ঘরে ঢুকেই ঝাড়া দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল মুসা। কিশোরকে যে রোবটটা

ধরেছে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিশোরকে ছাড়ানোর পর দু'জনে মিলে রবিনকে ছাড়াল। তারপর দিল দৌড়।

আচমকা মুসাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে রবিনকে লক্ষ্য করে ডাইভ দিল কিশোর। তাকে সঙ্গে নিয়ে পড়ল মেঝেতে। ঠিক ওই মুহূর্তে দুটো সাদা আলোকরশ্মি ছুটে গেল ওদের মাথার ওপর দিয়ে। অল্পের জন্যে বাঁচল।

ঘাড় ফিরিয়ে মুসার কি অবস্থা দেখল কিশোর।

মুসাও উপুড় হয়ে শুয়ে আছে মাটিতে।

হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আবার ছুটতে শুরু করল ওরা। পালানোর পথ খুঁজছে।

কোন পথ দেখতে পেল না।

পালানোর কোন উপায় নেই।

একধারে জটলা করছে কয়েকজন রোবটমানব। সেদিকে গেলে ধরা পড়তে হবে নিশ্চিত।

এখানে থাকলে···

কিন্তু ভাবার সময় পেল না কিশোর। চিৎকার করে উঠল, 'সরে যাও!'

আবার তিনটে আলোকরশ্মি ছুটে এল ওদের দিকে। অল্পের জন্যে বাঁচল এবারও। কাঁধে আগুনের আঁচের প্রচণ্ড তাপ লাগল কিশোরের। রশ্মিটা সামান্য নিচে নামলেই গায়ে লাগত তার, হাওয়া হয়ে যেত সে।

'এদিকে দিয়ে এসো!' চিৎকার করে উঠল মুসা।

হতভম্ব একজন রোবট-টেকনিশিয়ানকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বাঁক নিয়ে কতগুলো বাক্সের পেছনে ঢুকে গেল সে। রবিন ছুটল তার পেছনে।

ক্ষণিকের জন্যে ফিরে তাকাল কিশোর। এগিয়ে আসছে তিন প্রহরী। ওদের হাতে লেজার-পিস্তল উদ্যত। কিন্তু ট্রিগার টিপতে সাহস পাচ্ছে না। কেন সেটা বোঝা যাচ্ছে। টিপলেই রশ্মি গিয়ে লাগবে কাঁচের বাক্সের গায়ে। হাওয়া হয়ে যাবে বাক্সে ভরে রাখা রোবটশিশুরা।

মুসা আর রবিনের মত কিশোরও কাজে লাগাল সুযোগটা। ছুটে বাক্সের পেছনে চলে এল।

দরজাটা চোখে পড়ল। সেদিকেই ছুটছে মুসা আর রবিন।

'বেরোনো যাবে ওটা দিয়ে?' পেছন থেকে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'চেষ্টা করে দেখা যাক। আর তো কোন উপায়ও নেই।' ছোটা বন্ধ করল না মুসা।

পেছনে কানে আসছে চিৎকার আর পদশব্দ। দরজার কাছে সময়মত পৌঁছতে পারবে কিনা বুঝতে পারল না কিশোর। ভারী দম নিল সে। তারপর প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল দরজাটার দিকে। ছোটাও কঠিন। আয়না বসানো মেঝেতে পিছলে যেতে চায় পা।

ওদের ধরতে না পারায় হই-হট্টগোল আর চিৎকার-চেঁচামেচি বেড়ে গেছে

কয়েকগুণ। দুপদাপ পা ফেলে ছুটে আসছে বহু লোক।

খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল মুসা আর রবিন। ওদের সামান্য পরেই কিশোরও বেরোল।

কানে এল মুসার চিৎকার। পরক্ষণেই রবিনের। দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেয়েছে মুসা। সামলাতে না পেরে তার গায়ের ওপর গিয়ে পড়েছে রবিন।

সামনে খোলা জায়গা নেই। দরজাও নেই।

মরিয়া হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'আলমারি! একটা আলমারিতে ঢুকেছি আমরা।'

তারমানে দরজাটা ছিল মস্ত আলমারির।

'আর কোন পথ নেই,' ককিয়ে উঠল রবিন। 'আটকা পড়লাম!'

আলমারির দেয়ালে রূপালী রঙের একটা হাতলের ওপর দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে কিশোরের। আচমকা হাত বাড়িয়ে হাতলটা ধরে হ্যাঁচকা টানে নিচে নামিয়ে দিল।

মুহূর্তে দু'দিক থেকে পিছলে সরে এসে লেগে গেল আলমারির দরজা। চালু হয়ে গেল আলমারি।

চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'আলমারি নয়, আলমারি নয়, কোন ধরনের লিফট।'

অনন্তকাল ধরে যেন নেমেই চলল লিফটটা। আসলেই চলছে কিনা যখন সন্দেহ হতে লাগল ওদের, ঠিক সেই সময় ঝাঁকি লাগল। স্থির হয়ে গেল লিফট। পিছলে দু'দিকে সরে গিয়ে আবার খুলে গেল দরজা।

লিফট থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

ফুটবল মাঠের সমান বিশাল একটা জায়গায় ঢুকল। কাঁচে ঢাকা মস্ত গম্বুজের মত ছাত। অসংখ্য গোলকযান দেখতে পেল সেখানে। সারি দিয়ে রাখা। হেলিকপ্টার কিংবা বিমান রাখার ছাউনির মতই এটা গোলকযান রাখার ছাউনি। গোলকগুলোর গায়ে নাম লেখা 'টাইম ট্র্যাভেল'। আলাদা করে বোঝার জন্যে নম্বর দেয়া রয়েছে, যেমন টাইম ট্র্যাভেল-১, টাইম ট্র্যাভেল-২, ইত্যাদি।

সেগুলোর দিকে ছুটল ওরা।

একটা গোলকের ওপর চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াল রবিন। 'এই কিশোর, দেখো, আমাদেরটা না? নম্বর মিলে যাচ্ছে।'

নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর। গোলকযানটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সে-রকমই তো মনে হচ্ছে। আমাদের নয় ওটা, ডক্টর মুনের। তবে ওটাই নিয়ে গিয়ে লেকের পানিতে লুকিয়ে রেখেছিলাম আমরা।'

গোলকযানটার দিকে দৌড় দিল সে।

এ জিনিস চালানোর ওস্তাদ হয়ে গেছে এখন মুসা। দরজা খুলে উঠে পড়ল। কিশোর আর রবিন উঠে বসতেই লাগিয়ে দিল দরজাটা। প্রথমেই টিভি মনিটরটা অন করে দিল। ল্যাবরেটরির ভেতর থেকে ছুটে বেরোতে দেখল প্রহরীদের।

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, 'কোন সুইচটা টিপব? আজ আর ভুল করতে রাজি না।'

সেদিনকার কথাটা মনে পড়ে গেছে এখন তিনজনেরই। কিশোর বুঝতে

পারল, বুদ্ধি স্বাভাবিক হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হারানো স্মৃতিও ফেরত এসেছে। প্রচণ্ড গরম পড়েছিল সেদিন। মুসা প্রস্তাব দিয়েছিল, লেকের পাড় থেকে হাওয়া খেয়ে আসতে। কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকতেই গোলকযানটার কথা পাড়ল কিশোর। অনেকদিন চড়া হয় না। লেকের পানিতে লুকানো আছে। পানি থেকে তুলে চেপে বসেছিল ওটাতে ওরা। কিশোর প্রস্তাব দিয়েছিল, চড়াই যখন হলো, বেড়িয়ে আসা যাক। কিন্তু কোথায় বেড়াবে? অনেক সুইচের মধ্যে বড় একটা লাল সুইচ আছে। সেটাই টেপার সিদ্ধান্ত নিল। যা থাকে কপালে ভেবে ওই সুইচটাই টিপে দিয়েছিল। এবং তারপর তো কয়েক মাস ধরে চরম ভোগান্তি···এখানে আসার পর ডক্টর মুন ওদেরকে বোকা করে কাউকে সঙ্গে দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নিজের গোলকযানটা রেখে দিয়েছিলেন এখানেই···

'আরে বলো না, কোনটা টিপব?' মুসার উত্তেজিত কণ্ঠ ভাবনার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল কিশোরকে। 'জলদি বলো! চলে এসেছে তো ওরা।'

নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটতে লাগল কিশোর। মনিটরের দিকে তাকিয়ে দেখল গোলকযানের কাছাকাছি চলে এসেছে প্রহরীরা। বলল, 'লালটাই টেপো আবার। টেলিভিশনের সুইচ অন-অফ করার মত মনে হচ্ছে জিনিসটা। একবার টিপলে অন, পরের বার টিপলে অফ। একবার টিপে ডক্টর মুনের হেডকোয়ার্টারে পৌঁছেছি, নিশ্চয় দ্বিতীয়বার টিপলে আগের জায়গায়—অর্থাৎ যেখান থেকে এসেছে সেই লেকের পানিতে ফিরে যাবে যানটা।'

'যদি না যায়? অন্য কিছু করে?' রবিন বলল।

'কিছুই করার নেই,' জবাব দিল কিশোর। 'এখানে থাকলেও মরতে হবে। তারচেয়ে চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি। ঝুঁকিটা নিতেই হবে।'

হাত বাড়াল মুসা।

একবার দ্বিধা করে টিপে দিল লাল সুইচটা।

কয়েকটা সেকেন্ড যেন কিছুই ঘটল না। তারপর একটা ঝাঁকুনি। মনিটরে দেখা গেল চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল প্রহরীরা। তারমানে গম্বুজ থেকে বেরিয়ে এসেছে গোলকযান।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রবিন বলল, 'ভাগ্যিস বোকার অভিনয় করার বুদ্ধিটা বের করেছিলে। আর কোনভাবেই ফাঁকি দেয়া যেত না ওদের।'

হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'আমার অভিনয়টা কেমন হয়েছে?'

'এত বাস্তব অভিনয় হলিউডের সবচেয়ে বড় অভিনেতারাও করতে পারবে কিনা সন্দেহ,' হেসে বলল কিশোর। 'ডক্টর মুন তো বটেই, গাজুল-মাজুলের মত রোবটমানবেরাও শেষ পর্যন্ত সেই ফাঁকিতে পড়ে গেল। এরচেয়ে ভাল অভিনয় আর কি হতে পারে?'

ঝপ করে পানিতে পড়ার শব্দ হলো একসময়। মনিটরে দেখতে পেল ওরা একটা পরিচিত লেক।

পানিতে ফাঁপা বলের মত ভেসে রইল গোলকযানটা।

নিরাপদেই রকি বীচে ফিরে এসেছে। কিন্তু বিশ্বাস হতে চাইছে না ওদের। শেষে দরজা খুলে উঁকি দিয়ে দেখে এল রবিন।

জরুরী কণ্ঠে কিশোর বলল, 'তাড়াতাড়ি এটা ডুবিয়ে দিয়ে চলো পালাই এখান থেকে। বলা যায় না, যে কোন মুহূর্তে টাইম ট্র্যাভেলার নিয়ে আমাদেরকে ধরতে হাজির হয়ে যেতে পারে ডক্টর মুনের রোবটবাহিনী। চলো চলো, জলদি করো!'

যানটাকে তীরের কাছাকাছি নিয়ে আসা হলো। সুইচ টিপে লম্বা মইয়ের মত সিঁড়ি বের করে তীরে ঠেকাল মুসা। নেমে পড়ল তিনজনে। বাকি কাজ এখন রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে সারতে হবে। পকেট থেকে ছোট্ট যন্ত্রটা বের করল কিশোর। গোলকযানের কন্ট্রোলবোর্ডের ওপরেই রাখা ছিল। নামার আগে পকেটে ভরেছে। সুইচ টিপে প্রথমে মই সরাল। তারপর দরজা বন্ধ করল। সবশেষে আরেকটা সুইচ টিপতেই নিঃশব্দে পানিতে তলিয়ে গেল যানটা।

দুই দিন পর।

স্কুলে হাজির হয়েছে তিন গোয়েন্দা।

মামলায় স্কুল কর্তৃপক্ষ হেরেছে। আবার ভর্তি করে নিতে বাধ্য হয়েছে তিনজনকে।

অংকের ক্লাসে একটা কঠিন সমীকরণ দিয়ে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার ক্রেগ, 'কে করতে পারবে? মুসা, তুমি পারবে?'

মাথা নাড়ল মুসা, 'এত কঠিন অংক আমাকে দিয়ে হবে না, স্যার।'

অবাক হলেন মিস্টার ক্রেগ। রবিনের দিকে তাকালেন। 'তুমি পারবে?'

'চেষ্টা করে দেখতে পারি, স্যার।'

ব্ল্যাকবোর্ডে এসে চক দিয়ে অংকটা করল রবিন। ফিরে তাকাল মিস্টার ক্রেগের দিকে।

মাথা ঝাঁকালেন তিনি, 'ঠিক পথেই এগিয়েছিলে, কিন্তু দুটো জায়গায় ভুল রয়ে গেছে।' ক্লাসের দিকে তাকালেন তিনি। 'ভুল দুটো আর কেউ ধরতে পেরেছ? শুধরে দিতে পারবে?'

রয় বা শারিয়া কেউ জবাব দিল না। একমাত্র হাত তুলল কিশোর। সে এসে ঠিক করে দিয়ে গেল অংকটা।

হাসি ফুটল মিস্টার ক্রেগের মুখে। 'কি ব্যাপার? আজ মুসা পারলই না, রবিন ভুল করল, করতে পারলে কেবল তুমি। সেই আগের মত। ঘটনাটা কি?'

হেসে জবাব দিল কিশোর, 'আবার আমাদের মগজ স্বাভাবিক হয়ে গেছে, স্যার। প্রথমে মগজ ভোঁতা করার ওষুধ দিয়ে বোকা বানিয়ে দেয়া হয়েছিল আমাদের, তারপর মগজ উন্নত করার ওষুধ খেয়ে হয়ে গেলাম ক্ষতিকর রকম বুদ্ধিমান। দুটো ওষুধের পরস্পরবিরোধী রিঅ্যাকশনেই সম্ভবত আবার স্বাভাবিক

পর্যায়ে চলে এসেছে আমাদের মগজ। একেবারে আগের মত। অরিজিন্যাল আমরা।'

'পরস্পরবিরোধী রিঅ্যাকশনের ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।'

'ভাল ব্যাখ্যা আমিও দিতে পারব না, স্যার। তবে বিষে বিষক্ষয়ের মত হয়েছে ব্যাপারটা। এর সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভবত আঙ্কেল জ্যাক দিতে পারবেন।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার ক্রেগ। 'দেখি, একদিন মিস্টার জ্যাককেই গিয়ে ধরব। কি ওষুধ দিয়ে তিনি এই কাণ্ড করিয়েছেন, জানতে হবে। যাই হোক, আবার যে তোমাদেরকে আগের অবস্থায় ফিরে পেয়েছি, এতে আমি খুব খুশি।' ক্লাসের দিকে তাকালেন তিনি। 'তোমরা কি বলো?'

হাততালি দিয়ে মিস্টার ক্রেগের কথা সমর্থন করল সবাই।

***

শুঁটকি শত্রু

প্রথম প্রকাশ: ২০০৫

এক

'ফ্যাশন শোতে যাচ্ছি ভাবতেই দারুণ লাগছে,' কিশোর পাশা বন্ধুদের উদ্দেশে বলল। এইমাত্র ওরা ওদের প্রিয় দোকান "ফ্যাশন হাউজ"-এ প্রবেশ করল।

'যে ড্রেস পরে মডেলিং করব সেটা কি ওরা দিয়ে দেবে নাকি?' প্রশ্ন করল রবিন মিলফোর্ড।

মাথা নাড়ল মুসা আমান।

'রবিন! তোমার ক্লজিটের যেরকম ঠাসাঠাসি অবস্থা, কবে যে দরজাটা ভেঙে যাবে!'

রবিন হাসল বন্ধুর দিকে চেয়ে।

'গেছে অলরেডি!'

ছেলেরা মহা উত্তেজিত। ফ্যাশন হাউজ মস্ত দোকান। ওটার ভিতরেই শো হবে। রকি বীচের বেশ কয়েকজন ছেলে-মেয়ে মডেল। কিশোর আর রবিনও রয়েছে তাদের সঙ্গে।

'আরি!' সবিস্ময়ে বলে উঠল কিশোর। 'ফ্যাশন হাউজকে তো কখনোই এমন সাজে দেখিনি।'

দোকানটার দিকে দৃষ্টি বুলাল তিন গোয়েন্দা। আগাগোড়া বিশাল এক লাল কার্পেট ফেলা হয়েছে। কার্পেটের দু'ধারে সারি সারি চেয়ার। প্রত্যেকটা চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে একটা করে রঙিন বেলুন।

কাপড়ের র‍্যাকগুলোর উপরে কার্ডবোর্ডে লিখে রাখা হয়েছে: ব্যাক টু স্কুল।

'ধ্যাত,' বিরক্তি প্রকাশ পেল মুসার কণ্ঠে। 'গরমের ছুটি শেষ হতে আরও তিন সপ্তা বাকি, অথচ এখনই স্কুলে ফিরে যেতে বলছে!'

মুচকি হাসল কিশোর।

'ভালই তো, ব্যাক টু স্কুল বলছে, কিন্তু আসলে তো ফ্যাশন শো!'

'কিশোর, দেখো,' বলে উঠল রবিন। দেয়াল ঘড়ির দিকে আঙুল তাক করেছে। 'একটা বেজে গেছে। শোয়ের আর এক ঘণ্টা বাকি।'

স্টোরের মালিক মিরা ব্যস্ততার সঙ্গে ওদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। তাকে ও তার সেলসগার্ল রীটাকে চেয়ার গুনতে দেখল ছেলেরা।

মিরার মাথায় খাটো, কালো চুল। চোখজোড়া নীল। কালো প্যান্ট ও চকচকে লাল ব্লাউজ ওর পরনে।

রীটা পরেছে স্ট্রাইপ্‌ড্ টি শার্ট ও ট্যান প্যান্ট। বাদামী চুলের মেয়েটির মুখ ভর্তি ফুটকি চিহ্ন।

'মিরা আর রীটা আমাদের চেয়ে কম এক্সাইটেড না,' বলল গোয়েন্দাপ্রধান।

'নার্ভাসও বলতে পারো,' যোগ করল রবিন। মুসার দিকে ফিরল। 'শোতে নাম না দেয়ায় এখন খারাপ লাগছে না তোমার?'

মাথা নাড়ল মুসা।

'জিন্স আর সকার শার্টের মডেলিং করতে দেবে না, খারাপ লাগবে কেন?'

রবিন চোখ নাচাল, কিন্তু হেসে ফেলল কিশোর। রবিন আর মুসার পছন্দ এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে।

'আমাদের বরং সুবিধেই হয়েছে,' বলল কিশোর। 'মুসা আমাদের আউটফিট বদলাতে সাহায্য করতে পারবে।'

অন্যান্য যেসব ছেলে-মেয়েরা মডেল হবে, তারা আসতে শুরু করেছে। জুলি মরগ্যান আর রুডি মার্শকে দেখতে পেল ওরা। পরমুহূর্তে এমন একজনকে দেখল, ওরা যাকে আশা করেনি।

'শুঁটকি টেরিও নাম লিখিয়েছে নাকি?' গুঙিয়ে উঠল কিশোর।

'ও মনে হয় স্লুটি প্যান্টের মডেলিং করবে,' বলে হেসে ফেলল রবিন।

'আমি কিন্তু কথাটা শুনতে পেয়েছি, রবিন মিলফোর্ড!' খ্যাঁক করে উঠল শুঁটকি। তিন গোয়েন্দার কাছে হেঁটে এল। মেয়েদের মত পনিটেইল রেখেছে শখ করে।

'গোয়েন্দাদের আবার মডেলিং করার শখ হলো কবে থেকে?'

'আজকে থেকে,' জবাবে বলল গোয়েন্দাপ্রধান।

দাঁতে দাঁত পিষে মাথা নাড়ল টেরি।

'তুমি এখানে কেন, টেরি?' কিশোর প্রশ্ন করল।

চোখ জ্বলে উঠল টেরির।

'ডয়েল নিউজে আর্টিকল লিখছি আমি।'

'এ আর নতুন কথা কী?' মুসা বিড়বিড় করে বলল।

ডয়েল নিউজ শুঁটকির নিজের খবরের কাগজ। বাসায় বসে কম্পিউটারে নিজেই লেখে।

'ফ্যাশন শো-র নতুন ড্রেসগুলো সম্পর্কে লিখবে, তাই না?' রবিন বলল।

ধূর্ত হাসল টেরি।

'না,' বলল। 'গসিপ কলাম লিখব ঠিক করেছি।'

কিশোর একদৃষ্টে চেয়ে টেরির দিকে। কী ধরনের গুজব রটাতে চাইছে শুঁটকি?

'গসিপ রটানো কি ঠিক, টেরি?' বলল অবশেষে। 'বিশেষ করে মিথ্যে গুজব।'

চুলে আঙুল চালাল টেরি।

'মিথ্যে গুজব রটাব কে বলল তোমাকে?'

'তুমি তো আগেও অনেক বানোয়াট গপ্পো ফেঁদেছ, টেরি,' বলল মুসা। 'আমরা তো চিনি তোমাকে।'

রেগে গেল শুঁটকি।

'দেখো, বাজে কথা বলবে না। বানাবার কোন দরকারই পড়বে না,' বলল। 'রসাল খবরের অভাব হবে না এখানে।'

এই বলে চলে গেল টেরি। এক গাদা সোয়েটার দেখতে লাগল মন দিয়ে।

'শুঁটকি যখন এসে হাজির হয়েছে,' বলল রবিন। 'তখন এর চাইতে খারাপ আর কী হতে পারে?'

মুসা দরজার দিকে আঙুল দেখাল।

'কেন শিপটনের ব্যাপারে কী বলবে?'

কিশোর ঘুরে তাকাল। দেখতে পেল কেন শিপটন ঢুকছে। সঙ্গে ওর যমজ দুই ভাই মানি আর পেনি। যমজ বাচ্চা দুটো মডেল হবে।

'আমরা শো করব!' চেঁচিয়ে উঠল মানি।

'আমরা সবার চেয়ে সুন্দর!' যোগ করল পেনি।

'মুখে আইসক্রীম লেগে আছে, তাও?' মুসা বলল।

কোন বিকার হলো না যমজদের। হাসি মুখে পাণ্ডা বার চকোলেট আইসক্রীম খেয়ে চলেছে।

কিশোরের এবার নজর গেল কেনের মাথায় পরা কালো বেরে টুপির দিকে।

'তোমার জাদুকরের পোশাকের সঙ্গে মানাবে টুপিটা,' বলল ও। ও জানে, কেন বড় হয়ে ম্যাজিশিয়ান হতে চায়।

'আমি ঠিক করেছি ম্যাজিশিয়ান হব না,' বলল কেন। পকেটে হাত ভরে ভাঁজ করা এক কাগজ বের করল। 'শিল্পী হব।'

কাগজটা তুলে ধরল। সাদা একটা ছোপ ছাড়া আর কিছু ধরা পড়ল না কিশোরের চোখে।

'কী পড়েছিল?' প্রশ্ন করল মুসা। 'দুধ?'

'তুমি গ্রেট আর্টের কিছুই জানো না,' কাটখোট্টা গলায় বলল কেন। পেইন্টিংটায় আঙুল রাখল। 'এটা মেরু ভালুকের ছবি। তুষারঝড়ের মধ্যে পড়েছে।'

ঘাড় কাত করল কিশোর। কোথায় মেরু ভালুক আর কোথায়ই বা তুষারঝড়?

'এরপর কী আঁকবে ওদেরকে বলো না,' ভাইকে বলল মানি।

'আমার পরের প্রজেক্ট হচ্ছে,' ঘোষণা করল কেন। 'পোকা-মাকড়দের ছবি আঁকা।'

'তেলাপোকা?' সবিস্ময়ে বলল রবিন।

মাথা ঝাঁকাল কেন।

'তবে আঁকব কালো ভেলভেটের ওপর। প্রদর্শনীতে যেমনটা দেখা যায় আর কী।'

'খাইছে! অত তেলাপোকা পাবে কোথায়?' মুসা বলল।

'জোগাড় হয়ে গেছে অলরেডি,' জানাল কেন। 'শুধু কালো ভেলভেট এখনও হাতে পাইনি।'

মিরা এসময় সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

'যারা ফ্যাশন শোতে অংশ নিচ্ছ, তারা আমার সঙ্গে স্টকরুমে চলো প্লিজ।'

'চলো!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল রবিন।

কেন শিপটন পিছনে রয়ে গেল। অন্যরা মিরাকে অনুসরণ করে স্টোরের পিছনদিকের রুমটায় চলে এল। ডাঁই করে রাখা গাদা গাদা বাক্স আর কাপড়ের র‍্যাক দেখা গেল এখানে।

ওদের জানা আছে কে কোন্ ড্রেস পরবে। ক'দিন আগে রিহার্সাল হয়ে গেছে। মিরা যার যার পোশাক বাছাই করে দেবার পর নেমট্যাগ ঝুলিয়ে দিয়েছে।

কিশোরের জন্য বেছে রাখা লাল জ্যাকেটটা ঝুলছে, গোলাপি রঙের প্লাস্টিকের হ্যাঙ্গার থেকে।

মিরা এক হাত উঁচিয়ে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

'শো চলার সময় তোমরা বাক্সগুলোর পেছনে চেঞ্জ করতে পারবে,' জানিয়ে দিল। 'মেয়েরা ডান দিকে, আর ছেলেরা বাঁ দিকে।'

মানি জুলি মরগ্যান ও অন্যান্য মেয়েদের উদ্দেশে বলল, 'উঁকি দিয়ো না যেন।'

পেনি হাতে ধরা পাণ্ডা বার দোলাল।

'তাকালে ভাল হবে না কিন্তু!'

ছোট বাচ্চাদের লজ্জা-শরম একটু বেশিই থাকে, হাসি চাপল কিশোর।

'মানি, পেনি,' বলল মিরা। 'চারদিকে কাপড়-চোপড় রয়েছে, এখানে আইসক্রীম খেয়ো না।'

'কিন্তু পাণ্ডা বার পকেটে রাখলে তো গলে যাবে,' আদুরে আদুরে গলায় বলল মানি।

'ওই দেয়ালটার কাছে একটা ছোট ফ্রিজ আছে,' আঙুল তাক করে বলল মিরা। 'ওখানে রেখে দাও।'

গজগজ করতে করতে যমজরা ফ্রিজটার দিকে এগিয়ে গেল।

'আচ্ছা, এবার বলো,' বলল মিরা, 'ফ্যাশন শো সম্পর্কে তোমাদের কারও কোন প্রশ্ন আছে?'

কিশোর হাত তুলল।

'এই আগস্ট মাসের গরমে আমরা শীত-পোশাকের মডেলিং করছি কেন?'

'চমৎকার প্রশ্ন করেছে, কিশোর,' সপ্রশংস কণ্ঠে বলল মিরা। 'মৌসুম আসার আগেই পোশাক প্রদর্শনী করার নিয়ম। লোকে যাতে আগেভাগে কিনে রাখতে পারে।'

'খাইছে! তারমানে ফেব্রুয়ারী মাসে বেদিং সুট বিক্রি করা হবে?' মুসা ঢোক গিলল।

এ সময় রীটাকে হন্তদন্ত হয়ে স্টকরুমে ঢুকতে দেখা গেল। ওর হাতে বড়সড়, চারকোনা একটা বাক্স।

'এটা এইমাত্র এসে পৌঁছেছে, মিরা,' বলল। 'প্যারিসের লুলু থেকে।'

'কোটটা পাঠিয়ে দিয়েছে!' মিরার কণ্ঠে উত্তেজনা। বাক্সটা খুলে ফেলল ঝটপট। হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। 'এত তাড়াতাড়ি পেয়ে যাব ভাবিনি।'

বাক্স থেকে সাবধানে ছেলেদের একটা কোট বের করল মিরা। চকচকে রুপোলী বোতামওয়ালা কালো মখমলের এক কোট।

'দুর্দান্ত!' কিশোর অস্ফুট মন্তব্য করল।

'এক্সকিউজ মি!' অপরিচিত এক কণ্ঠ।

সবাই ঘুরে দাঁড়াল কণ্ঠস্বরটা লক্ষ্য করে। রুপোলীচুলো এক মহিলা, সোনার ইয়ারিং পরে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। দামি, সুদৃশ্য এক হ্যান্ডব্যাগ কাঁধ থেকে ঝুলছে।

'আপনি কি মিরা নায়ার?' প্রশ্ন করলেন।

'মিরা আয়ার।'

'আমি মিসেস হগার্ড,' বললেন অচেনা ভদ্রমহিলা। 'আমার বাচ্চাদের জন্য কিছু হেয়ার ব্যারেট কিনতে চাই।'

'আপনার মেয়েদের বয়স কত?' মিরা জিজ্ঞেস করল।

মিসেস হগার্ড তাঁর হাতব্যাগের ভিতরে হাত ভরে দিলেন। দুটো খুদে ইয়র্কশায়ার টেরিয়ার বের করে আনলেন পরমুহূর্তে। 'মাত্র তিন বছর।'

'ডগি!' চেঁচিয়ে উঠল মানি।

'আদর করি চলো!' পাল্টা চেঁচাল পেনি।

মিসেস হগার্ড কুকুর দুটোকে মাটিতে নামিয়ে দিলেন। কোটটার দিকে দৃষ্টি তাঁর। হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করলেন।

'এরকম ব্ল্যাক ভেলভেট সচরাচর দেখা যায় না। আমি এটা কিনব।'

'এটা তো ছোটদের কোট, মিসেস হগার্ড,' বলল মিরা। 'আপনার গায়ে ফিট করবে না।'

'আমার জন্যে না তো!' ঘোষণা করলেন মিসেস হগার্ড। 'আমার সোনামণিদের কোটে নতুন কলার চাই। কালো ভেলভেটটা দারুণ মানাবে!'

'আপনার কুকুর দুটো কি আগস্টেও কোট পরে নাকি?' রুডি মার্শ প্রশ্ন করল।

মাথা ঝাঁকালেন ভদ্রমহিলা।

'এয়ারকুলারে ঠাণ্ডা লাগে ওদের।'

মিরা মাথা নাড়ল।

'সরি। ফ্যাশন শোর জন্য কোটটা আমাদের দরকার। বিক্রি করতে পারছি না।'

'হুঁহ, যত্তসব আদিখ্যেতা,' খ্যাঁক করে উঠলেন মিসেস হগার্ড। তারপর কুকুর দুটোকে তুলে নিয়ে গটগট করে বেরিয়ে চলে গেলেন।

'মিসেস হগার্ড রকি বীচের সবচেয়ে বড় বাড়িটায় থাকেন,' বন্ধুদের উদ্দেশে বলল কিশোর। 'চাচার সঙ্গে একদিন হাঁটতে বেরিয়েছিলাম, তখন

দেখিয়েছিলেন।'

'অত বড় বাড়িতে এত ছোট কুকুর রাখেন?' মুসা বলল।

মিরা এসময় কোটটা তুলে ধরল আবার।

'কে,' বলে সবার উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল সে। 'পরবে এটা?'

ছেলেরা সবাই হাত তুলল। মিরা কিশোরের দিকে চেয়ে মুচকি হাসল।

'আমি?' ঢোক গিলে বলল কিশোর।

'হ্যাঁ, তুমি,' বলল মিরা। কিশোরকে কোটটা পরতে সাহায্য করল। 'তোমার জ্যাকেটটা অন্য কেউ পরবে।'

'তোমাকে দারুণ মানিয়েছে, কিশোর,' রবিন তারিফ করে বলল।

নিজেকে রাজপুত্র মনে হচ্ছে কিশোরের। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকল না সুখকর অনুভূতিটা। কেননা গর্জে উঠেছে রুডি মার্শ।

'এটা অন্যায়! কোটটা আমাকে পরতে দেয়া উচিত!'

দুই

কিশোর হতচকিত।

রুডির দিকে চেয়ে রয়েছে সবাই। রুডি বয়সে কিশোরের চাইতে বড়। স্কুলে প্রায়ই ফ্যাশনদুরস্ত পোশাক পরে আসে।

'তোমাকে পরতে দেয়া উচিত একথা কেন বলছ, রুডি?' জিজ্ঞেস করল মিরা।

'কারণ আমি পিকচার পার্ফেক্ট মডেলিং স্কুলে ক্লাস করেছি,' বলল। কোমরে ভঙ্গি নিয়ে হাত রেখে পাঁই করে এক পাক ঘুরে নিল। সবাই মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ওর দিকে।

মিরা হেঁটে এল কিশোরের কাছে। কোটের হাতা দুটো ধরে টানল।

'হাতা দুটো তোমার জন্য একটু বড় হয়ে গেছে,' বলল। 'ঠিক ফিট করেনি।'

কিশোর আঙুল বাড়িয়ে দিল।

'কই, ঠিকই তো আছে,' বলল।

'একটু লম্বা ছেলেকে এটা ভাল মানাবে,' বলল মিরা।

'আমার মত!' খোশমেজাজে বলে উঠল রুডি।

'আমি দুঃখিত, কিশোর,' বলল মিরা।

মনটা খারাপ হয়ে গেল কিশোরের। শোতে এটা পরতে পারবে ভেবে খুশি হয়ে গিয়েছিল। মনে হলো ওর মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া হলো বুঝি।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে কোট খুলে দিল ও।

রুডির হাতে কোটটা তুলে দিচ্ছে, এসময় কেন শিপটনকে পিছনের কামরায় উঁকি মারতে দেখল। ওর চেহারায় ধূর্ততার আভাস।

ছেলেটা সব সময় একটা না একটা মতলব ভাঁজে, মনে মনে বলল

গোয়েন্দাপ্রধান। ওর মতলবটা কী এখন?

রুডি কোটটা পরল। তারপর হাসি মুখে বারবার ঘুরে ঘুরে সবাইকে দেখাল।

'খাইছে! ওর কি মাথাও ঘোরে না নাকি?' ফিসফিস করে বলল মুসা।

'সবাই ফ্লোরে চলো,' ডাকল মিরা। 'কোথায় মডেলিং করবে দেখে নাও।'

তিন গোয়েন্দা ওকে অনুসরণ করবে, এমনিসময় প্যাড আর কলম হাতে ওদের সামনে লাফিয়ে পড়ল শুঁটকি টেরি।

'আমি কাপড়ের র‍্যাকের পেছনে লুকিয়ে ছিলাম,' বলল ও। 'দারুণ একটা নিউজ হবে।'

'কীসের নিউজ?' কিশোরের প্রশ্ন।

'তুমি কোটটা পেয়েও হারালে।'

শ্রাগ করল কিশোর।

'তাতে কী?'

'তাতে এই, তুমি হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরছ। তুমি চাইবে প্রতিশোধ নিতে!'

আবার শুরু হলো, ভাবল কিশোর, শুঁটকির নোংরা খেলা।

'কোটটা আমার গায়ে লাগেনি,' বলল কিশোর।

'চলে এসো, কিশোর,' বলল রবিন, 'বুঝতে পারছি ও ফালতু খবর রটানোর সুযোগ খুঁজছে।'

স্টকরুম ত্যাগ করল ছেলেরা। প্রচুর লোক-জনকে ঢুকতে দেখা গেল স্টোরে। ফ্যাশন শো দেখতে এসেছে।

স্টোরের চারধারে চোখ বুলাল কিশোর। মিসেস হগার্ড হেয়ার ব্যারেটের একটা র‍্যাক ঘোরাচ্ছেন। কেন শিপটন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নানারকম মুখভঙ্গি করছে।

'এই কার্পেটটা হচ্ছে তোমাদের রানওয়ে,' বলল মিরা। স্টকরুমের বাইরে পেতে রাখা লালরঙা লম্বা কার্পেটটা দেখাল।

রুডি একটা হাত উঠাল।

'মডেলিং স্কুলে আমরা একে ক্যাটওয়ক বলতাম।'

'মিয়াও! মিয়াও!' পেনি বেড়াল ডাকল।

হেসে উঠল মিরা।

'রানওয়েতে হাঁটা-চলা প্র্যাকটিস করা যাক,' বলল। 'মানি, পেনি, আগে তোমরা।'

পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল যমজরা।

'ওকে,' বলল মানি। 'রেডি, সেট, গো!'

সবার চোখের সামনে কার্পেটের উপর ছোটাছুটি শুরু করল দু'ভাই।

'কী করছ কী তোমরা?' মিরা জবাব চাইল।

'রানওয়েতে দৌড়চ্ছি,' জবাব দিল পেনি।

'এটা নামেই রানওয়ে,' শুধরে দিল মিরা। 'তোমরা আস্তে-ধীরে, সুন্দর করে হাঁটবে, সবাই যাতে তোমাদের ড্রেস দেখতে পায়।'

সব কজন ছেলে-মেয়ের প্র্যাকটিস শেষ হলে দেয়াল ঘড়ি দেখল মিরা।
'দুটো বাজে প্রায়,' বলল ও। 'সবাই প্রথম প্রস্থ আউটফিট পরে ফেলো।'
সবাই ছুটল স্টকরুমের দিকে। বাক্সের পিছনে গিয়ে কাপড় পাল্টাচ্ছে। জুতো, স্কার্ফ আর সোয়েটার উড়তে লাগল চারদিকে।
'আমার ব্লু টাইটস কোথায়?'
'ভেস্টটা খুঁজে পাচ্ছি না!'
কিশোর তার লাল জ্যাকেটটা পরছে। রবিন বেচারাকে সুট পরতে হবে। টাই বাঁধতে ওকে কসরত করতে হচ্ছে রীতিমত।
'মুসা,' হাঁক ছাড়ল। 'এদিকে একটু আসবে?'
'টাই বাঁধা সত্যি বড় ঝামেলার কাজ,' কাজটা করে দিয়ে বলল মুসা।
'কিশোর, সবার আগে তুমি,' বলল মিরা। 'রেডি তো?'
ধড়াস করে উঠল কিশোরের হৃৎপিণ্ড।
'রেডি।'
রীটা সিডি প্লেয়ার চালু করে দিল, কিশোর যেই ঘর থেকে বেরোবার জন্য পা বাড়াল।
লাল কার্পেটে পা রেখে চারধারে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল কিশোর। একটা চেয়ারও খালি পড়ে নেই। পেটের ভিতর প্রজাপতি উড়ছে ওর।
'কিশোর ব্যাক-টু-স্কুল জ্যাকেটের মডেলিং করছে,' শ্রোতাদের উদ্দেশে ঘোষণা করল মিরা।
লাল কার্পেটের উপর দিয়ে সাবধানে, ধীর গতিতে হাঁটছে কিশোর। শেষপ্রান্তে পৌঁছে মৃদু হেসে ঘুরে দাঁড়াল।
'থ্যাংক ইউ, কিশোর,' মিরা বলল।
কিশোর স্টকরুমে ফিরে যাচ্ছে, এ সময় যমজরা ওর গায়ের উপর এসে আছড়ে পড়ল।
'সরোহ!' চেঁচিয়ে উঠল মানি।
হাতে বেলুন নিয়ে ছুটতে ছুটতে চলে গেল যমজরা।
'এখন আপনাদের সামনে আসছে মানি আর পেনি,' মিরার ঘোষণা এল। 'ওরা দেখাবে, যমজরাও আলাদা ড্রেস পরে।'
ফ্যাশন শো-র বাকি সময়টুকু দারুণ উত্তেজনার মধ্যে কাটল। কিশোর আর রবিন আরও তিন ধরনের আউফিটের মডেল হলো।
এবার কালো ভেলভেট কোটের মঞ্চে আসার পালা।
'সবাইকে একেবারে তাক লাগিয়ে দেব,' আত্মবিশ্বাস ঝরে পড়ছে রুডির কণ্ঠে। ঝটপট কোটটা পরে নিয়ে বেরিয়ে গেল ও।
'দেখা যাক ও কেমন করে,' বলল মুসা।
তিন গোয়েন্দা স্টকরুমের ভিতর থেকে উঁকি মেরে চেয়ে রইল।
'এবার আপনাদের সামনে আসছে,' গর্ব ভরে বলল মিরা, 'আমাদের সেরা আউটফিট!'

ঠোঁটে অহঙ্কারের হাসি নিয়ে, রানওয়ে ধরে গটগট করে হেঁটে গেল রুডি।

'রবিন? মুসা?' কিশোর ধীর কণ্ঠে বলল। 'আমি যখন কোটটা পরি তখন কি ওটার পেছনে ওই মস্ত ফুটোটা ছিল?'

'প্রশ্নই ওঠে না,' দৃঢ়কণ্ঠে জানাল মুসা। চোখ ছানাবড়া।

কিশোরের বাহু চেপে ধরল রবিন।

'কে কাটল কোটটা?'

'কে জানে। কোটটার নীচে কালো লাইনিং আছে,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'হয়তো কারও চোখে পড়বে না।'

কিন্তু ঠিক এসময় ছোট এক ছেলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে।

'মা, মা, দেখো!' চেঁচিয়ে উঠল। 'কোটের পিছনে কত বড় ফুটো!'

তিন

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা।

গোটা স্টোরে পিনপতন নিস্তব্ধতা। রুডি কাঁধের উপর দিয়ে কোটের পিছন দিকটা দেখার চেষ্টা করছে।

'সুইস পনিরের মত দেখাচ্ছে,' দর্শকদের মধ্য থেকে একটি মেয়ে বলে উঠল।

লজ্জায় মুখ লাল হয়ে গেল রুডির। এক দৌড়ে ফিরে এল স্টকরুমে।

'আজকের মত শো এখানেই শেষ হচ্ছে, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন,' ত্বরিত বলল মিরা। 'অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।'

স্টকরুমে ঢোকার সময় কিশোরকে ধাক্কা দিয়ে প্রায় ফেলেই দিচ্ছিল রুডি।

'সবাই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে!' চিৎকার করে বলল। কোটটা খুলে ফেলেছে গা থেকে। 'আমি সুপারমডেল হতে চেয়েছি–ক্লাউন নয়!'

'দর্শকরা তোমাকে দেখতে তো পেয়েছে অন্তত,' খুশির গলায় বলল জুলি মরগ্যান।

ওর দিকে দু'মুহূর্ত চেয়ে থাকল রুডি। তারপর দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

'আমি দোষের কী বললাম?' জুলি অবাক গলায় প্রশ্ন করল।

মিরা স্টকরুমে এসে ঢুকল। সোজা গিয়ে দাঁড়াল রুডির র‍্যাকের সামনে।

'মেঝেতে এটা কেন?' বলে একটা কাঁচি তুলে নিল। 'এটা তো আমার সিউয়িং বাস্কেটে থাকে।'

তারমানে এই কাঁচিটা দিয়েই অপকর্মটা করা হয়েছে, মনে মনে বলল কিশোর।

'কাজটা যে করেছে সে খোলাখুলি স্বীকার করো,' বলল মিরা। 'কথা দিচ্ছি, আমি কিছু বলব না।'

কেউ স্বীকার করল না দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মিরা।

'আমি সারা দিন স্টোরেই থাকব। কারও কিছু বলার থাকলে গিয়ে বলে এসো,' কথাগুলো বলে ঘর ত্যাগ করল।

'হাহ্-হাহ্-হা!'

হাসির শব্দে ঘুরে তাকাল তিন গোয়েন্দা।

'আমি জানতাম এরকম একটা কিছু ঘটবে।' খুশি ধরছে না শুঁটকির।

'তুমি এত নীচ!' ঘৃণা ঝরল রবিনের কণ্ঠে। 'ফ্যাশন শো বরবাদ হয়ে গেল আর তুমি মজা পাচ্ছ!'

'কী করব বলো,' বলল শুঁটকি। প্যাড দোলাল। 'আমার দরকার ছিল গসিপ, পেয়েও গেছি।'

একটু পরে ওকে ঘর ত্যাগ করতে দেখল তিন গোয়েন্দা।

'ইচ্ছা করছিল কষে দু'ঘা লাগিয়ে দিই,' দাঁতে দাঁত পিষে বলল মুসা।

'বাদ দাও শুঁটকির কথা,' বলল কিশোর। 'আমাদের সামনে অনেক কাজ পড়ে আছে।'

'কীরকম?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'জানতে হবে না, কে কোটটা কাটল?'

ঝিক করে উঠল রবিনের দু'চোখের তারা।

'তারমানেই রহস্য,' বলল হাসি মুখে।

'কথায় আছে না, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে,' বলল মুসা।

ওর কথা শুনে হেসে ফেলল গোয়েন্দাপ্রধান।

মুসা এসময় হাতঘড়ি দেখল।

'ড্যাডি একটু পরেই চলে আসবে আমাদের নিতে।'

'নো প্রব্লেম। আগে কাপড় পাল্টে নিই, তারপর ক্লু খুঁজব,' বলল কিশোর।

অন্য মডেলরা বাড়ি চলে গেছে। রয়ে গেছে শুধু কিশোর, মুসা আর রবিন।

কিশোর আর রবিন পোশাক পাল্টাবার পর, একটা বাক্সের উপর বসল তিনজন।

'ক্লু বলতে এখন পর্যন্ত ওই কাঁচিটাই,' বলল গোয়েন্দাপ্রধান। নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল।

রবিনের মুখে চিন্তার ছাপ।

'একটা ব্যাপার বুঝলাম না, কিশোর,' বলল ও। 'ঘর ভর্তি লোকের মধ্যে কোটটা কাটল কে?'

'আর আমি তো সর্বক্ষণ এই স্টকরুমেই ছিলাম,' জানাল মুসা।

'হুঁ,' বলল কিশোর। 'কিন্তু মিরা আমাদেরকে যখন রানওয়েতে নিয়ে যায় তখন কিন্তু এখানে কেউ ছিল না। অন্তত পনেরো মিনিট।'

'কালপ্রিট তখনই সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে ঢুকে পড়ে এখানে,' বলল মুসা।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'কাঁচিটা একটা জোরাল সূত্র। আরও কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখি এসো।'

ছেলেরা পিছনের কামরাটা তন্নতন্ন করে খুঁজল। হঠাৎই তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল রবিন।

'পেয়েছি! পেয়েছি!'

'কী পেয়েছ? সূত্র?' কিশোর প্রশ্ন করল।

'না!' বলল রবিন। লাল রঙের এক বেরে টুপি তুলে ধরে দেখাল। 'আমার নতুন জ্যাকেটের সাথে ভাল মানাবে। সুন্দর না?'

'এই?' হতাশ কণ্ঠে বলল মুসা। 'আমি ভাবলাম কী না কী।'

'আমরা ক্লু খুঁজছি, রবিন,' বলল কিশোর। 'কাপড় না।'

রবিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে টুপিটা রেখে দিল।

কালো কোটটা যে র‍্যাক থেকে ঝুলছিল তার নীচে চোখ রাখল কিশোর। পরমুহূর্তে চকচকে কিছু একটা দৃষ্টি কাড়ল ওর।

'রবিন, মুসা, এদিকে এসো!' জরুরী কণ্ঠে ডাকল বন্ধুদের।

চকচকে জিনিসটা কুড়িয়ে নিয়েছে গোয়েন্দাপ্রধান। বড় বড় মুক্তোখচিত সোনার এক ক্লিপ-অন ইয়ারিং।

'চেনা-চেনা লাগছে না?' বলল মুসা।

হাতের তালুর উপর ইয়ারিংটা গড়িয়ে দিল কিশোর।

'হুঁ। মিসেস হগার্ডের কানে এরকম ইয়ারিং দেখেছি।'

'কোট র‍্যাকের কাছে আসার ওঁর কী দরকার পড়ল?' সপ্রশ্ন কণ্ঠে বলল রবিন।

আঙুল মটকাল মুসা।

'কুকুরদের জন্য উনি কোটটা চাইছিলেন।'

কিশোর ক্লুটা পকেটে রাখল।

'প্রথম সাসপেক্টকে পাওয়া গেল,' বলল ও নীচের ঠোঁটে চিমটি কেটে। 'মিসেস হগার্ড।'

'আর কে কাটতে পারে কোটটা?' মুসার প্রশ্ন।

'নিচু মনের কেউ,' বলল রবিন।

ছেলেরা পরস্পর মুখ তাকাতাকি করল।

'শুঁটকি!' বলে উঠল একসঙ্গে।

'শুঁটকি গুজব রটানোর জন্য ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াচ্ছিল,' বলল গোয়েন্দাপ্রধান। 'স্টোরি বানানোর জন্য ও নিজেই ওটা কেটে থাকতে পারে।'

শুঁটকির নামটাও মনে গেঁথে নিল কিশোর।

'কেন শিপটনকেও আমার সন্দেহ হচ্ছে,' জানাল।

'কেন শিপটন?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'ও কোট কাটতে যাবে কেন?'

'ওর পেইন্টিঙের জন্য কালো ভেলভেটের দরকার, বলেছিল না?' বলল কিশোর। 'তা ছাড়া ওকে আমি কোটটার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকতে

দেখেছি।'

মাথা দোলাল রবিন।

'ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে কেসটা।'

'শুরুতেই তিনজন সাসপেক্ট আর দুটো ক্লু পাওয়া বিরাট ব্যাপার,' খুশি মনে বলল কিশোর। 'কাল আবার দেখা করছি আমরা। আলোচনা হবে কেসটা নিয়ে।'

সেদিন সন্ধ্যায় মেরি চাচীকে সালাদ তৈরি করতে সাহায্য করছিল কিশোর।

'সুপারমডেল হতে কেমন লাগল তোর?' শসা কাটার ফাঁকে জিজ্ঞেস করলেন চাচী।

লেটুস ছিঁড়ছিল কিশোর, মুখ তুলে চাইল।

'মডেলিঙের কাপড়-চোপড় পরতে ভালই লাগে, চাচী,' বলল ও। 'কিন্তু গোয়েন্দা আছি গোয়েন্দাই থাকতে চাই।'

'তারমানে চকচকে শু-র চেয়ে তোর ক্লু বেশি পছন্দ?'

হেসে ফেলল কিশোর। কেসের কথাটা চাচীকে বলতে যাবে এসময় ডোর বেলের শব্দ।

'দেখ্ তো কে এল,' বললেন চাচী। 'আমার হাত ভেজা।'

'যাচ্ছি,' বলল কিশোর।

দরজার কাছে চলে এল ও। পীপ হোল দিয়ে উঁকি দিল। কেউ নেই।

'কে?' গলা চড়িয়ে বলল কিশোর।

সাড়া পেল না দেখে দরজাটা আস্তে আস্তে খুলল ও। দোরগোড়ায় পড়ে রয়েছে এক টুকরো কাগজ।

কী এটা?

ওটা তুলে নিয়ে গুঙিয়ে উঠল কিশোর। ডয়েল নিউজ। কাগজের শিরোনামে রয়েছে: গুজব! গুজব! গুজব!

শুঁটকি দ্রুত কাজে নেমে গেছে, ভাবল কিশোর। পড়তে গিয়ে মাথা ঘুরে উঠল ওর। লেখাটা বাংলা করলে দাঁড়ায়:

'বলতে পারেন কোন্ তথাকথিত গোয়েন্দা ভেলভেটের চমৎকার কোটটা কেটেছে? জনশ্রুতি, সে নাকি হিংসায় পাগল হয়ে গিয়েছিল! বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে, সে ফ্যাশন শোতে মডেলিংও করেছে! গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে তবে কি সে ইঁদুরের মত কাপড় কাটতে লেগেছে? খাসা! পাঠক, ভেবে দেখুন তো ছন্দে কীসের সঙ্গে মিলছে?'

কিশোর কাগজটা থেকে মুখ তুলে ঢোক গিলল।

'খাসা আর পাশা!'

৮

চার

পরদিন। মুসা আর রবিনের সঙ্গে কথা বলছে কিশোর।

'শুঁটকি কোট কাটার জন্য আমাকে দায়ী করছে,' দুঃখ করে বলল।

ওরা আজও ফ্যাশন হাউজে চলেছে, যদি আর কোন ক্লু পায়।

'শুঁটকি তোমাকে দোষ দিচ্ছে কেন?' মুসা প্রশ্ন করল।

'কোটটা আমার পরার কথা ছিল, কিন্তু শেষমেশ রুডিকে পরতে দেয়া হয় তাই।'

'যাকগে, নাম তো আর উল্লেখ করেনি শয়তানটা,' রবিন বলল।

'করার দরকার পড়েনি,' জানাল কিশোর। 'ইঙ্গিতই যথেষ্ট।'

'মন খারাপ কোরো না, কিশোর,' বন্ধুকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল মুসা। 'রকি বীচের কটা ছেলে-মেয়ে ওর ফালতু কাগজ পড়ে?'

এসময় দুটো ছোট মেয়ে ওদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। কিশোরের দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসাহাসি করতে লাগল ওরা।

'কিশোর পাশার কথাই লিখেছে,' একজন বলল।

'আমিও পড়েই বুঝতে পেরেছি,' বলল অপরজন। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল দু'জনে।

'ভাল,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল কিশোর।

মেইন স্ট্রীট ধরে হাঁটছে এখন তিন বন্ধু। রবিন আচমকা বাহু চেপে ধরল কিশোরের।

'আমরা শুঁটকির কথা বলছিলাম না?' বলল। 'ওই দেখো, ফ্যাশন হাউজ থেকে কে বেরোচ্ছে।'

টেরিকে দেখা গেল এক মহিলার সঙ্গে বেরিয়ে আসছে দোকান থেকে। দেখে মনে হলো মহিলা ওদের গভর্নেস হতে পারে।

মহিলার হাতে প্রকাণ্ড এক শপিং ব্যাগ। শুঁটকির পনিটেইল হাঁটার ছন্দে লাফাচ্ছে।

'কী কিনল কে জানে,' বলল রবিন।

'শয়তান জাদুকরের হ্যাট আর ঝাড়ু হবে আর কী?' আওড়াল মুসা।

কাছেই এক ফুড শপে গিয়ে ঢুকল মহিলা। শুঁটকি বাইরে দাঁড়িয়ে জানালায় চোখ রাখল। ও যেই ঘুরে দাঁড়াল, চমকে উঠল কিশোর।

'মুসা! রবিন!' জরুরী কণ্ঠে বলল। 'শুঁটকির পনিটেইলে একটা কালো বো। দেখে মনে হচ্ছে ভেলভেট।'

'কোটের সেই ভেলভেট নয় তো?' মুসার জিজ্ঞাসা।

'ওটা হলে তো হাতেনাতে ধরেই ফেলব।'

'এখান থেকে দেখে কী মনে হচ্ছে, ওটাই?' রবিন জানতে চাইল উত্তেজিত কণ্ঠে।

'কোটের ভেলভেটটা ছিল পুরু আর মোলায়েম,' জানাল কিশোর। 'জীবনেও ভুলব না।'

মুসা চোখ সরু করে রাস্তার ওপারে চেয়ে রয়েছে।

'ওর ঘাড়টা চেপে ধরে কেড়ে নিয়ে আসি বো-টা?' দাঁতের ফাঁকে বলল।

'না, না,' আপত্তি করল কিশোর। 'কাজটা কৌশলে সারা যায় কিনা দেখো।'

'সেটা সম্ভব ও যদি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে তবেই,' বলল রবিন। 'কিন্তু শুঁটকি তো সর্বক্ষণ ছটফট করছে।'

এসময় ফ্যাশন হাউজের জানালায় চোখ সেঁটে গেল কিশোরের। পুরোদস্তুর পোশাক পরা একটা ম্যানিকিন। ঠিক ওদের বয়সী একটি কিশোরের মত লাগছে। ওটাকে দেখেই বুদ্ধি খেলে গেল গোয়েন্দাপ্রধানের মাথায়।

'শুঁটকিকে ঠায় দাঁড় করিয়ে রাখার একটা উপায় পেয়েছি,' ধীরে ধীরে বলল ও।

'কীভাবে?' রবিন কৌতূহলী হলো।

ওর দিকে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর।

'রবিন, ডামি সাজবে?'

'মানে?'

'মানে খুব সোজা—ম্যানিকিন,' বলল কিশোর।

'বলতে চাইছ আমাকে পুতুলের মত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে?'

হাসল কিশোর।

'আমিও থাকব,' বলল। 'ও যদি ফাঁদে ধরা দেয় তবেই কেল্লা ফতে। মুসা ওর মাথা থেকে খুলে নেবে বো-টা।'

'পারবে না, মুসা?' রবিন বলল। 'আলগোছে ওর পিছনে গিয়ে এক টানে খুলে নিতে?'

'পারব না মানে,' বলে উঠল মুসা। পায়ের দিকে আঙুল ইশারা করল। 'স্নিকার পরি কী করতে?'

মুসা এপারে অপেক্ষা করতে লাগল। ওদিকে, কিশোর আর রবিন তড়িঘড়ি হেঁটে চলে এল শুঁটকির কাছে।

'হাই, টেরি,' বলল কিশোর।

শুঁটকি ঘুরে দাঁড়ালে ওর কালো বো নড়ে উঠল।

'আমার আজকের গসিপ কলামটা দেখেছ?' বাঁকা হেসে প্রশ্ন করল।

'দেখেছি,' বলল কিশোর। 'কিন্তু কাকে নিয়ে লিখেছ তা বুঝিনি।'

'আমিও বুঝিনি,' সায় জানিয়ে বলল রবিন।

কিশোর তিন পর্যন্ত গুণল। তারপর কাঠ-পুতুল বনে গেল। ওর দেখাদেখি একই কায়দা ধরল নথিও।

'এ আবার কী?' শুঁটকি অবাক।

'বুঝতে পারলে না?' মাথায় দু'হাত রেখে বলল রবিন। 'আমরা ডামি।'
'তাতে কোন সন্দেহ নেই,' তীব্র তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল শুঁটকি।
'আমরা ম্যানিকিন,' শুধরে দিল কিশোর।
'কী কারণে, জানতে পারি?' সুর করে প্রশ্ন করল শুঁটকি।
'মিরা আমাদেরকে ওর জানালায় দাঁড়িয়ে কাপড়ের মডেলিং করতে বলেছে,' বলল গোয়েন্দাপ্রধান। 'তাই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা প্র্যাকটিস করছি।'
শুঁটকি ওর কথায় কান না দিয়ে হাঁটা ধরল।
'পাগলামি আর কাকে বলে!'
'তা তো বলবেই,' ফুট কাটল কিশোর। 'করে দেখতে গেলে বোঝা যায় কত কঠিন।'
'তোমার দ্বারা সম্ভব না,' যোগ করল রবিন।
থমকে দাঁড়িয়ে গেল শুঁটকি।
'কী বলতে চাও তোমরা?' খেঁকিয়ে উঠল। 'পারি কিনা দেখতে চাও?' পরমুহূর্তে, শূন্যে হাত দুটোকে নিথর রেখে চিবুক সোজা করল ও।
'দারুণ তো!' প্রশংসা করল কিশোর মনে মনে। শুঁটকি মুসার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছে বলে আরও খুশি হলো।
'দেখি কতক্ষণ ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারো,' চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল ও।
চোখের কোণে লক্ষ করল মুসা রাস্তা পার হচ্ছে। পা টিপে টিপে শুঁটকির দিকে এগোচ্ছে ও।
সব ঠিকঠাক, ভাবল কিশোর।
হঠাৎ জোরাল গুঞ্জনের শব্দ কানে এল ওর। মাথার উপরে একটা মাছি চক্কর কাটছে!
ভনন! ভনন! ভনন!
হাত নেড়ে ওটাকে সরাতে চাইছে কিশোর। কিন্তু ওকে তো কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।
ঠিক ওর নাকের ডগায় এসে বসল মাছিটা।
জলদি করো, মুসা–বলল মনে মনে। নাক চুলকাচ্ছে, অথচ হাত দেওয়ার উপায় নেই। জলদি!
কিন্তু হলো না। নাক সুড়সুড় করে উঠলে হাঁচি পেয়ে গেল ওর।
ওকে হাঁচতে দেখে চমকে উঠল রবিন। ফলে, দু'জনেরই ভঙ্গি গেল বদল হয়ে।
এসময় চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল শুঁটকি।
'মুসা আমান!' চেঁচিয়ে উঠল। 'তুমি আমার পিছনে কী করছ?'
শ্রাগ করল মুসা। হাতে ওর কালো বো-টা।
'আমার বো!' বলে পিছনে হাত দিয়ে পনিটেইল স্পর্শ করল শুঁটকি। 'তুমি আমার ভেলভেট বো চুরি করেছ!'

পাঁচ

'মুসা তোমার বো চুরি করেনি,' জোর দিয়ে বলল কিশোর।
'করেছে!' গর্জন ছাড়ল শুঁটকি। 'আর তুমি ওকে দিয়ে চুরিটা করিয়েছ!'
'আমি?' বলল কিশোর।
শুঁটকি মাথা ঝাঁকাল।
'জি। তুমি যে শুধু কাঁচি চালাও তাই না, তুমি একটা চোরও!'
কিশোর ছোঁ মেরে মুসার হাত থেকে বো-টা কেড়ে নিল।
'আমি যদি কাঁচি চালাই, তা হলে এটা কী?'
শুঁটকির নাকের সামনে বো-টা দোলাচ্ছে, এসময় এক টুকরো কাগজ দেখতে পেল কিশোর–পিছনে স্ট্যাপ্‌ল্ করা। ফ্যাশন হাউজের প্রাইস ট্যাগ।
'একটু আগে কিনেছি ওটা,' ভ্রূ কুঁচকে বলল শুঁটকি। 'বাইরে এসে পরেছি। ওটা দিয়ে দাও বলছি!'
আঙুলে বো-টার স্পর্শ নিল কিশোর। ওই কোটটার মত পুরু আর মোলায়েম নয়।
'সরি, টেরি,' বলে বো-টা বাড়িয়ে দিল কিশোর। 'আমরা আসল কাট-আপকে ধরতে চাইছি বলে নাটকটা করতে হলো।'
থাবা মেরে কেড়ে নিল জিনিসটা শুঁটকি।
'তাকে ধরতে আবার এসব করতে হয় নাকি? আমি তো কাগজে সূত্র দিয়েই দিয়েছি।'
ছেলেরা পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল।
'ইন ফ্যাক্ট,' বলে নাক উঁচু করল শুঁটকি। 'আমি ডয়েল নিউজকে ডেইলি পেপার করব ভাবছি। যাতে প্রতিদিন গসিপ কলাম লিখতে পারি।'
'খাইছে!' আওড়াল মুসা।
শুঁটকি বো-টা বেঁধে নিল লম্বা চুলে। তারপর যার সঙ্গে এসেছিল, সেই মহিলাকে বেরোতে দেখে এগিয়ে গেল।
'চলো, আমরা ফ্যাশন হাউজে যাই,' প্রস্তাব করল কিশোর। 'মিরা হয়তো তদন্তের কাজে হেল্প করবে আমাদের।'
কিন্তু ওরা যখন স্টোরের ভিতরে ঢুকল, মিরা ওদেরকে ক্লু দিতে রাজি হলো না।
'একবার শুধু একটু উঁকি মেরেই চলে আসব,' বলল রবিন।
মাথা নেড়ে সাফ নিষেধ করে দিল মিরা।
'এখন থেকে স্টকরূম বন্ধ থাকবে।'
'ও, আচ্ছা,' বলল গোয়েন্দাপ্রধান। স্টোরের সামনের দিকে হেঁটে এসেছে,

জুয়েলারি কাউন্টারের উপর একটা কাগজ চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে দেখতে পেল। ডয়েল নিউজের একটা কপি।

'তাই তো বলি,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'মিরাও আমাকে সন্দেহ করছে!'

'শুঁটকির মাথাটা ভেঙে দিতে ইচ্ছা করছে আমার!' দাঁত কিড়মিড় করে বলল মুসা। 'ওকে হাতের কাছে পেলে দেখে নিতাম।'

দোকান ত্যাগ করল ওরা। বাইরে এসে এক বেঞ্চির উপর বসল।

'শুঁটকিকে সন্দেহ তালিকা থেকে বাদ দেয়া যায়,' বলল গোয়েন্দাপ্রধান।

'তারপরও দু'জন থাকে,' বলল রবিন। 'মিসেস হগার্ড আর কেন শিপটন।'

'কেন তোমার বাসার কাছেই থাকে, কিশোর,' বলল মুসা। 'লাঞ্চের পর ওকে চেক করলে হয় না?'

'লাঞ্চের পর কিশোর তো প্রায়ই বাঘাকে নিয়ে হাঁটতে বেরোয়,' বলল রবিন। 'ঠিক না, কিশোর?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। পরমুহূর্তে মাথায় একটা বুদ্ধি ঝিলিক দিয়ে গেল ওর।

'মানি আর পেনি তো কুকুর ভালবাসে, তাই না?' বন্ধুদের উদ্দেশে বলল।

'হ্যাঁ,' একসঙ্গে জানাল রবিন ও মুসা।

'ওরা যখন বাঘাকে আদর করবে, সেই সুযোগে আমরা কেনের ওপর তদন্ত চালাব,' বাতলে দিল কিশোর।

'সাবাস!' বলে উঠল মুসা।

কিশোরের বাসায় ফিরে এল তিন বন্ধু। মেরি চাচী রবিন ও মুসাকে খেয়ে যেতে বললেন। ওরা বাসায় ফোন করে অনুমতি নিয়ে নিল।

মেরি চাচীর বানানো টিউনা সালাদ স্যান্ডউইচ চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা। বাঘাকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে এল কেন শিপটনদের ব্লকে।

'ওর ঘরটা সার্চ করতে না হলেই বাঁচি,' বলল রবিন।

'ওর পোষা ইগুয়ানার জন্য বলছ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না,' বলল রবিন। নাক টিপে ধরল। 'ওর মোজার দুর্গন্ধের জন্য।'

ওরা গিয়ে দেখল মিসেস শিপটন বাগান পরিচর্যা করছেন। ওদেরকে দেখে হাসলেন ভদ্রমহিলা, বাঘাকে হাত বুলিয়ে আদর করলেন।

'কেমন আছ তোমরা?' কুশল জানতে চাইলেন।

'ভাল, মিসেস শিপটন,' বলল কিশোর। 'কেন, মানি, পেনি ওরা বাসায় আছে?'

'হ্যাঁ,' জানালেন তিনি। 'মানি-পেনি উপরতলায় ফিঙ্গার পেইন্টিং করছে। কেন আছে পিছনের উঠনে। ও-ও আঁকাআঁকি করছে।'

'কেন কি তেলাপোকা আঁকছে?' নাক কুঁচকে প্রশ্ন করল রবিন।

'হ্যাঁ,' বললেন মিসেস শিপটন। 'কালো রঙের কীসের ওপরে যেন।'
কালো? চমকে গেল কিশোর।
'মিসেস শিপটন,' স্বাভাবিক গলায় বলল ও। 'আমরা কেনের সাথে একটু কথা বলে আসি?'
মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন মিসেস শিপটন।
'বেশ তো, যাও না। ও খুশি হবে বন্ধুদের দেখলে।'
"বন্ধুদের" শুনে শ্বাস টানল মুসা, স্পষ্ট শুনতে পেল কিশোর।
'ধন্যবাদ, মিসেস শিপটন,' বলল ও। শিকল ধরে টানল বাঘাকে।
বাড়িটাকে এক পাক দিয়ে পিছনে এল ওরা।
'ওই যে!' গলা খাদে নামিয়ে বলল কিশোর।
ইজেল সামনে নিয়ে বসেছে কেন শিপটন। পাশে ছোট টেবিলের উপর কাঁচের এক জার রাখা।
'দিলে তো আলো বন্ধ করে,' তিন গোয়েন্দা কাছিয়ে এলে বিরক্তির সুরে বলল কেন। 'আর আমার বিলিকেও ভয় পাইয়ে দিয়েছে তোমাদের কুকুরটা।'
'বিলি কে?' কিশোরের প্রশ্ন।
কাঁচের জারটা দেখাল কেন। জারের ভিতরে ইয়া বড় এক তেলাপোকা।
ঘেন্নায় নাক কুঁচকে গেল রবিনের।
'লোকে বিলিকে পানির পোকা বলে,' ব্যাখ্যা করল কেন। 'কিন্তু আমি ওকে স্রেফ একটা বড়সড় তেলাপোকা মনে করি।'
কালো এক টুকরো জিনিসের উপর তেলাপোকাটাকে আঁকছে কেন দেখে নিল কিশোর।
নীচের দিকে চোখ গেলে আরেকটা জিনিস নজরে এল। কেন শিপটনের পাশে একই ধরনের জিনিসের আরেকটা ছোটখাট স্তূপ।
'কালো ভেলভেটের উপর আঁকছে নাকি, কেন?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।
পেইন্টব্রাশ তুলে ধরল কেন।
'হতেও পারে, নাও হতে পারে,' বলল।
কিশোর হাত বাড়াল জিনিসগুলোর উপর।
'কোথায় পেয়েছ?'
কেন শিপটন তার আগেই ধপ করে বসে পড়ল ওগুলোর উপর।
'তাতে তোমার কী?' পাল্টা প্রশ্ন করল।
মুসা এগিয়ে এল কেনের কাছে।
'গতকাল ফ্যাশন হাউজে যে ভেলভেটের কোটটা কাটা হয়েছে এগুলো সেই কাপড়।'
'তুমি কেটেছিলে ওটা, কেন?' কিশোর জবাব চাইল।
শ্রাগ করল ছেলেটি।
'হয়তো, হয়তো নয়।'
বাঘা দৌড়ে গেল। কেন বসেছে, সেই আসনটা কামড়ে ধরে টানতে লাগল।

'অ্যাই, সরাও ওকে!' চেঁচিয়ে উঠল কেন।

কিশোর বাঘাকে সরিয়ে নেবে, এ সময় কারা যেন খিলখিল করে হেসে উঠল।

যমজ ভাইদেরকে ডাক দিল কেন শিপটন। 'কুকুরটাকে দেখে যাও।'

ছেলেরা ঘুরে দাঁড়াল। যমজ ভাইরা বাড়ির পিছন থেকে উঁকি দিয়ে দেখছে।

পরমুহূর্তে কুকুর দেখে সোৎসাহে ছুটে এল।

সভয়ে শ্বাস চাপল কিশোর। রঙমাখা হাত নিয়ে ছুটে আসছে দু'ভাই।

ছয়

'করো কী! করো কী!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। কিন্তু কে শোনে কার কথা। বাঘাকে নানা রঙে রঙিন করার খেলায় মেতে গেল যেন দু'ভাই। শীঘ্রি সবুজ, লাল, হলদে ডোরা আঁকা হয়ে গেল বাঘার সারা গায়ে।

'হয়েছে, হয়েছে!' বলে মুসা যমজদের টেনে সরিয়ে দিল।

কিশোর কেন শিপটনের পেইন্টিংটা কেড়ে নিয়ে শূন্যে তুলে ধরল।

'দিয়ে দাও বলছি!' কেন গর্জে উঠল।

'আগে বলো কালো কাপড়টা কোথায় পেয়েছ,' বলল কিশোর।

'বলছি, বলছি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল কেন। 'এত যখন শোনার শখ।'

কালো জিনিসটা তুলে নিল কেন। ঝাড়া দিল বার কয়েক। অসংখ্য ফুটো দেখা গেল ওটার মধ্যে।

'এটা ছিল আমার জাদুকরের আলখেল্লা,' বলল ও। 'যখন আমি গ্রেট ম্যাজিশিয়ান হতে চাইতাম।'

'কাটলে কেন?' রবিনের প্রশ্ন।

'রেখে কী লাভ?' বলল কেন। 'আমি তো এখন বড় শিল্পী।'

কিশোর ভাল মত স্পর্শ করে দেখল কাপড়টা। ভেলভেট নয়। হতাশ হয়ে পড়ল ও।

'এবার দয়া করে আমাকে একটু কাজ করতে দাও,' বলল কেন শিপটন। 'কালকে বিকেলে আমার প্রথম আর্ট শো কিনা।'

'শিয়োর,' বিমর্ষ কণ্ঠে বলল কিশোর।

'আমরা তোমাকে আর বিরক্ত করব না,' বলল মুসা।

'বাঁচালে,' হাঁফ ছেড়ে বলল কেন শিপটন।

কেন আর যমজদের কাছ থেকে বিদায় নিল তিন গোয়েন্দা। বাইরে বেরিয়ে এল।

'কেন শিপটন একদম পরিষ্কার,' বলে বাঘার দিকে চাইল কিশোর। 'কিন্তু বাঘা নয়।'

'এখন বাকি থাকলেন শুধু মিসেস হগার্ড,' বলল রবিন।
'এখনই যাব আমরা, কিশোর?' মুসা জিজ্ঞেস করল।
মাথা নাড়ল গোয়েন্দাপ্রধান।
'কালকে যাই,' প্রস্তাব করল। 'বাঘাকে গোসল করাতে হবে তো।'
নোংরা একটা থাবা মাথায় রাখল বাঘা, তারপর জোরে বার দুয়েক হুফ-হুফ করে উঠল।

'একদম নড়বি না, চুপ করে বসে থাক!' ইয়ার্ডে বাঘার গা ঘষছে কিশোর। ... চলে গেছে বাসায়।
বিশাল মেটাল বেসিনটা থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল বাঘা। সারা গায়ে সাবান মাখা।
হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল কিশোর। লাল-হলুদ-সবুজ রং এখনও লেগে রয়েছে বাঘার লোমে।
'ঠিক আছে, বাঘা, আমাকে গোসল করাতে দিলি না তো,' বলল কিশোর, 'কালকে তোকে ড্যাশিং ডগ পেট সেলুনে নিয়ে যাব। তারপর দেখব বিদঘুটে রং নিয়ে ঘুরিস কী করে।'
এই কথা শুনে বাঘা গা ঝাড়া দিল। ছিটকে সরে গেল কিশোর।
আর এসময় কার যেন তীক্ষ্ণ চিৎকার ওর কানে এল। মুখ তুলে চেয়ে দেখে সাবান-পানির ছিটে মেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে রুডি মার্শ।
'রুডি!'
'থ্যাংকস আ লট,' কোনমতে আওড়াল রুডি। 'দিলে তো ধোয়া কাপড়টার বারোটা বাজিয়ে।'
'বাঘা আসলে বুঝতে পারেনি,' সাফাই গাইল কিশোর।
'কিন্তু তুমি পেরেছিলে,' কাটখোট্টা জবাব দিল রুডি।
'তারমানে?'
'তুমি বুঝেশুনে ঠাণ্ডা মাথায় কালো কোটটা কেটে দিয়েছিলে,' বলল রুডি। 'কেননা তুমি ওটা পরতে পারোনি। রকি বীচের সব ছেলে-মেয়েরা এই কথাই বলছে।'
চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল কিশোরের। গুজবটা এভাবে বাতাসের বেগে ছড়িয়ে পড়বে ভাবতে পারেনি ও।
'ওরা ফালতু কথা বলছে, রুডি,' বলল ও মৃদু কণ্ঠে। 'আমি কখনোই অমন ছোটলোকি কাজ করব না।'
'অথচ করেছ,' চিবুক বাড়িয়ে দিয়ে বলল রুডি। 'এবং একাজে অন্যদের সাহায্যও নিয়েছ।'
এক কপি ভেজা ডয়েল নিউজ তুলে ধরল রুডি।
'পড়ে দেখো!'
গসিপ ছাপা হয়েছে প্রথম পৃষ্ঠায়। জোরে জোরে পড়ল কিশোর: 'প্রিয় বন্ধুর

জানা কারা সব কিছু করতে প্রস্তুত? সূত্র দিচ্ছি: সাদা-কালো।'
কান গরম হয়ে গেল গোয়েন্দাপ্রধানের। রবিন আর মুসার প্রতি ইঙ্গিত করেছে শুঁটকি।
'একদম বাজে কথা!' দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করল ও। কিন্তু রুডি মার্শ ততক্ষণে দুপ দাপ পা ফেলে গেটের দিকে চলেছে।
কিশোর হাঁটু গেড়ে বসে বাঘার ভেজা শরীরে হাত বুলোতে লাগল।
'রহস্যটার কিনারা না করলেই নয়,' মনে মনে বলল। 'শুঁটকি আমার প্রিয় বন্ধুদের ঘাড়েও দোষ চাপিয়েছে!'

সে রাতে চাচা-চাচীর সঙ্গে ডিনারে বসে প্রসঙ্গটা তুলল কিশোর।
'চাচা, শুঁটকি একটার পর একটা মিথ্যে গুজব রটাচ্ছে। কী করব আমি?'
'তোর উচিত মাথা গরম না করা,' পরামর্শ দিলেন চাচা। চিকেনে গোলমরিচের গুঁড়ো ছিটালেন। 'সত্য কখনও চাপা থাকে না।'
'তোর চাচা ঠিক কথাই বলেছে,' বললেন মেরি চাচী। 'দেখিস, মিথ্যে বেশিদিন টিকবে না।'
দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর। ষড়যন্ত্রের জাল যত শীঘ্রি ছিন্ন হয় ততই মঙ্গল।

পরদিন সকালে মুসা আর রবিনের সঙ্গে দেখা করল ও। বাঘাকে নিয়ে ড্যাশিং ডগ পেট সেলুনের উদ্দেশে রওনা হলো ওরা।
'শুঁটকির এতদূর বাড় বেড়েছে যে সাদা-কালোর কথা পর্যন্ত তুলে ফেলেছে,' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল রবিন।
'ওর যা খুশি বলুক,' বন্ধুকে শান্ত করার জন্য বলল মুসা। 'আমাদের কী?'
মেইন স্ট্রীট দিয়ে হাঁটছে ওরা। সাইডওয়কে রঙিন চকে লেখা একটা মেসেজ চোখে পড়ল কিশোরের। লিখেছে: 'কিশোর পাশার নাম এখন থেকে কোট-কাটা কিশোর।'
কিশোরকে মাথা নাড়তে দেখে ওর হাত চেটে দিল বাঘা।
'গুজবটা ওরা মেইন স্ট্রীটেও পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছে!'
ড্যাশিং ডগে গিয়ে ঢুকল ছেলেরা।
কিশোর আগে এখানে আসেনি। গোলাপি রঙের আসবাব দিয়ে সাজানো সেলুনটা। সুন্দর সব কুকুরের ছবি সেঁটেছে দেয়ালে।
'হ্যালো। আমার নাম রয়,' ডেস্কের পিছনে বসা লোকটি বলল। 'কী দরকার বলো।'
ইঙ্গিতে বাঘাকে দেখাল কিশোর।
লোকটি বহুবর্ণ বাঘার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।
এসময় দরজা খুলে গেল।
'আরে, মিসেস হগার্ড যে!' বলে উঠল লোকটা। 'আসুন, আসুন।'
চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল কিশোর।

দরজার কাছে, কোলে খুদে কুকুর দুটো নিয়ে দাঁড়িয়ে মিসেস হগার্ড।
কুকুর দুটোর গায়ে ছোট লাল কোট—আর গলায় দামি চকচকে কালো ভেলভেটের কলার!

সাত

'কিশোর,' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'দেখেছ?'
উপরে-নীচে মাথা নাড়ল কিশোর। মিসেস হগার্ডের দিকে চেয়ে রয়েছে। ভদ্রমহিলা কথা বলছেন রয়ের সঙ্গে।
'বেশ গরম লাগছে এখানে,' বললেন মিসেস হগার্ড।
'একেই বোধহয় বলে আগস্টের ডগ ডে,' বলল রয়।
'আমার কাছে সারা বছরই ডগ ডে!' কুকুর দুটোকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে বললেন ভদ্রমহিলা।
'জলদি লুকিয়ে পড়ো,' কিশোর বলল বন্ধুদের উদ্দেশে। 'আমি চাই না উনি আমাদেরকে দেখে ফেলুন।'
বাঘার শিকল ধরে টান দিল কিশোর। ঘাপটি মারল গোলাপি রঙের এক পর্দার পিছনে। ওর দেখাদেখি একই কাজ করল মুসা ও রবিন।
'কিশোর!' গলা নামিয়ে ডাকল রবিন। 'আমরা একা নই। দেখেছ!'
ঘুরে তাকাল কিশোর। উঁচু টেবিলে বসে দুটো কুকুর। কোঁকড়াচুলো এক পুড্‌ল্, আর তোয়ালে মোড়া এক বুলডগ।
'শশ,' কুকুর দুটোকে লক্ষ্য করে বলল কিশোর। ঠোঁটে আঙুল রেখেছে।
'বিশ্বাস করতে পারো, মিসেস হগার্ডের কুকুরদের গলায় কালো ভেলভেটের কলার!' মুসা ফিসফিসে কণ্ঠে বলল।
'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'দেখা যাক, ঘটনা কদ্দূর গড়ায়।'
হঠাৎ মৃদু এক গর্জন কানে এল ওদের। নীচের দিকে তাকাল কিশোর। ছোট্ট এক ইয়র্কি পর্দার আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে।
'মিসেস হগার্ডের ঝাড়ন,' বলল মুসা। 'এই যা, ভাগ্!'
অপর ইয়র্কিটাও এসে উঁকি মারছে। গা শুঁকছে বাঘার। এবার ডাক ছাড়তে শুরু করল।
'খাইছে!'
'কী হচ্ছেটা কী ওখানে?' সামনে থেকে শোনা গেল রয়ের গলা।
বাঘা পাল্টা ঘেউ-ঘেউ করে পর্দার নীচ দিয়ে সাঁত করে বেরিয়ে গেল। তিন গোয়েন্দা ওর পিছু-পিছু ছুটল।
'বাঘা, ফিরে আয় বলছি!' কিশোর হাঁক ছাড়ল।
খুদে ইয়র্কি দুটো বাঘাকে তাড়া করে বেড়াতে লাগল ওয়েটিং রুম জুড়ে।

এক মহিলা ম্যাগাজিন পড়ছিলেন, চেঁচিয়ে উঠলেন। এক ভদ্রলোক তাঁর চিহুয়াহুয়া চেপে ধরলেন বুকের সঙ্গে।

কুকুর তিনটে সোফা আর চেয়ার টপকে ছুটে বেড়াচ্ছে।

'ওই ধাড়ি কুকুরটা আমার সোনামণিদেরকে তাড়া করছে!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস হগার্ড।

'ব্যাপারটা ঠিক তার উল্টো!' বাঘাকে ধরার চেষ্টারত কিশোর বলল।

কুকুরগুলোর লাথি খেয়ে এদিক-সেদিক উড়ছে ম্যাগাজিন। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই ওদের। ঘরময় ছোটাছুটি করেই চলেছে। তার সঙ্গে সমান তালে চলেছে হাঁক-ডাক।

'স্টপ!' গর্জে উঠল রয়। 'ডাউন! হীল!'

ইয়র্কি দুটো বাঘার গায়ে লাফিয়ে উঠে ঘেউ-ঘেউ করতে লাগল। বাঘা কেঁউ-কেঁউ করে নালিশ জানাল। শেষমেশ আর না পেরে দৌড়ে এসে আশ্রয় নিল কিশোরের কাছে। ওর মাথা চাপড়ে আদর করল কিশোর। ওদিকে মিসেস হগার্ড তার কুকুরছানাদের পরম আদরে কোলে তুলে নিলেন।

'আমার সোনামণিদের কোট আরেকটু হলেই ছিঁড়ে দিয়েছিল ধাড়িটা,' চোখ পাকিয়ে বললেন।

মুসার হাতে বাঘার শিকলটা ধরিয়ে দিল কিশোর। গিয়ে গেল মিসেস হগার্ডের কাছে।

'কালো কলার দুটো কোথায় পেলেন, মিসেস হগার্ড?'

'তোমার চাই নাকি?' জবাবটা দিল রয়। 'আরও আছে আমার কাছে।'

কিশোর ঘুরে দাঁড়াল।

'আমার ডগি ফ্যাশন কালেকশনের কোট ওগুলো,' জানাল রয়। 'আজ ডিসপ্লে দেব।' বলে একটা বাক্স ডেস্কের নীচ থেকে টেনে বের করল।

বাক্সের ভিতর উঁকি দিল কিশোর। খুদে হ্যাট, সোয়েটার আর কোটে ঠাসা ওটা। অনেকগুলোরই দেখা গেল কালো ভেলভেটের কলার।

'রয় কাল আমাকে এগুলো দেখিয়েছে,' বললেন মিসেস হগার্ড। 'কালো ভেলভেটের কলারওয়ালা কোট দেখেই মনে ধরে যায় আমার।'

'তা হলে ফ্যাশন হাউজের কালো কোটটা কিনতে চাইছিলেন কেন?' কিশোর প্রশ্ন করল।

'ওটা তো দারুণ দেখতে,' বললেন ভদ্রমহিলা। 'আমার নাতনীকে খুব মানাত।'

'আপনার নাতনী?' বলে পকেট থেকে মুক্তার ইয়ারিংটা বের করে দেখাল কিশোর। 'কালকে এটা ফ্যাশন হাউজে পেয়েছি আমরা।'

ইয়ারিং দেখে হাসলেন মিসেস হগার্ড।

'কোটের সাইয দেখছিলাম,' বললেন। 'তখন হয়তো পড়ে গেছে। স্টকরূমে তখন আমি ছাড়া কেউ ছিল না।'

আচ্ছা, তা হলে ব্যাপারটা এই, মনে মনে বলল কিশোর। ইয়ারিংটা

ফিরিয়ে দিল।

'আচ্ছা, চলি,' বললেন মিসেস হগার্ড। 'রয়কে দেখাতে এসেছিলাম আমার সোনামণিদের নতুন পোশাকে কেমন দেখাচ্ছে।'

সেলুন ত্যাগ করছেন তিনি, খুদে কুকুর দুটো শেষবারের মত ঘেউ-ঘেউ করে গেল বাঘার উদ্দেশে।

'আমার কাছে চমৎকার এক ডেনিম জ্যাকেট আছে,' বলে হাতে হাত ঘষল রয়। 'বাঘাকে খুব মানাবে। দেখাব?'

'দরকার নেই,' জানাল কিশোর। 'গোসল করালেই ওর রূপ খুলে যাবে।'

বাঘার শিকল ধরল রয়।

'এক ঘণ্টা পরে এসে নিয়ে যেয়ো।'

ড্যাশিং ডগ ত্যাগ করল ছেলেরা।

'মিসেস হগার্ডও ফসকে গেল,' হতাশ কণ্ঠে বলল রবিন। 'এখন আর বাকি থাকল কে?'

নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল গোয়েন্দাপ্রধান।

'কেউ না। অথচ যা করার শীঘ্রি করতে হবে,' বলল। 'নইলে শুঁটকি যাতা কথা লিখতেই থাকবে।'

মেইন স্ট্রীট ধরে হাঁটছে, ছোটখাট এক জটলা চোখে পড়ল ওদের।

'কী হচ্ছে ওখানে?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'আর্ট শো,' বলে কাছিয়ে গেল কিশোর। 'কেন শিপটনের আর্ট শো!'

সাইডওয়কে সারি দিয়ে রাখা কেনের আর্টওয়র্ক। পিঁপড়ে, ফড়িং অবশ্যই বিলির ছবি শোভা পাচ্ছে সেখানে।

'তুমি কোথা থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছ?' এক লোক শিল্পীকে প্রশ্ন করল।

বিলির কাঁচের জারটা উঠিয়ে দেখাল কেন।

'পাথরের তলা থেকে।'

কিশোর লক্ষ করল একটা পেইন্টিং অন্যগুলোর চাইতে আলাদা। পোকা-মাকড়ের বদলে বাদামী-সাদা এক ছোপ।

রবিনেরও দৃষ্টি কেড়েছে ছবিটা।

'কেউ মনে হয় পোকাটাকে মাড়িয়ে দিয়েছিল,' বলল।

'পোকার মত লাগছে না আমার কাছে,' কিশোর বলল। কাছ থেকে খুঁটিয়ে পরখ করল। বাদাম আর চকোলেট চিপ ছিটিয়ে তৈরি করা হয়েছে প্রলেপটা। 'আইসক্রীম।'

মুসা একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে ছোপটার দিকে।

'খাইছে! পাণ্ডা বার আইসক্রীম!' চেঁচিয়ে উঠল ও।

'আর খেয়াল করে দেখো,' বলল কিশোর। 'ছবিটার নীচে কেন শিপটনের সই নেই। আছে মানি আর পেনির।'

কালো পটভূমিটা পরিচিত ঠেকল কিশোরের চোখে। হাত বাড়াল ছোঁয়ার জন্য। পুরু আর মোলায়েম।

'রবিন! মুসা!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল কিশোর। 'এটাই সেই কালো কোটের ভেলভেট!'

আট

খপ করে কে যেন চেপে ধরল কিশোরের কব্জি। চেয়ে দেখে মানি। হাসছে কান অবধি।

হাত ছাড়িয়ে নিল কিশোর। পাণ্ডা বার আইসক্রীমের ছবিটা দেখিয়ে বলল, 'ওটা এল কোত্থেকে?'

গর্বের হাসি হাসল মানি।

'কেনের প্রদর্শনীতে সুযোগ পেয়ে ঢুকে পড়লাম।'

'তোমার পছন্দ হয়েছে?' পেনি জিজ্ঞেস করল।

'না,' সাফ জবাব দিল কিশোর। 'চেরি ভ্যানিলা পাণ্ডা বার হলে পছন্দ হত।'

পরস্পর মুখ তাকাতাকি করল যমজরা। চোখে হতাশা।

'ওটা তো আইসক্রীমের দাগ, তাই না?' গোয়েন্দাপ্রধানের কণ্ঠে কৈফিয়ত তলবের সুর।

'না তো!' ফস করে বলে দিল মানি।

'তা হলে কী ওটা?' মুসার জিজ্ঞাসা।

'উমঃ...মেরু ভালুক,' পেনি জানাল।

'কাদা-ধসের মধ্যে পড়ে গেছে,' জোগান দিল মানি।

কিশোর কালো ভেলভেটের দিকে আঙুল তাক করল।

'বুঝলাম, কিন্তু ওই কালো ভেলভেট এল কোত্থেকে?'

'এটাই তো সেই ফ্যাশন হাউজের কোটের কাপড়টা,' জোর দিয়ে বলল রবিন।

যমজরা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়াল। চোখে-মুখে আতঙ্ক।

'মানি, পেনি, ফালতু প্রশ্নের জবাব দেয়ার দরকার নেই।' হঠাৎ শোনা গেল পরিচিত এক কণ্ঠ।

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। পিছনে দাঁড়িয়ে শুঁটকি টেরি স্বয়ং।

'সবাই জানে কিশোর পাশা কোটটা কেটেছে,' বলল 'গোটা শহরে রটে গেছে এ কথা।'

'তোমার সৌজন্যে,' ফোড়ন কাটল রবিন।

শুঁটকি প্লাস্টিকের মানিব্যাগ বের করল।

'ছবিটা কিনব আমি। বিছানার পাশে ঝুলিয়ে রাখব'

'খবরদার!' গর্জে উঠল মুসা। 'তুমি ছবিটা কিনতে পারবে না। তুমি চাইছ সবাই যাতে মনে করে তোমার কথাই ঠিক–কিশোরই কোটটা কেটেছে। তোমার

শয়তানী আমাদের বুঝতে বাকি নেই, শুঁটকি!'

'কী সব উল্টোপাল্টা বকছ!' বলে উঠল শুঁটকি।

মানি হাত পেতে দিল শুঁটকির সামনে।

'পঞ্চাশ সেন্ট।'

একমাত্র প্রমাণ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে বিচলিত হয়ে পড়ল রবিন। অসহায়ের মত চেয়ে রয়েছে কিশোরের মুখের দিকে।

গটগট করে এসময় কেন শিপটনের কাছে পৌঁছে গেল মুসা।

'ওটা দাও দেখি,' বলে ছোঁ মেরে জারটা কেড়ে নিল ওর হাত থেকে।

'আরে, করো কী?' হাহাকার করে উঠল কেন। 'বিলি আমাদের শোয়ের সুপারস্টার। মোনালিসার মত।'

'অ্যাই, শুঁটকি,' জারটা তুলে ধরে বলল মুসা। 'বিলিকে হ্যালো বলো। নইলে দেব গায়ে ছেড়ে।'

'বি-বি-বিলি?' তোতলাচ্ছে রীতিমত শুঁটকি।

কিশোর আর রবিন ওর পিছনে দাঁড়ানো।

'বিলি সারা সপ্তা জারের ভিতর রয়েছে,' বলে ঢাকনা খুলতে শুরু করল। 'মনে হয় পাণ্ডা বার আইসক্রীম চাখতে ওর খারাপ লাগবে না।'

শুঁটকি বিলির দিকে চেয়ে রয়েছে। চিবুক কাঁপতে শুরু করল হঠাৎ। পাণ্ডা বার পেইন্টিংটা খসে পড়ল হাত থেকে। পরমুহূর্তে 'বাপরে' বলে চিৎকার করে উঠল।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও।' শুঁটকিকে লেজ গুটিয়ে পালাতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল মানি। 'ছবি কিনবে না?'

ইতোমধ্যে কেন শিপটন এসে জারটা নিয়ে নিয়েছে মুসার হাত থেকে। কিশোর যমজদের কাঁধ জড়িয়ে ধরল।

'ব্যাপারটা কী বলো তো, ভাইয়ারা,' আদরের সুরে বলল। 'সত্যি কথা বললে তোমাদেরকে আইসক্রীম কিনে দেব।'

মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল যমজদের। কিশোরকে ওরা বিশ্বাস করে।

'বলছি,' বলল মানি। 'মিরা ম্যাডাম মিনি ফ্রিজে পাণ্ডা বার রাখতে বলেছিল। কিন্তু আমাদের মাথায় শয়তানী চাপল কোটটা আইসক্রীম মাখিয়ে নষ্ট করব।'

'তারপর?' তাগিদ দিল কিশোর।

'সবাই যখন লাল কার্পেটে প্র্যাকটিস করছে, আমরা স্টকরুমে ফিরে গিয়ে ফ্রিজ থেকে পাণ্ডা বার বের করি,' বলল মানি।

'তারপর কোটে আইসক্রীম ঘসে দাও,' বলল মুসা।

'হ্যাঁ,' পেনি বলল। 'পরে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে আমরা কাঁচি দিয়ে কোটটা কেটে দিই।'

কিশোর বলল, 'যাতে কোটে আইসক্রীম লেগে থাকতে দেখে কেউ তোমাদের ধরতে না পারে! এমনকী গন্ধও যেন না পায়?'

'হ্যাঁ,' বলল মানি। 'টুকরোটা আমি প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখি। সেজন্যেই

এখন কাপড়টার গায়ে দাগ দেখতে পাচ্ছ।'
কেন শিপটনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর।
'তুমি জানতে তোমার ভাইরা এ কাজ করেছে?'
'নাহ,' কথাটা স্রেফ উড়িয়ে দিল কেন। 'আমি ভেবেছি ওটা ফিঙ্গার পেইন্টিং।'
যমজদের হাতের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানল কিশোর। রঙিন চকের গুঁড়ো লেগে রয়েছে আঙুলে আর তালুতে।
'তোমরা দেয়ালে আমার সম্পর্কে আজেবাজে কথা লিখেছ, ঠিক না?'
মাথা নিচু করে ফেলল যমজরা।
'বিশ্বাস করো,' বলল মানি, 'টেরির কথায় আমরা তোমার নামে ওসব লিখেছি। যাতে তোমার ওপর সবার সন্দেহ আরও বেশি করে পড়ে। আমাদের কোন দোষ নেই।'
'তোমাদের খেল খতম,' কঠিন গলায় বলল মুসা। 'এখনই মিরার কাছে গিয়ে সব খুলে বলবে তোমরা।'
'তা হলে তো আর কখনও মডেল হতে পারব না!' পেনি ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠল।
মানি হাত নেড়ে কথাটাকে উড়িয়ে দিল।
'তাতে বয়েই গেল। ওই সোয়েটারগুলো ভীষণ কুট-কুট করে।'
তিন গোয়েন্দা যমজদেরকে সোজা ফ্যাশন হাউজে নিয়ে এল। দুই অপরাধী মিরার সামনে দাঁড়িয়ে অকপটে সব স্বীকার করল।
'তোমরা তো দোষ করেছই,' বলল মিরা। 'আমিও কম দায়ী না। খামোকা কিশোরকে সন্দেহ করেছি। তাছাড়া আমার উচিত ছিল সর্বক্ষণ ঘরটা পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করা।'
মাফ-টাফ চেয়ে নিল যমজরা। তারপর কিশোরের কাছ থেকে আইসক্রীমের পয়সা নিয়ে এক ছুটে বেরিয়ে গেল দোকান ছেড়ে।
'এত সুন্দর কোটটা নষ্ট হয়ে গেল,' বলল রবিন, 'খারাপ লাগছে!'
'ভেবো না,' বলল মিরা। 'রকি বীচে অমন কোট অনেক দেখতে পাবে তোমরা।'
'ভাই?' কিশোর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।
মৃদু হাসল মিরা।
'হ্যাঁ, ফ্যাশন শো-র পরে পাঁচটা কোটের অর্ডার পেয়েছি। ফুটো ছাড়া অবশ্য।'
হেসে ফেলল তিন গোয়েন্দা।
দোকান থেকে বেরিয়ে এল ওরা। স্বস্তি বোধ করছে কিশোর। মস্ত বড় এক পাথর যেন নেমে গেছে বুকের উপর থেকে।
'[illegible] ফোন করে এখনই সব জানানো দরকার,' বলল রবিন। 'যাতে আজেবাজে লেখা বন্ধ করে।'

প্রস্তাবটা নিয়ে দু'মুহূর্ত ভাবল গোয়েন্দাপ্রধান। তারপর মাথা নেড়ে নিষেধ করল।

'দরকার কী,' বলল। 'মিথ্যে যদি বাতাসের বেগে রটতে পারে, তবে সত্যিটাও জানাজানি হতে দেরি হবে না।'

আজকের দিনটা পিযা প্যালেসে সেলিব্রেট করবে ঠিক করল ওরা।

'কিন্তু তার আগে ড্যাশিং ডগ থেকে বাঘাকে নিয়ে আসি চলো,' বলল রবিন।

ড্যাশিং ডগের দিকে হাঁটা দিল তিন গোয়েন্দা।

***

ভলিউম ৬০

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান / শামসুদ্দীন নওয়াব

হাল্লো, কিশোর বন্ধুরা—
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বীচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম

তিন গোয়েন্দা।

আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নিচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি—
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০